...যায়, কি নিয়মে ঐ সকল মহা... ...সমূহ সমুদ্ভূত হয়? ...র উদয়মানে দেশের পূর্ব্বাপর অবস্থাই বা কিরূপ হইয়া থাকে?

...বান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্"॥

...দাঘে পুঞ্জীভূত আতপতাপ বায়ুস্তরের তরলতা সম্পাদন এবং প্রসার আনয়ন করিয়া যেমন হঠাৎ প্রবল বাত্যার সৃজন করিয়া পুঞ্জীভূত অজ্ঞানপ্রসূত অধর্ম্মও মানবের অন্তর্জগতে ঐরূপ আমূল ...ন আনিয়া মহাশক্তির কেন্দ্রীভূত প্রকাশের অবসর করিয়া দেয়। ...নুষের মনে ভাবের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া তাণ্ডবতরঙ্গে বিপরীত ... ধাবিত হইতে থাকে। মনের সঙ্কীর্ণ বাঁধসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়; ...ও বা ভাবস্রোতে চিরনিমজ্জিত হইয়া জলধিতলগত আটলাণ্টা দ্বীপের ...তমসাবৃত হয়। সেই জন্যই কি মনুষ্যমনের সঙ্কীর্ণ ভাবরাশির উপর ...রিয়া যাঁহারা ইহসংসারে দোকান পাট খুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন, কেন্দ্রীভূত শক্তিবিকাশের সময় যুগে যুগে তাঁহাদের মহত্ত্বয় আসিয়া ... হয়? জগতের 'দশকর্ম্মান্বিত' ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিষ্যব্যবসায়ী ...! সাবধান—কেন্দ্রীভূত শক্তি প্রকাশিত হইয়া সঙ্কীর্ণতার বাঁধ ...দিতেছে। নূতন তরঙ্গে দেশ কোথায় কতদূরে ভাসিয়া যাইবে, ...তে পারে?

...নর ভাবই কার্য্যপরিণামে স্থূল আকার ধারণ করে। ব্যক্তিতে ...জাতিতেও ঠিক তেমন। আবার ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ বা দেশে ...ব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তদ্রূপ।

...ন ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সময়ে মনুষ্যসমাজে কতই না পরিবর্ত্তন ...ত হয়। তখন দেশবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, নিষ্ঠুর নির্যাতন প্রভৃতিরূপে ...ভীমা দেশময় পর্য্যটন করেন! ভ্রাতায় ভ্রাতায় একমত হয় না— ...বিপরীতমতাবলম্বী—পিতা পুত্র পরস্পরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। ...জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম! যুগে যুগে আবহমানকাল ধরিয়া ...ভিতর জাতির ভিতর সমাজের ভিতর দেশের ভিতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কতভাবে কতরূপে কতই না হইল ও হইতেছে! ইহাই কি শাস্ত্র-দেবাসুরের দ্বন্দ্ব? কোনকালে কি ইহার বিরাম হইবে? কোন

কালে কি জগৎ, সত্য ন্যায় এবং জ্ঞানকে সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেক চিন্তা বাক্য ও কার্য্য করিবে? যাঁহার জগৎ, তিনিই বলিতে পারেন! কিন্তু হে ভীরু! এ সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইওনা। হইয়াই বা করিবে কি? ভিতরে বাহিরে যেখানে চাহ, দেখ ঐ সংগ্রাম। আত্মহিত চাও, উহা করিতে হইবে —পরহিত চাও, উহাই; নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চাও, উহা না করিলে যথার্থ বিশ্রাম লাভ হইবে না। তবে উঠ, জাগ, কোমর বাঁধ, শক্তিরূপিণী তোমার সহায় হইবেন। অন্য দেশে মা শত হস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন দেখিয়া যে ঈর্ষ্যায় তোমার অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে, তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তান সকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদনবিবর্হিত, রোগে জর্জ্জরিত, তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া যে মাকেই শত দোষে দোষী কর; অন্যজাতির পদাঘাতপীড়িত হইয়া যে অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক, দোষ কার? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞানসমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে— আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব নিশ্চিন্ত আছ? উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজায় অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে ও করিতেছে আর তুমি অবিদ্যাসেবায় যথাসর্বস্ব পণ করিয়া বসিয়া আছ! মা তোমায় দিবেন কেন? তিনি যে রুধিরপ্রিয়া! প্রতি কার্য্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ের রুধিরে মার তর্পণ কর, দেখিবে, শক্তিরূপিণী মাও তোমার প্রতি পুনরায় ফিরিয়া চাহিবেন। তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অদম্য উৎসাহরূপে প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে, মার নিত্য সহচরীরা বুদ্ধি লজ্জা ধৃতি মেধা প্রভৃতি আবার তোমার উপর প্রসন্না হইবেন।

এক একটি নূতন ভাব গ্রহণ করিতে আমাদের কতই না দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে হইয়াছে ও হইতেছে! পুরাকালের কথা ছাড়িয়া দাও—স্বাধীনতা সাম্য ও মৈত্রীভাব লইয়া ফ্রান্সের বিপ্লবের কথা এবং অধুনাতন জাপান যুদ্ধের কথাই ভাবিয়া দেখ। সেই জন্যই কি গুরুরূপী মহাশক্তিপ্রকাশে কোন না কোন প্রকার বিপ্লবের কথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ? কিন্তু প্রবল ঝটিকার পরেই প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করে, কার্য্যের পরেই বিরামের স্বভাবতঃ উদয় হয় এবং ঐ প্রকার বিপ্লবের পরেই শান্তি ও জ্ঞান মনুষ্যসমাজে দৃঢ়তর অধিকার স্থাপন করিয়া বসে।

গুরুরূপী শক্তির উদয়ে যে দেশময় ভাববিপ্লব সংঘটিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। তবে ভাববিপ্লব যে ধীরপদসঞ্চারে দেশময় সমাজময় কখনও অধিকার স্থাপন করিতে পারে না, তাহাও নহে। ঝঞ্ঝাতাড়িত বজ্রবিলোড়িত বিচ্ছিন্নবক্ষ জলধিজলে স্ফীতি ও তরঙ্গের প্রসার, উহা একভাব। আর চন্দ্রোদয়ে স্নিগ্ধকিরণপ্লাবিত সমুদ্রবক্ষের স্ফীতি ও উল্লাস—উহা আর এক ভাব। অমিতাভ বুদ্ধ, জ্ঞানগুরু শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির উদয়ের কথা স্মরণ কর। অথবা বর্ত্তমান জাপানের অভ্যুদয়ারম্ভের কথা একবার ভাবিয়া দেখ।

অবতার জগদ্‌গুরু—মনুষ্যরূপে ঈশ্বর! মনুষ্যত্বে ঈশ্বরত্বের অপূর্ব্ব মিলন—মানুষে অমানুষী দৈবী শক্তির বিকাশ, শক্তিপ্রসূত সংসারমহামন্দারের ফুল্লবিকসিত পারিজাত। ঈশ্বর সমগ্রশক্তি চালান, ফেরান, নিয়মন করেন, কিন্তু কখনও তাহার বশীভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত স্তব্ধমূঢ় হইয়া তাহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিত্ব প্রাপ্ত হয়েন না। হে জগদ্‌গুরু! মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও তোমার জগৎকারণজ্ঞান এবং তৎসহিত নিজের একত্ব-জ্ঞানের কখনও লোপ হয় না। মায়ার ভিতরে থাকিলেও তোমার তৃতীয় চক্ষু সর্ব্বদা অনাবৃত থাকিয়া মায়ার পারের বস্তু নিরীক্ষণ করিতে থাকে! আর মনুষ্যসাধারণকে মোহিত করিয়া দাসভাবে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে যত প্রকার শব্দস্পর্শাদি, তাহারাও তাহাদের প্রভাব সহস্র চেষ্টাতেও তোমার উপর কখনও বিস্তার করিতে পারে না; কেনই বা তোমায় নররূপে ঈশ্বর না বলিব?

অবতার—জগদ্‌গুরু—নররূপে ঈশ্বর! ঈশ্বর সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে পূর্ণ—নিজের কোন অভাব না থাকায় তৎপরিপূরণের জন্য কোন চেষ্টারও তাঁহার প্রয়োজন নাই—অথচ জগতের যাবতীয় চেষ্টার মূলই তিনি। হে নিত্য-মুক্ত আত্মারাম! তোমারও স্বরূপজ্ঞান সর্ব্বদা প্রকাশিত। অথচ নিজের কোন অভাব না থাকিলেও তুমি মনুষ্যসমাজের কল্যাণার্থ দিবারাত্র চেষ্টা করিয়া থাক। তোমার আহার বিহার নিদ্রা জাগরণ চেষ্টা বিরাম সংসার সন্ন্যাস প্রভৃতি সকলই অপরের জন্য। কেনই বা তোমায় মনুষ্য-রূপে ভগবান্ না বলিব?

অবতার—জগদ্‌গুরু—মানুষীতনুতে ঐশীশক্তি! ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমার যেমন "ইতি নাই," তোমারও তদ্রূপ! তোমা ভিন্ন আর কে

পূর্ব্বসংস্কারদৃঢ় পাষাণসদৃশ মনুষ্যমনকে ইচ্ছামাত্রে গলাইয়া নিজের ছাঁচে ঢালিয়া নূতনসত্যধারণোপযোগী গঠন দিতে পারে? কেই বা শরীর স্পর্শমাত্রেই অহংগ্রন্থি শিথিল করিয়া মানুষকে কামকাঞ্চনাতীত ভাব ও সমাধিরাজ্যে বিচরণ করাইতে পারে? কেই বা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" রূপ পরমধামে উপনীত হইবার নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট অধিকারীর নিকট তল্লাভ সুগম করিয়া দিতে পারে? কেই বা সকল ভাবের সমান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাদের চরম লক্ষ্য একই, ইহা নিজে জীবনে প্রমাণিত করিতে পারে? কেই বা বিপরীত ভাবের, বিপরীত মতের মধ্যে "সূত্রে মণিগণাইব" সমন্বয়সূত্র প্রত্যক্ষ করাইয়া মনুষ্যজ্ঞানের উদারতা সম্পন্ন করিয়া দিতে পারে? কেই বা যুগে যুগে আদর্শের পর আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া স্বেচ্ছায় মানুষভাবাপন্ন হইয়া চেষ্টার পর চেষ্টার দ্বারা ঐ সকল আদর্শ নিজ জীবনে পরিণত করিয়া মনুষ্যমনে তল্লাভে সাহস ও বলের উদ্দীপন করিয়া দিতে পারে?

হে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, অপারমহিম, কেন্দ্রীভূতবিদ্যারূপি আত্মারাম গুরো! তোমারি কৃপায় ভারত পুণ্যক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র জ্ঞানবীর্য্যের আকরভূমি! তোমাকে ভুলিয়াই ভারতের এ দুঃখ দারিদ্র্য অজ্ঞান। তুমি তাহাকে ভুলিয়া থাকিও না। গুপ্তভাবে উদিত হইয়া ভারতের এবং তদ্দ্বারা সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য যে অমোঘ জ্ঞান ও শক্তিবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছ, যাহার কিছুমাত্র পাশ্চাত্যে পড়িয়া অপূর্ব্ব ভাববিপ্লব সম্পন্ন করিতেছে, হে দেব! হে দয়ানিধে! উহা যাহাতে ফলফুলে সমাচ্ছন্ন মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া প্রত্যেক নর নারীর প্রাণে বল উৎসাহ উদ্যম অধ্যবসায়াদি সদ্‌গুণনিচয় আনিয়া শীঘ্র এ দুর্দ্দশার অবসান করে, তাহাই কর—তাহাই কর!

আর তুমি হে উদ্বোধন! ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া সেই অপারমহিম অপ্রতিহতপ্রভাব গুরুশক্তির কথা ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারে দৃঢ়বদ্ধপরিকর হইয়া "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" অভয়বাণী উচ্চারণে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার কর। নববর্ষে তোমাতে নবশক্তি সঞ্চারিত হউক—প্রকাশিত হউক।

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আমাকে সেই দুরারোহ পর্ব্বত হইতে নামিতে দেখিয়া তাহার বিশেষ বিস্মিত হইবার কারণ এই যে, সেই ঘোর নিবিড় ও দুর্গম অরণ্য মধ্যে বনচারী মৃগয়াজীব শীকারিগণও ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই, বা চন্দ্রবদনী দেবী হইতে আমার মত কেহ সেই পথে নামিয়া আসিয়াছে, তাহাও সে জানিত না। এই কারণে সে ধন্য মাই চন্দ্রবদনী দেবী, ধন্য মাই চন্দ্রবদনী দেবী বলিয়া দেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন পুর্ব্বক আমাকে বলিল যে, মা স্বয়ং আমার হাত ধরিয়া না নামাইলে আমি সেই দুর্গম পার্ব্বত্য অরণ্য কিছুতেই পার হইতে পারিতাম না। তাহার প্রত্যেক কথাই আমার সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কারণ, আমি এইরূপ আরও কত বিপদে পড়িয়া দেখিয়াছি যে, অসহায়ের সহায়, আপনার হইতেও আপনার, একজন অন্তরালে থাকিয়া আমাকে সদা সর্ব্বদা রক্ষা না করিলে আমি কিছুতেই বারে বারে এইরূপ বহুবিধ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সাধারণকে আজ আমার সেই ভ্রমণবৃত্তান্তকথা শুনাইতে সক্ষম হইতাম না। আমি এইরূপে কতবার কত ভয়ঙ্কর বিপৎসঙ্কুল স্থানে পতিত হইয়া যে, ভগবানের অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। আমি সে সমুদয় যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, নিরক্ষর পাহাড়ী কৃষকের মুখেও ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল এবং মনে করিলাম যে, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর বিপদে পতিত হইলেও নিশ্চয়ই ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন। তাহার পর সেই পাহাড়ী আমাকে চারটী উম্বী খাইতে দিল। আমি তাহাতেই জলযোগ করিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম এবং তাহার নিকট শ্রীনগর যাইবার পথ জানিয়া লইলাম।

তথা হইতে পুনরায় বনে বনেই চলিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল চলিয়া টীহরী হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যে সরকারী পথ আছে, সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সমান এক প্রশস্ত পথ

পাইয়া এইবার আমি চক্ষু বুজিয়া চলিতে লাগিলাম। শ্রীনগরে পঁহুছিতে আমার প্রায় সন্ধ্যা হইল। শ্রীনগরে পঁহুছিয়া পুনরায় আমি লোকালয়ের মুখ দেখিলাম। দেশীয় গড়োয়ালের যমুনোত্রি ও গঙ্গোত্রি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া টীহরী ভিন্ন আর একটীও বাণিজ্যব্যবসায়োপযোগী বহুলোকের বাসস্থান গ্রাম বা নগর আমি দেখি নাই। এইবার ব্রিটিশ গড়োয়ালের প্রধান নগরে আসিয়া পঁহুছিলাম। অলকনন্দা পার হইলেই ব্রিটীশ সীমানা; অলকনন্দার পশ্চিম পারে দেশীয় গড়োয়াল এবং পূর্ব্ব পারে ব্রিটীশ গড়োয়াল। শ্রীনগর অলকনন্দার তীরবর্ত্তী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রতিষ্টিত। ব্রিটীশ অধিকারের পূর্ব্বে শ্রীনগর গড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী ও অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এখনও লোকসংখ্যা ও ব্যবসা বাণিজ্যে সমগ্র গড়োয়ালের মধ্যে শ্রীনগরই প্রধান। গড়োয়ালের সিভিল্ ষ্টেশন,* পৌড়ীও শ্রীনগরেরই নিকটে। সুতরাং স্থানটী সর্ব্বতোভাবেই বাসোপযোগী হইয়াছে এবং সেই জন্য বহু নিম্নপ্রদেশীয় ব্যবসায়ীরাও এই শ্রীনগরে বাণিজ্যসূত্রে অবস্থিতি করায় শ্রীনগরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ৺বদরিকাশ্রম যাত্রার সময় বিভিন্নদেশীয় বহুতর লোকের একত্র সমাগমে স্থানটী জনতায় পূর্ণ হয় এবং ৺ বদরিকাশ্রমের পথে এক শ্রীনগরেই লোকালয়ের অস্তিত্ব বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। শ্রীনগর অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত এবং বাজারের মধ্যে পাথরবাঁধা প্রশস্ত এক পথ আছে; তাহার দুই পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী ও নানাবিধ সামগ্রীর বিপণি। অত্যল্প কালের মধ্যেই বাজারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাওয়া যায়। শ্রীনগরের দক্ষিণ ভাগে অলকনন্দার তীরে গড়োয়াল রাজ্যের ভগ্নাবশিষ্ট প্রকাণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। এই সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদের প্রত্যেক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড খানি প্রাচীন ভারতীয় স্থপতির অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। এক একখানি প্রস্তরখণ্ড পরিমাণে অসাধারণ এবং তাহা এমনি অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও কৌশলের সহিত গ্রথিত, যে, দেখিলেই বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। ইহা স্বাধীন গড়োয়াল রাজ্যের অস্তমিত গৌরবের একটী প্রকৃত নিদর্শন। এরূপ প্রকাণ্ড

* সরকারী সদর মোকাম। গড়োয়ালের হেড কোয়ার্টার।

আসিলাম। শ্রীনগরে কতকগুলি পাহাড়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরও বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্নও হইয়াছেন শুনিয়াছি। আমার সহিত অম্বা দত্ত যোষী নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আলাপ হয়। তাঁহার নিকট একখানি হস্তলিখিত অবধূতগীতা পাঠ করিয়া সেই সময়ে আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে তিনি আমার জন্য একখানি "অবধূত গীতা" লিখিয়া রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। হৃষীকেশ হইতে ডেরাডুন ও মসুরী হইয়া আমি উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেই জন্য হৃষীকেশ ও শ্রীনগরের মধ্যবর্ত্তী পতিতপাবনী ভাগীরথী ও অলকনন্দা সঙ্গম দেব-প্রয়াগ (দিব্য-প্রয়াগ) নামক পবিত্র তীর্থে আমার অবগাহন করা হয় নাই। সেই জন্য আমি বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া পুনরায় এই পথেই আসিব স্থির করিলাম। পাহাড়ীদের হিসাবে ৺হরিদ্বার হইতে ৺কেদার ও বদরী নারায়ণ ১২০ ক্রোশ এবং শ্রীনগর ঠিক তাহার মধ্যস্থলে। তাহা হইলেই শ্রীনগর হইতে কেদার ৬০ ক্রোশ।* যাহা হউক্, দুই তিন দিন শ্রীনগরে থাকিয়াই তথা হইতে প্রাতঃকালে রুদ্রপ্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগর হইতে রুদ্রপ্রয়াগ ১৯ মাইল; পাহাড়ী ১২ ক্রোশ। ইংরাজী প্রায় দেড় মাইলে পাহাড়ী এক ক্রোশ হয়। শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম যে, বিভিন্ন দেশীয় ও নানা সম্প্রদায় ভুক্ত সাধু ও গৃহস্থ যাত্রিগণের অবিরাম যাতায়াত ও যাত্রিগণের অবস্থিতির জন্য পথে দুই এক ক্রোশ অন্তর এক এক খানি চটী থাকাতে, মহা নির্জ্জন দুর্গম আরণ্য প্রদেশও লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে। সেই বিপুল জনস্রোতঃ অবিরাম গতিতে উর্দ্ধাধোভাগে ধাবিত হইতেছে। যাত্রার প্রারম্ভেই হরিদ্বারে যাঁহারা মেষ সংক্রান্তির স্নান করিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে নামিতেছেন; আর অধিকাংশ যাত্রী উপরে উঠিতেছেন। গঙ্গোত্রি হইয়া যাঁহারা বদরিকাশ্রম যাত্রা করেন, তাঁহারাও

* আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার পর এতদিনে শ্রীনগরের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুনিয়াছি। গোনা হ্রদের জলপ্লাবনের পর বর্ত্তমান শ্রীনগর পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সময়ে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। আমার যত দূর স্মরণ হয়, আমি আষাঢ় মাসের শেষ ভাগে ৺বদরীনারায়ণে পঁহুছিয়াছিলাম। শ্রাবণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত নিম্নদেশীয় যাত্রিগণের যাতায়াত প্রায় সমান ভাবে থাকে। আর ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, এই তিন মাস শীতাধিক্য বশতঃ নিম্নদেশীয় লোকের যাত্রা প্রায়ই থাকে না। কেবল এতদ্দেশীয় পার্ব্বত্য যাত্রিগণের প্রাদুর্ভাব সেই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া যমুনোত্রি পথের ভীষণ নির্জ্জনতা ও গঙ্গোত্রি পথের মুষ্টিমেয় যাত্রিসমাগমের পরিবর্ত্তে, আমি বহুজনাকীর্ণ পথে চলিতে লাগিলাম।

পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাভাবিক ও গভীর নিস্তব্ধতা, ভক্ত যাত্রিগণের মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত "জয় কেদার ও জয় বদরী বিশাল" ধ্বনিতে যেন কিছুদিনের জন্য অতি নিভৃত গিরিকন্দরে গিয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। যে অরণ্যবহুল কঠিন পার্ব্বত্য প্রদেশে কদাচিৎ কোন নিম্নপ্রদেশীয় লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা ভগবানের মহিমা-প্রভাবে আজ বিচিত্র জনতায় পূর্ণ! শ্রীভগবানের অপার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া আপন আপন গৃহ পরিজন পরিত্যাগ করিয়া বহু কর্ম্মার্জ্জিত ধনের অজস্র ব্যয় করিতে করিতে কত শত সহস্র সহস্র অবস্থাপন্ন নরনারী স্ব স্ব শিশুসন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া এই দুর্গম গিরিমার্গ অতিক্রম করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন! ধন্য ভগবান্, আর ধন্য তোমার মহিমা! সম্পূর্ণ কঠোর ব্রত অবলম্বন না করিলে বদরিকাশ্রম যাত্রা অসম্ভব। যাত্রিগণের কোন কষ্টের প্রতি যেন ভ্রূক্ষেপ নাই, কেবল কতক্ষণে তাঁরা দেবাদিদেব কেদার ও বদরী বিশালের দর্শন পাইবেন, এই এক চিন্তাই তাঁহাদের প্রবল। যথার্থই উত্তরাখণ্ডে যাত্রিগণের ভগবন্নিষ্ঠা, একাগ্রতা, দেবদর্শনলালসা ও কঠোরচর্য্যা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয় এবং শ্রীভগবানের অপার মহিমা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিয়া হৃদয় ভক্তিভাবে পূর্ণ হয়। বস্তুতঃই তাঁহাদের দর্শনেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। এই পথের পথিক সকলেই সমান, সকলেরই এক চিন্তা ও এক উদ্দেশ্য। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, বালক ও বালিকাগণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই; কারণ, সকলেরই এক চটীতে বাস, একত্র অবগাহন, আহার, বিহার, শয়ন এবং সকলের মুখেই সেই এক কথা,

"জয় কেদার, জয় বদরী বিশাল"। তীর্থভ্রমণের মাহাত্ম্য আমি এখানে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। কেন যে, আর্য্য ঋষিগণ বর্ণাশ্রমিগণের পক্ষে তীর্থভ্রমণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিলাম। তীর্থভ্রমণের সময় মনুষ্যের বহুতর সদ্‌গুণ প্রকাশ পায়। ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যা প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন সৎপ্রবৃত্তিগুলি যেন যুগপৎ মনুষ্যহৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এমনি স্থান-মাহাত্ম্য যে, ঘোর বৈষয়িক লোকও কিছুদিনের জন্য দেবত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। শ্রীনগর হইতে পথে চলিতে চলিতে নানাদেশীয় যাত্রিগণের পবিত্র সমাগম দেখিয়া এবং বদরিকাশ্রমের অলৌকিক প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আমি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, যাঁহার অলৌকিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই সুদূর বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশ বিপুল জনতায় পূর্ণ হইয়াছে এবং স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, অন্ধ, খঞ্জ ও অন্যান্য বহুবিধ দুরবস্থাপন্ন ও অক্ষম সহস্র সহস্র ব্যক্তি যাঁহার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া অবলীলাক্রমে এই দুর্গম গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে ধাবমান হইয়াছে, ধন্য তাঁহার শক্তি! যাত্রিগণের সুবিধার জন্য দুই, তিন বা চার মাইল অন্তর ছোট বড় এক এক খানি চটী আছে। প্রত্যেক চটীতে থাকিবার স্থান আছে এবং আহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে চাল, ডাল, ঘৃত, দুগ্ধ, আটা ও আলু প্রভৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু সকল দ্রব্যই মহার্ঘ। এ পথে আমাকে ভিক্ষার জন্য আর একটুও চেষ্টা করিতে হইল না। কারণ, কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী, যাঁহারা কিছু অর্থ সম্বল লইয়া যাত্রায় আসেন, তাঁহারা সকলেই অল্প বিস্তর সাধু সন্ন্যাসী ভোজন করাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এমন অনেক ধনাঢ্য গৃহস্থ যাত্রী আছেন, যাঁহারা প্রত্যহ বহুতর সাধু সন্ন্যাসিগণকে আহার্য্য দিয়া আপন আপন সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীনগর হইতে যাত্রা করিয়া আমি প্রায় সমস্ত দিনই চলিলাম, কেবল মধ্যাহ্নে একটী চটীতে জনৈক গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলাম।

তাহার পর দিবা অবসানপ্রায় সময়ে রুদ্রপ্রয়াগে পঁহুছিলাম। হৃষীকেশের উপর, লছমন ঝোলা হইতে যে সরকারী পথ বরাবর ৺বদরী-নারায়ণে গিয়াছে, তাহা এইখানে ছাড়িয়া রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অন্য পথে

কেদারনাথে যাইতে হয়। রুদ্রপ্রয়াগে অলকনন্দার উপর একটী পাকা সেতু আছে। ৺বদরীনারায়ণের পথ হইতে সেই সেতু দিয়া অলকনন্দা পার হইয়া রুদ্রপ্রয়াগে যাইতে হয়। অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলকেই রুদ্রপ্রয়াগ বলে। প্রধান দুইটী তীর্থ হইতে প্রবাহিত হইয়া দুইটী পৃথক্ নদী যেমন এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তেমনি প্রধান দুইটী তীর্থে যাইবার দুইটী পৃথক্ পথের সন্ধিস্থলও এই খানে। ৺বদরীনারায়ণের পথের উপর অলকনন্দার তীরেই একখানি চটী আছে, তদ্ভিন্ন এখানে কোন গ্রাম নাই। তবে রুদ্রপ্রয়াগে কেবল দুই একটী দেবালয় আছে। মন্দির কয়টি গড়ানে পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেবসেবায় নিযুক্ত দুই এক ঘর লোক ভিন্ন এখানে আর কোন লোকের বাস নাই। পূজক একজন পাহাড়ী দশনামী গোসাঁই। তাঁহার একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। দুই জনই বয়ঃস্থ ব্যক্তি। মূর্খ গোঁয়ার পাহাড়ী গোসাঁইএর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক শিষ্য দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। সে যাহা হউক্ আমি রুদ্রপ্রয়াগে পঁহুছিয়াই পবিত্র মন্দাকিনী ও অলকনন্দা সঙ্গমে স্নান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং যতক্ষণ না গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইল, সেই সঙ্গমস্থলেই বসিয়া রহিলাম। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়! উত্তালতরঙ্গিনী অলকনন্দা ও প্রবলবেগবতী মন্দাকিনীর অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে দেখিতে আমার মনে কত ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। সুনীলবরণী, কলনাদিনী মন্দাকিনী, দেবাদিদেব শ্রীকেদারনাথের পাদদেশ বিধৌত করিয়া অলকাপুরী হইতে প্রবাহিতা শুভ্রসলিলা অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়া যেন ঠিক হরি-হররূপ ধারণ করিয়াছেন। এই পবিত্র নদী-সঙ্গম দেখিলে স্বতঃই দর্শকের স্মৃতিপথে হরিহররূপ উদিত হইবে। চির শ্যামাঙ্গী মন্দাকিনী অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়া পতিতপাবনী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইবার জন্য অতি দ্রুতবেগে দেব-প্রয়াগাভিমুখে ধাবিতা হইয়াছেন। রুদ্রপ্রয়াগের অতি রমণীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দে তথায় একরাত্রি যাপন করিলাম।

তাহার পর দিন প্রাতঃকালে তথা হইতে আমি ৺কেদার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত অলকনন্দার তীরে তীরে আসিয়া এক্ষণে মন্দাকিনীর তীরে তীরে চলিলাম। নগাধিরাজ

হিমালয়ের মধ্যে যতই প্রবেশ করিতে লাগিলাম, যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, অনন্ত-রত্নপ্রভব হিমালয়কে নিত্যই বিচিত্র নব নব বেশে সুশোভিত দেখিয়া আমার হৃদয়ের হিমালয়দর্শনলালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিত্যই নগাধিপের বিচিত্র নবীন বেশ দর্শন করিয়া আমার মন প্রাণ বিমোহিত হইতে লাগিল এবং কতক্ষণে শ্রীকেদার ও বদরীবিশাল * দর্শন করিব, সেই চিন্তায় চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আমি অগস্ত্যমুনিতে গিয়া পঁহুছিলাম। অগস্ত্যমুনি তখন যাত্রিগণে পরিপূর্ণ; সকলেই আহারাদির আয়োজনে ব্যস্ত, কেহ দোকান হইতে দ্রব্যাদি আনিতেছেন; কেহ কেহ বা রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন এবং রন্ধন করিতেছেন। কত দেশের লোকই একত্র উপস্থিত হইয়াছেন এবং কত প্রকার ভাষাই যে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব! সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! অগস্ত্যমুনিতে একখানি গ্রাম, একখানি বেশ বড় চটী ও অনেক গুলি দোকান আছে, এবং কয়েকটী অতি প্রাচীন দেবমন্দিরও প্রতিষ্ঠিত আছে। অগস্ত্য মুনি নাকি কিছুদিন এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই জন্যই স্থানটী অগস্ত্যমুনি নামে প্রসিদ্ধ। তপস্যার অনুকূল স্থানই বটে। পথের ঠিক উপরেই গ্রাম ও চটী, তাহার সম্মুখে সুন্দর হরিদ্বর্ণের তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড, তন্নিম্নেই চিরপ্রবাহিনী, কলনাদিনী মন্দাকিনী। স্থানটী সম্পূর্ণরূপেই বাসোপযোগী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেরূপ শীতাধিক্যও নাই। শ্রীনগরের পর পথিমধ্যে এরূপ নাতিপ্রশস্ত রমণীয় উপত্যকা আর দেখি নাই। আমি মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া দেবদর্শন করিলাম এবং একটী মন্দিরে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম যে, মহর্ষিগণসেবিত পবিত্র ও সুরম্য স্থানসমুহের দর্শনেই যে আনন্দ ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিতেছি, না জানি সেই

* পঞ্চ কেদার ও পঞ্চ বদরীর বিস্তৃত বিবরণ আমি পরে লিখিব। এক্ষণে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, পঞ্চ বদরীর প্রধান বদরীনারায়ণকেই "বিশালা বদরী" বলে। মহাভারতের বনপর্ব্বেই আছে, যথা,—"বিশালা বদরী যত্র নরনারায়ণাশ্রমঃ"। "বিশালা বদরীর" পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী দুইটী পর্ব্বত নর ও নারায়ণ নামে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ আছে।

সকল তপঃক্লিষ্ট, পুণ্যদর্শন মহর্ষিগণের দর্শনলাভ ঘটিলে আজ কি অপার আনন্দসাগরেই নিমগ্ন হইতাম !

আমি সেই মন্দিরে বসিয়া এই সকল পবিত্র চিন্তায় অভিভূত হইয়া আছি, ইত্যবসরে বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ, কৌপীনধারী, সহাস্যবদন, জনৈক সাধু আমাকে তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মধ্যাহ্নের পর সাধু ডাল ও রুটী প্রস্তুত করিয়া যেরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও যত্নের সহিত আমাকে ভিক্ষা করাইলেন, তাহা আমার চিত্তে চিরকাল সমানভাবে জাগরূক থাকিবে। মন্দিরসংলগ্ন গৃহাভ্যন্তরে তাঁহাকে রন্ধন করিতে দেখিয়া আমি তাঁহাকে সেই মন্দিরেরই একজন পূজারী ভাবিয়াছিলাম। তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৫০।৫৫ হইবে। যাহা হউক, আমি অগস্ত্যমুনিতে এতাদৃশ উদারচেতা সাধুপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া পরম-প্রীতিলাভ করিলাম এবং সে জন্য আমাকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আমি ভিক্ষার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। অগস্ত্যমুনির রমণীয়তা দর্শনে আমি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, এত শীঘ্র কিছুতেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমার যাইতে ইচ্ছা হয় নাই। তবে আমার গন্তব্য স্থানের দূরতা বিবেচনা করিয়া স্থানবিশেষে মুগ্ধ হইলেও আমি পথে দুই এক রাত্রির অধিক কোথাও অবস্থিতি করিতে পারি নাই। তাহার পর অগস্ত্যমুনি হইতে আমি যত উপরে উঠিতে লাগিলাম, দিবা রাত্রি প্রায় সমান শীত বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় একখানি চটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখান হইতেই শীতাধিক্য বিশেষরূপে অনুভূত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে এই চটী হইতে প্রকাণ্ড এক পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলাম। দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া গুপ্তকাশীতে পঁহুছিলাম।

গুপ্তকাশী একটী প্রকাণ্ড ভূধরের সর্ব্বোচ্চ ভাগে প্রতিষ্ঠিত। গুপ্তকাশী হইতে আর অতি অল্পদূর উপরে উঠিলেই সেই সুবিশাল গিরিশৃঙ্গের শিরোভাগে পঁহুছান যায়। গুপ্তকাশী হইতে বহুনিম্নে স্বর্ণদী মন্দাকিনী প্রবাহিতা। মন্দাকিনীর পরপারেই আর একটী প্রায় সমান উচ্চ সুবৃহৎ গিরিগাত্রে "ওখিমঠ।" গুপ্তকাশী হইতে ঠিক সম্মুখভাগে ওখিমঠ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দাকিনীর পশ্চিমপার্শ্বস্থিত গিরিগাত্রে গুপ্তকাশী এবং পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত গিরিগাত্রে ওখিমঠ। উচ্চতায় দুইটী স্থানই সমান বলিয়া বোধ হইল। গুপ্তকাশীতে দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত দেবালয়ে ধাতু ও প্রস্তর-

নির্ম্মিত অতি সুন্দর দুইটী দেবমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। দেবতার নাম আমার স্মরণ নাই। দেবালয়প্রাঙ্গনে কৌশল পূর্ব্বক দুইটী জলের ধারা, দুইটী পিত্তলনির্ম্মিত পশুমুখবিবর দিয়া প্রবাহিত করা হইয়াছে। জলের কল খুলিয়া দিলে যেমন জল পড়ে, এই দুই মুখ দিয়াও নিরবচ্ছিন্নকাল সেইমত হুড় হুড় শব্দে অতি সুশীতল জল পড়িতেছে এবং পরে গিরিগাত্র হইতে প্রবাহিত হইয়া মন্দাকিনীতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। গুপ্তকাশীর এই সুশীতল জলের ধারা দুইটী এই রূপে কৌশল পূর্ব্বক প্রবাহিত করায় যাত্রিগণের স্নান ও রন্ধনাদির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গুপ্তকাশীর অধিবাসিগণও এই ধারার জল ব্যবহার করে। কিন্তু ইতর জাতির ব্যবহারের জন্য আরও কয়েকটী ধারা আছে। ৺কেদারের চিরহিমানী হইতে অবাধে শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এবং অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গুপ্তকাশীতে শীতের প্রাবল্য বিশেষ রূপে অনুভব করিলাম। এখানে শীত ঋতু সদা সর্ব্বদা বিদ্যমান, তবে শীতের কয়মাস তুষারপাত নিবন্ধন অধিকতর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। এইখানে আসিয়া পুনরায় আমার সেই অগস্ত্যমুনির সাধুটীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি যে পুনরায় তাঁহাকে এখানে দেখিতে পাইব, তাহা ভাবি নাই। তাঁহার দর্শন পাইয়া আমার আশাতীত আনন্দ হইল।

ক্রমশঃ।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

GEORGE W. HALE,
541, Dearborn Avenue,
CHICAGO.

১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু,—

এ দেশে আসিয়া অবধি তোমাদের পত্র লিখি নাই। কিন্তু—পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম।—এবং তোমরা যে—র যথোচিত খাতির করিয়াছ, তাহা বড়ই ভাল।

এ দেশে আমার কোনও অভাব নাই ; তবে ভিক্ষা চলে না, পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। এ দেশে যেমন গরম, তেম্নি শীত। গরমি কলিকাতার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু হাত তিন হাত কোথাও ৪।৫ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণ ভাগে বরফ নাই। বরফ ত ছোট জিনিষ। যখন পারা জিরোর উপর ৩২ থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলিকাতায় কদাচ ৬০ হয় জিরোর উপর, ইংলণ্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নীচে ৪০।৫০ তক নেবে যান। উত্তর ভাগে কানাডায় পারা জমে যায়। তখন আলকোহল থারমোমিটার ব্যবহার করিতে হয়। যখন বড্ড ঠাণ্ডা, তখন বরফ পড়ে না। যে দিন বড্ড গরম হয়, অর্থাৎ পারা জিরোর উপর ২০ ডিগ্রির উপর যায়, সে দিন বরফ পড়ে। আমার বোধ ছিল, বরফ পড়া একটা বড ঠাণ্ডা। তা নয়, বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে। বেজায় ঠাণ্ডায় এক রকম নেশা হয়। গাড়ী চলে না, স্লেজ চক্রহীন ঘস্‌ড়ে যায়! সব জমে কাঠ—নদী নালা লেকের উপর হাতী চলে যেতে পারে। নায়াগারার প্রচণ্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্ঝর জমে পাথর!!! কিন্তু আমি বেশ আছি। প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল, তার পর গরজের দায়ে একদিন রেলে করে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা লেক্‌চার করে বেড়াচ্চি। গাড়ী ঘরের মত, steam pipe যোগে খুব গরম আর চারিদিকে বরফের রাশি ধপধপে সাদা—সে অপূর্ব শোভা।

বড় ভয় ছিল যে, আমার নাককান খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশীকৃত গরম কাপড়, তার উপর সলোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাহিরে যেতে হয়। নিশ্বাস বেরুতে না বেরুতেই দাড়িতে জমে যাচ্চেন। তাতে তামাসা কি জান? বাড়ীর ভিতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ীর ভেতর গরম কি না, তাই। প্রত্যেক ঘরে, সিঁড়িতে steam pipe গরম রাখ্‌চে। কলা কৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে বিলাসে অদ্বিতীয়, পয়সা রোজগারে অদ্বিতীয়, খরচে অদ্বিতীয়। কুলির রোজ ছটাকা, চাকরের তাই, ৩৲ টাকার কম ঠিকা গাড়ী পাওয়া যায় না। চারি আনার কম চুরুট নাই। ২৪ টাকার মধ্যবিৎ জুতা এক

জোড়া। ৫০০ টাকায় একটা পোষাক। যেমন রোজকার, তেমনি খরচ। একটা লেক্‌চার ২০০।৩০০।৫০০।২০০০।৩০০০ পর্য্যন্ত। * *

আমার এখানে এখন পোহাবার। এরা আমায় ভালবাসে, হাজার হাজার লোক আমার কথা শুনিতে আসে। প্রভুর ইচ্ছা।—মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগো শুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙ্গে পড়িতে লাগিল, তখন——ভায়ার মনে আগুন জ্বললো! তখন এর কাছে তার কাছে, আমার যথোচিত নিন্দা করে বোষ্টনে পালিয়ে গেলেন। সেখানে গিযে ভিক্ষেশিক্ষে করে——কাছে কিছু টাকাকড়ি নিয়ে ঘরে প্রস্থান। * * * দাদা, আমি দেখে শুনে অবাক্। ভল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করছি। তোর খাতির ত যথেষ্ট এদেশে। তবে আমার মত তোদের হল না, তা আমার কি দোষ! বাজারে এসেছ, যার মাল খরিদ্দারের পছন্দ, সে বেচ্‌বে। এতে ঈর্ষার কি কথা! আর * * পাদ্রিদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে 'ও কেউ নয়, ও ঠক জোচ্চোর, ও তোমাদের দেশে এসে বলে আমি ফকির,' ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগ্‌ড়ে দিলে। * * তাদের পুস্তকে প্যাম্‌ফ্লেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা। কিন্তু গুরু সহায়, ওসব কি চলে? সমস্ত এমেরিকান নেসান যে আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মত মানে। পাদ্রি ফাদ্রির কি কর্ম্ম? আর এরা বিদ্বানের জাত। এখানে "আমরা বিধবার বে দিই," আর "পুঁতুল পূজা করি না," এ সব আর চলে না (পাদ্রিদের কাছে কেবল চলে)। তারা চায় ফিলসফি, learning, ফাঁকা গপ্পি আর চলে না।

ধর্ম্মপাল ছোকরা বেস, * *. বেশ ভাল মানুষ, তার এদেশে যথেষ্ট আদর হয়েছিল।

ভাযা, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হাম বড়, আর কেউ বড় হবে না। "যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে ন জানীমহে।" ভর্ত্তৃহরি।

এদেশের মেয়ের মত মেযে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ ও দয়াবতী -মেযেরাই এদেশের সব। বিদ্যা বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষু" এদেশে আর "পাপাত্মনাং হৃদয়েষলক্ষ্মীঃ" আমাদের দেশে এই বোঝ। হায় হায়, এদের মেয়েদের দেখে আমার

আক্কেল গুড়ুম, "ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ &c." "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা &c.।" এ দেশের বরফ যেমন সাদা, তেম্নি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন তেম্নি পবিত্র আর আমাদের দশ বৎসরের "ছেলের মা-গণ" !!!! প্রভো, এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আরে দাদা, "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতা," বুড় মনু বলেছে। আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। বাপ্, আকাশ পাতাল ভেদ !! "যাথাতথ্যতো অর্থান্ ব্যদধাতি।" প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন ? প্রভু বলেছেন, "ত্বম্ স্ত্রী ত্বম্ পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।" আর আমরা বল্‌ছি, "দূরমপসর রে চণ্ডাল !" "কেনেষা নির্ম্মিতা নারী মোহিনী &c.।" ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! মন্দিরে যে বেশ্যার নৃত্য! যে ধর্ম্ম গরিবের দুঃখ করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম ? আমদের কি আর ধর্ম্ম ? আমাদের "ছুৎমার্গ", খালি "আমায় ছুঁয়ো না," "আমায় ছুঁয়ো না"। হে হরি, যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বৎসর খালি বিচার কর্‌ছে, ডান হাতে খাব কি বাম হাতে, ডান দিক্ থেকে জল নেব, কি বা দিক্ থেকে—ফট্ ফট্ ক্রাং ক্রুং হি হি ইত্যাদি যে দেশের মূলমন্ত্র, তাদের অধোগতি হবে না ত কার হবে। "কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।" তিনি জানিতেছেন, তাঁর চক্ষে কে ধূলো দেয় বাবা।

যে দেশে কোটি কোটি লোক মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টাও করে না, সে কি দেশ না নরক ? সে ধর্ম্ম না পৈশাচ নৃত্য ? দাদা, এইটী তলিয়ে বোঝ, ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি, এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য্য হয় কি ? পাপ বিনা সাজা মেলে কি ?

"সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনং ধ্রুবং।
পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নং॥"

সত্য কি ?

দাদা, এই সব দেখে, বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না। একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—cape কমোরিণে মা কুমারীর মন্দিরে

বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এত জন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি, লোককে metaphysic শিক্ষা দিচ্চি, এ সব পাগ্‌লামি। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না—গুরুদেব বল্‌তেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন কর্‌ছে, তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজি চার যুগ ওদের রক্ত চুসে খেয়েছি আর দু পা দিয়ে দলিয়েছি।

মনে কর, * * যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখ্‌তে পারি না। ফল কথা,—If mountain does not come to Mahomet, Mahomet must to the mountain (১)। গরীবরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসিতে পারে না আর কবিতা ফবিতা পড়ে তাদের কোনও উপকার নাই। We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and *raise the masses.* The Hindu, the Mahomedan, the Christian all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside it, from the orthodox Hindus. In every country the evils exist not with but against religion. Religion therefore is not to blame. (২)

---

(১) পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবে। অর্থাৎ গরীবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখা পড়া শিখ্‌তে না পারে, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের শিখাতে হবে।

(২) আমাদের জাতটা নিজেদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেই জন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই মনুষ্যত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই কর্ত্তে হবে—সাধারণ লোককে তুল্‌তে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই এ দেশের নীচ জাতকে পায়ে দলেছে। আবার তাদের ওঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আন্‌তে হবে—খাঁটি হিন্দুদেরই এ কাজ কর্ত্তে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের দেশের ধর্ম্মের দোষ নয়, ধর্ম্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুণই এই সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্ম্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।

এটী কর্‌তে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি সহরে আমি ১০।১৫ লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তার পর ঘুর্‌লাম, ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে !!! Selfishness Personified, (১) তারা দেবে !!! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজকার করিব, পরে দেশে যাব and devote the rest of my life in the realization of this one aim of my life (২)

যেমন আমাদের দেশে social virtueর অভাব, তেমনি এ দেশে Spirituality নাই, এদের Spirituality দিচ্চি, এরা আমায় পয়সা দিচ্চে। কতদিনে সিদ্ধকাম হব, জানি না, * * এরা Hypocrite নয় আর jealousy একেবারে নাই। হিন্দুস্থানের কারও উপর depend করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজকার করে নিজের plans carry out কর্‌ব or die in the attempt। "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।"

তোমরা হয়ত মনে করিতে পার, কি Utopian nonsense ! you little know what is in me. কেউ যদি আমায় সহায়তা করে in my plans all right, নহিলে গুরুদেব will show me the way out. Jealousy ত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে থাক্‌তে পারে না, ঐটে আমাদের দোষ, national sin !!!! এ দেশে ঐটে নাই, তাই এরা এত বড়।

আমাদের মত কূপমণ্ডুক ত দুনিয়ায় নাই। কোনও একটা নূতন জিনিষ কোনও দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে আর আমরা? আমাদের মত দুনিয়ায় কেউ নাই "আর্য্য" বংশ !!! * * ২৲ টাকার জন্য গোরার পায়ে তেল দেয়, মায়ের আঁচল না ধোরে অন্ধকারে বেরুতে পারে না, এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান কুকুরের মত ঘোরে আর এরা "আর্য্য" বংশ !!!

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

---

(১) মূর্ত্তিমান্ স্বার্থপরতা।

(২) আর আমার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ আমার জীবনের এই এক উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য লাগ্‌বো।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বেলুড় মঠে আগামী ২৯শে জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব হইবে, এ সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে দেওয়া হইয়াছে। তাহার পরের রবিবার ঐ স্থানেই কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক স্বামীজির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসব কেবল ছাত্রগণ এবং তাঁহাদের শুভানুধ্যায়িগণের জন্য। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও উপদেশ হইতে ছাত্রগণ কি শিক্ষালাভ করিতে পারেন, সেই বিষয় বিশেষ ভাবে এখানে আলোচিত হইবে।

হিন্দী বাঙ্গলা বর্ণমালা নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই পুস্তিকার মূল্য ৵০ আনা এবং ইহা শ্রীধাম বৃন্দাবনের দেবকীনন্দন যন্ত্রে শ্রী নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত। এই পুস্তক প্রধানতঃ হিন্দীভাষিগণকে বাংলা শিখাইবার জন্য। বাঙ্গালীরাও ইহা হইতে হিন্দী ভাষা শিখিবার সুবিধা পাইবেন। এরূপ গ্রন্থ আজকাল বিশেষ প্রয়োজনীয়। আশা করি, প্রকাশকগণ ক্রমশঃ উচ্চশিক্ষার্থিগণের জন্য এই পুস্তকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ প্রভৃতি প্রকাশিত করিবেন।

পথিক। মাসিক পত্র ও সমালোচন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ টাকা। ১৬ নং ফকির চাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি নূতন মাসিক পত্র, আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় মাসিক পত্রের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু অধিকাংশই সুপরিচালনার অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। "পথিকে"র অগ্রহায়ণ সংখ্যা যাহা আমরা পাইয়াছি, তাহার লেখাগুলি মন্দ নয়, তবে বিষয়ে বিশেষ নূতনত্ব নাই। আমরা নূতন সহযোগীর স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

গুপ্ততত্ত্ব। মূল্য ।০ আনা। ৪১নং লোয়ার সার্কুলার রোড ভবনস্থ ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন যন্ত্রে প্রাপ্তব্য।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগকে প্রজোৎপাদন তত্ত্ব যতটুকু শিখাইলে কল্যাণ হইতে পারে এবং যাহাতে তাহারা কৃত্রিম উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য-ভঙ্গের কুফল হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান মিশনরি-গণ কর্ত্তৃক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মিশনরি-মহোদবগণের এই সদুদ্যমে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে। প্রাচীনকালের ঋষিগণ বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার সময় স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতে কিছুমাত্র লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইতেন না। অধুনা পাশ্চাত্য কৃত্রিম সভ্যতার কুহকে ভুলিয়া আমরা মুখে সভ্য হইয়া অন্তরে কি ঘোর অপবিত্রতা পোষণ করিতেছি এবং আমাদের হস্তে যাহাদের শিক্ষার ভার, সেই সকল সুকুমারমতি বালক বালিকাকে জীবনের এই গুরুতর ব্রত সম্বন্ধে কিছুমাত্র উপদেশ না দিয়া যে দিন দিন কি গভীর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

অবশ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বাইবেল সম্মত যে সকল সৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, সে সকল পৌরাণিক উপাখ্যান বিশ্বাসে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। আর মিশনরি মহাশয়েরা যে প্রজোৎপাদনকে ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের কথা একেবারে চাপা দিয়াছেন, আমরা সে মতেরও পক্ষপাতী নহি। মিশনরি মহাশয়েরা বাইবেলখানি যদি ভাল করিয়া পড়েন, তাঁহারাও দেখিতে পাইবেন, যীশু খ্রীষ্ট পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যকেই ধর্ম্মজীবনে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। যাঁহারা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের অধিকারী নহেন, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গৃহী হইয়া সংযতকাম হইয়া প্রজোৎপাদন করিবেন। পরে সংসারে বৈরাগ্য আসিলে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারা আজীবন কুমার থাকিবেন। ইহাই প্রাচীন বিধান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হিন্দুধর্ম্মমতে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যই জীবনের চরম লক্ষ্য। প্রজোৎপাদন ধর্ম্ম কেবল দুর্ব্বলদের জন্য। আমরা আশা করি, আমাদের হিন্দুভ্রাতাগণ মিশনরি মহোদয়গণের এই শুভসংকল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ লক্ষ্য রাখিয়া বালক-গণের জন্য সহজ ভাষায় ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিবেন।

ভারতে বিবেকানন্দ।

সিংহল।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন ১৫ই জানু-য়ারি ১৮৯৭ সালে। তিনি নর্থ জার্ম্মাণ লয়েড লাইনের প্রিন্স রিজেন্ট লিওপোল্ড নামক জাহাজে করিয়া সিংহলের অন্তর্গত কলম্বোয় পঁহুছিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটী সাহেব ও একটী মেম। সাহেবদ্বয়ের নাম কাপ্তেন সেভিয়ার ও মিষ্টার গুডউইন। মেমটী পূর্ব্বোক্ত কাপ্তেনের সহধর্ম্মিণী। সেভিয়ার-দম্পতী ইতিপূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষে ভারতে আসিয়াছিলেন ও অনেক দিন বাসও করিয়াছিলেন। উভয়েই বৃদ্ধ; সন্তান সন্ততি নাই। ইংলণ্ডে স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়া বেদান্তের অদ্বৈতবাদকেই আপনাদের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইচ্ছা,—ভারতের কোন নিভৃত প্রদেশে একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তথায় অতিবাহিত করিবেন এবং অদ্বৈতবাদ প্রচারে তনু মন ধন সব নিয়োগ করিবেন। তাঁহাদের বাসনা সফল হইয়াছে। হিমালয়ের অন্তর্গত মায়াবতী নামক স্থানে রামকৃষ্ণ মিশ-নের যে অদ্বৈত আশ্রম, তাহা ইঁহাদেরই অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হইয়াছে। কাপ্তেন কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন—তাঁহার সহধর্ম্মিণী এখনও বর্ত্তমান। আশ্রমে এক্ষণে বেলুড় মঠের কয়েকটী সন্ন্যাসী, মিসেস্ সেভিয়ার, অমৃতানন্দ নামক জনৈক আমেরিকান ব্রহ্মচারী এবং কয়েকটী এতদ্দেশীয় ব্রহ্মচারী রহিয়াছেন। সাহেবগণ যেরূপ আপনাদের মান অভি-মান ভুলিয়া ধর্ম্মের জন্য তপস্যা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা দেখিলে স্বামী বিবেকানন্দের অসীম ক্ষমতা স্মরণ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

মিষ্টার গুডউইন যুবা, অমায়িক, ঘোর কর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি একজন বিখ্যাত সাঙ্কেতিকলেখনবিৎ (Stenographer)। যখন স্বামীজি আমেরিকায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, তাঁহার বক্তৃতা রিপোর্ট করিবার জন্য এরূপ এক ব্যক্তির প্রয়োজন হওয়াতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইনি প্রথম

বেতন লইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হন, পরে স্বামীজির গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তদবধি সর্ব্বদা তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জন্যই স্বামীজির বক্তৃতাগুলি সাধারণে পড়িতে পাইতে-ছেন। দুঃখের বিষয়, অল্প দিন ভারতপ্রবাসের পরেই উতকামন্দে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে।

কলম্বোর হিন্দু সমাজ স্বামীজির অভ্যর্থনার জন্য একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। তাহার দুইটী সভ্য, স্বামীজির জনৈক গুরু-ভাই এবং হ্যারিসন নামক কলম্বোবাসী জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাহেব জাহাজে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই একখানি ষ্টিম লঞ্চ প্রস্তুত ছিল। যখন ষ্টিম লঞ্চে করিয়া স্বামীজি কিনারায় পঁহুছিলেন, তখন দেখা গেল সহস্র সহস্র হিন্দুর ভিড়, সকলেই স্বামীজির অভ্যর্থনার্থ সমবেত। তথা হইতে তাঁহাকে একখানি গাড়ী করিয়া বার্ণেস ষ্ট্রীট নামক রাস্তায় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালায় লইয়া যাওয়া হইল। এই রাস্তাটী কলম্বোর প্রান্তভাগে অবস্থিত; কলম্বোয় যে দারুচিনির বিখ্যাত বাগান আছে, তথা হইতে সিকি মাইল। এই রাস্তার যেখানে আরম্ভ, সেইখানে একটী বৃহৎ তোরণ নির্ম্মিত হইয়া নারিকেল বৃক্ষের শাখা, পত্র ও পুষ্পের দ্বারা Welcome (স্বাগত) লিখিত হইয়াছিল। ঐ রাস্তা হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত ছিন্ন তালপত্র দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রবেশমুখে আর একটী ঐরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বাঙ্গালায় বহু হিন্দুর সমক্ষে সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মাননীয় কুমার স্বামী মহাশয় একটী অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলেন।

এই অভিনন্দন পত্রে সিংহলবাসীরা যে ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের প্রথমেই তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার সুযোগ পাইলেন, তাহাতে আপনা-দিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়া পাশ্চাত্যদেশবাসিগণের সমক্ষে সার্ব্বভৌমিক হিন্দু-ধর্ম্মের ভাব প্রচার করিবার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়াতে স্বামীজি অভিনন্দন পত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন,—"আপনাদের অভিনন্দনে আমি পরম আনন্দিত। তবে আমি এই অভিনন্দনকে আমার ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য প্রশংসা মনে করি না। এই অভিনন্দনে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, হিন্দুগণ ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু বলিয়া মনে করেন। আপনারা এ ক্ষেত্রে কোন

বিখ্যাত রাজপুরুষ, যোদ্ধা অথবা ধনীর অভিনন্দন করিতেছেন না। এক জন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর জন্য এই সকল আয়োজন। ইহাতে কি বুঝিতেছেন না যে, হিন্দুর মতি গতি কোন্ দিকে? যদি হিন্দুজাতি জীবিত থাকিতে চায়, তবে এই ধর্ম্মকেই তাহার জাতীয় মেরুদণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।"

পরদিন শনিবার ঐ বাঙ্গালায় স্বামীজিকে দর্শন করিবার জন্য ধনী, দরিদ্র নানাবিধ লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তিনিও ধনিদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ ও সকলের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। একটী দরিদ্রা রমণীর স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফল মূল উপহার হস্তে স্বামীজির নিকট উপস্থিত হইয়া স্বামীজিকে ঈশ্বরলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে ভগবদ্গীতা পাঠ এবং গৃহস্থের কর্ত্তব্য যথোচিত পালন করিতে উপদেশ দিলেন। রমণী বলিলেন, "গীতা না হয় পড়িলাম, কিন্তু যদি সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিলাম, তবে কি হইল?" উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আগত জনৈক দরিদ্র ভক্ত এক দিন স্বামীজিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক খাওয়াইলেন। কিন্তু স্বামীজি এবং তাঁহার সঙ্গিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্বামীজির সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিলেন না; স্বামীজি যত ক্ষণ রহিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্বামীজির পাশ্চাত্য শিষ্যগণ দরিদ্র হিন্দুগণেরও ঈশ্বর উপলব্ধি করিবার প্রবল আগ্রহ ও সাধু-ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। স্বামীজির সম্মানার্থ এই বাঙ্গালার "বিবেকানন্দ মন্দির" নাম রাখা হইল।

শনিবার অপরাহ্নে ফ্লোরাল হল নামক স্থানে স্বামীজি একটী বক্তৃতা করিলেন। এত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে, হলে তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। প্রাচ্য ভূমে আসিয়া ইহাই স্বামীজির প্রথম বক্তৃতা।

কলম্বোয় স্বামীজির বক্তৃতা।

যে সামান্য কার্য্য আমা দ্বারা হইয়াছে, তাহা আমার নিজের কোন অন্তর্নিহিত শক্তিবলে হয় নাই, পাশ্চাত্যদেশে পর্য্যটন কালে এই পরম পবিত্র আমার প্রিয়তম মাতৃভূমি হইতে যে উৎসাহবাক্য, যে শুভেচ্ছা, যে আশীর্ব্বাণী লাভ করিয়াছি, উহা সেই শক্তিতেই হইয়াছে। অবশ্য কিছু কায হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণে উপকার বিশেষ হইয়াছে

আমার. কারণ, পূর্ব্বে যাহা হয়ত, হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম, এখন সে বিষয় আমার পক্ষে প্রমাণসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম,—ভারত পুণ্যভূমি—কর্ম্মভূমি। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই সভার সমক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি,—ইহা সত্য, সত্য, অতি সত্য। যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে, যাহাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্ম্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে ভগবল্লাভাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে, যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হইয়াছে, যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতভূমি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে সনাতন ধর্ম্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্যায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতেই উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্ব্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপরদেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্ব্বাণ করিতে যে অমৃতসলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই বর্ত্তমান। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।

আমি সমগ্র জগতে ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতালাভ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও এ বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছেন। যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর তুলনা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এই সহিষ্ণু শান্তিপ্রিয় হিন্দুজাতির নিকট জগৎ যতদূর ঋণী, আর কোন জাতিরই নিকট ততদূর নহে। "শান্তিপ্রিয় হিন্দু" কথাটী সময়ে সময়ে তিরস্কারবাক্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু যদি কোন তিরস্কার বাক্যের মধ্যে গভীর সত্য লুক্কায়িত থাকে, তবে তাহা উহাতেই

আছে। হিন্দুগণ চিরকালই জগৎপিতার প্রিয় সন্তান। জগতের অন্যান্য স্থানে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে সত্য; প্রাচীনকালে ও বর্ত্তমানকালে অনেক শক্তিশালী বড় বড় জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাব বাহির হইয়াছে সত্য; প্রাচীনকালে বা বর্ত্তমানকালে অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব একজাতি হইতে অপর জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে সত্য; প্রাচীনকালে বা বর্ত্তমানকালে কোন কোন জাতীয় জীবনতরঙ্গ প্রসারিত হইয়া চতুর্দ্দিকে মহাশক্তিশালী সত্যের বীজসমূহ ছড়াইয়াছে সত্য; কিন্তু বন্ধুগণ, ইহাও দেখিও, ঐ সকল সত্য প্রচার, রণভেরীর নির্ঘোষ ও রণসাজে সজ্জিত গর্ব্বিত সেনাকুলের পদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল—রক্তরঞ্জিত না করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারীর অজস্র রুধিরস্রোত না বহাইয়া কোন জাতিই অপর জাতিকে নূতন ভাব প্রদান করিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রত্যেক ওজস্বী ভাব প্রচারের পশ্চাতেই অসংখ্য লোকের হাহাকার, অনাথের ক্রন্দন ও বিধবার অশ্রুপাত লক্ষিত হইয়াছিল।

প্রধানতঃ এই উপায়েই অপর জাতি সকল জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—কিন্তু ভারত ঐ উপায় অবলম্বন না করিয়াও সহস্র সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিল! যখন গ্রীসের অস্তিত্বই ছিল না, রোম যখন ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে লুক্কায়িত ছিল, যখন আধুনিক ইউরোপীয়গণের পূর্ব্বপুরুষেরা জর্ম্মানির গভীর অরণ্যমধ্যে অসভ্য অবস্থায় থাকিয়া নীলবর্ণে আপনাদিগকে অনুরঞ্জিত করিত, তখনও ভারতের ক্রিয়াশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও প্রাচীনকালে—ইতিহাস যাহার কোন খবর রাখে না, কিম্বদন্তীও যে সুদূর অতীতের ঘনান্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করে না, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভাবের পর ভাবতরঙ্গ, ভারত হইতে প্রসৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটাই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্ব্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরাই কখন অপর জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা জয় করি নাই,—সেই শুভকর্ম্মফলেই আমরা এখনও জীবিত। এমন সময় ছিল, যখন প্রবল গ্রীক বাহিনীর বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। এখন তাহারা কোথায়? তাহাদের এখন চিহ্নমাত্রও নাই। গ্রীসদেশের গৌরবরবি আজ অস্তমিত! এমন সময় ছিল, যখন রোমের শ্যেনাঙ্কিত বিজয়পতাকা জগতের বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরেই উড্ডীয়মান ছিল। আজ

সেই ক্যাপিটোলাইন গিরি* ভগ্নস্তূপ মাঝে পর্য্যবসিত! যেখানে সীজারগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেন, সেখানে আজ ঊর্ণনাভ তন্তু রচনা করিতেছে। অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে আবার পড়িয়াছে; মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক স্বল্পকালমাত্র পরপীড়াকলুষিত জাতীয় জীবন অতিবাহিত করিয়া সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় বিলীন হইয়াছে।

এই রূপেই এই সকল জাতি মনুষ্যসমাজে আপনাদের চিহ্ন এককালে অঙ্কিত করিয়া এখন তিরোহিত হইয়াছে। তোমরা কিন্তু এখনও জীবিত, আর আজ যদি মনু এই ভারতভূমিতে পুনরাগমন করেন, তিনি এখানে আসিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইবেন না; তিনি কোন্ অপরিচিত স্থানে আসিয়া পড়িলাম বলিয়া মনে করিবেন না। সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী চিন্তা ও পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধানসকল এখানে এখনও বর্ত্তমান; সনাতনকল্প, শত শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ সেই সকল আচার এখানে এখনও বর্ত্তমান। যতই দিন যাইতেছে, যতই দুঃখ দুর্ব্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে এই একমাত্র ফল হইতেছে যে, সে গুলি আরও দৃঢ়, আরও স্থায়ী আকার ধারণ করিতেছে। ঐ সকল আচার ও বিধানের কেন্দ্র কোথায়, কোন্ হৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইয়া উহাদিগকে পুষ্ট রাখিতেছে, আমাদের জাতীয় জীবনের মূল প্রস্রবণই বা কোথায়, ইহা যদি জানিতে চাও, তবে বিশ্বাস কর, তাহা ধর্ম্ম। সমগ্র জগৎ ঘুরিয়া আমি যে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি।

অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম্ম সংসারের অন্যান্য কাযের ন্যায় একটা কায মাত্র। রাজনীতি চর্চ্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন এবং প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয়নিচয় যাহাতে আনন্দ অনুভব করে, সেই সকলের চেষ্টা আছে। কিসে আরো অধিক ভোগসুখ লাভ করিব, ভোগে নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে, এইরূপ নানা চেষ্টার সহিত একটু আধটু ধর্ম্মকর্ম্মও করা আছে। এখানে—এই ভারতে

* Capitoline hill,—রোম নগর সাতটী পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত ছিল; তন্মধ্যে যেটীর উপর রোমকদিগের কুলদেবতা জুপিটরের সুবৃহৎ মন্দির ছিল, তাহার নাম ক্যাপিটোলাইন গিরি। জুপিটার দেবের মন্দিরের নাম ক্যাপিটল, তাহা হইতে পাহাড়টীর ঐ নাম হইয়াছে।

কিন্তু মানুষের সমস্ত চেষ্টা ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য। চীন-জাপান যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তোমাদের মধ্যে কয়জন তাহা জান? পাশ্চাত্য সমাজে যে সকল নানাবিধ গুরুতর রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়া উহাকে সম্পূর্ণ নূতন আকার দিবার চেষ্টা করিতেছে, তোমাদের মধ্যে কয়জন তাহার সংবাদ রাখ? যদি রাখে, দুই চারি জন মাত্র। কিন্তু আমেরিকায় এক বিরাট্ ধর্ম্মসভা বসিয়াছিল এবং তথায় একজন হিন্দু সন্ন্যাসী প্রেরিত হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য, দেখিতেছি, এখানকার সামান্য মুটে মজুরেও তাহা জানে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, কোন্ দিকে হাওয়া বহিতেছে, জাতীয় জীবনের মূল কোথায়। দেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে প্রাচ্য জনসাধারণের অজ্ঞতার গভীরতায় শোকপ্রকাশ করিতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে শুনিতাম, বিশেষতঃ এক নিঃশ্বাসে ভূপ্রদক্ষিণকারী পর্য্যটকগণের পুস্তকে ঐ বিষয় পড়িতাম। এখন আমি বুঝিতেছি, তাঁহাদের কথা সত্যও বটে, আবার অসত্যও বটে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্ম্মানি বা যে কোন দেশের একজন চাষাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, তুমি কোন্ রাজনৈতিক দলভুক্ত? সে তোমাকে বলিয়া দিবে, সে উদারনৈতিক অথবা রক্ষণশীলদলভুক্ত—সে কাহার জন্যই বা ভোট দিবে। আমেরিকার চাষা জানে, সে রিপাব্লিকান বা ডেমোক্রাটসম্প্রদায়ভুক্ত*। সে এমন কি, রৌপ্য-সমস্যা † সম্বন্ধেও কিছু

---

* রিপাব্লিকান ও ডেমোক্রাট। যে দেশের শাসন সেই দেশীয় সকল ব্যক্তির দ্বারা একত্রে নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে ডেমোক্রাসি (Democracy) ও যে দেশের শাসনভার প্রজা-সাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের হস্তে থাকে, তাহাকে রিপাব্লিক (Republic) বলে। প্রাচীন এথেন্স, রোম প্রভৃতি ডেমোক্রাসির এবং বর্ত্তমান ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি রিপাব্লিকের দৃষ্টান্ত। এই দুই বিভিন্ন শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতিগণকে যথাক্রমে ডেমোক্রাট ও রিপাব্লিকান বলে।

* রৌপ্যসমস্যা—Silver question,—ব্যবসাবাণিজ্যের ন্যূনাধিক্য, নূতন খনির আবিষ্কার প্রভৃতি নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রৌপ্য ধাতুর পরিমাণ অল্পাধিক হইয়া থাকে। ইউরোপে এইরূপে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক রৌপ্য জমিয়া গিয়াছে। কাযেই সেখানে রৌপ্যের দর পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়াছে অর্থাৎ যে পরিমাণ রৌপ্যে যে পরিমাণ দ্রব্যবিশেষ পূর্ব্বে পাওয়া যাইত, সে পরিমাণ আর এখন পাওয়া যায় না। ইউরোপের সহিত যে সকল অপরাপর দেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ আছে, অথবা যে সকল স্থান তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে,

অবগত আছে। কিন্তু তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। সে বলিবে, আমি আর কিছু জানি না, গির্জ্জায় গিয়া থাকি মাত্র। বড় জোর সে বলিবে, আমার পিতা খ্রীষ্টধর্ম্মের অমুকশাখাভুক্ত ছিলেন। সে জানে, গির্জ্জায় যাওয়াই ধর্ম্মের চূড়ান্ত।

অপর দিকে আবার একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা কর,সে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জানে কি না; সে তোমার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া হাঁ করিয়া থাকিবে। সে বলিবে,সে আবার কি? সে সোসিয়ালিজম্ + প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলন সম্বন্ধে, পরিশ্রম ও মূলধনের সম্বন্ধ বিষয়ে এবং এতদ্রূপ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সে জীবনে কখন এ সকল বিষয় সম্বন্ধে শুনে নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে; রাজনীতি বা সমাজনীতির সে এইটুকু মাত্র বুঝে। তাহাকে কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমার ধর্ম্ম কি, সে আপনার কপালের তিলক দেখাইয়া বলিবে, আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দুই একটী কথা বাহির হইবে, যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি। আমি ইহা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। এই ধর্ম্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

ঐ সকলে কিন্তু রৌপ্যের দর ঐরূপে কম না হওয়ায় দ্রব্য এবং মুদ্রাদি বিনিময়ের সময় রৌপ্যের দর লইয়া বিশেষ গোল বাধে। উহাতে ভারত এবং অপরাপর দেশকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। সেই গোল মিটাইবার জন্য সকল ইউরোপীয় জাতি মিলিয়া এখন স্বর্ণ-মুদ্রাবিশেষের একটী নির্দ্দিষ্ট দর স্থির করিয়া দেওয়ায় ঐ বিবাদের জটিলতা, আজকাল কিছু কমিয়াছে। ইহাকেই রৌপ্যসমস্যা বা Silver question কহে।

+ সোসিয়ালিজম,—Socialism, পাশ্চাত্য দেশের একটী প্রবল সম্প্রদায়ের মত। এই সম্প্রদায় অল্পবিত্ত শ্রমজীবী দ্বারাই গঠিত। ইহারা বলে, মূলধনী ও শ্রমজীবী উভয়েরই ব্যবসায় লাভের অংশ সমান থাকা উচিত। অন্ততঃ এক্ষণে যেরূপ ঘোর পার্থক্য আছে, তাহা যাহাতে কমিয়া গিয়া শ্রমজীবীরা পূর্ব্বাপেক্ষা লাভের অংশ অধিক পায়, এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে পুস্তিকা প্রচার, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা এই সম্প্রদায় শ্রমজীবীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করাইয়া ধর্ম্মঘট প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা তাহাদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিয়া কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এবং ধর্ম্মঘট করিবার সময় যাহাতে তাহাদের পরিবারবর্গের আহারাদির কষ্ট না হয়, সে জন্য চাঁদা তুলিয়া ফণ্ড প্রভৃতি করিয়াছে ও নিত্য করিতেছে। পাশ্চাত্য প্রদেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও ইহাঁদের প্রার্থনা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া ইহাঁদের সহিত সহানুভূতি করিয়া থাকেন।

প্রকাণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা আমি সমগ্র গড়োয়াল ও কুমাউনের মধ্যে আর কোথাও দেখি নাই। এখানে একটী সরকারী মাইনর স্কুল ও হাঁসপাতালও আছে। আমি শ্রীনগরে পঁহুছিয়াই প্রথমে অলকনন্দায় অবগাহন করিলাম, তাহার পর ৺কমলেশ্বর মঠে গেলাম।

শ্রীনগরে ৺কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। সেই মঠের মোহান্ত দয়ালপুরীর পুত্রের সহিত আমার হৃষীকেশ হইতে ডেরাডুনে যাইবার পথে আলাপ হইয়াছিল। তিনি, শ্রীনগরে পঁহুছিলে আমাকে তাঁহাদের মঠে গিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সেই কথা স্মরণ করিয়া কমলেশ্বর মঠে গিয়া ৺কমলেশ্বর দেবের দর্শন করিয়া আমার পূর্ব্বপরিচিত মোহান্তজীর পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার যত্নের ত্রুটি করিলেন না। ৺কমলেশ্বর দেবের যে ভূসম্পত্তি ও আয়, মোহান্তজী মনে করিলে তাহা দ্বারা স্বসম্প্রদায়ের বা জন সাধারণের যথেষ্ট হিত সাধন করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা আদৌ নাই বলিলেই হয়। স্থাবর দেবোত্তর সম্পত্তি ভিন্ন প্রতি বৎসর ৺বদরিকাশ্রম যাত্রীদের দর্শনী প্রভৃতিতে ৺কমলেশ্বর দেবের যে আয় হয়, তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু এই অর্থ মোহান্তজীর সুব্যবস্থায় কেবল সঞ্চিতই হইতেছে। মোহান্তজী দেখিতে সভ্য ভব্য; দুই হাতে দুই সোনার বালা এবং সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ ভূষায় সুসজ্জিত থাকেন। মোহান্তজী ঘরবারী গোসাঁই।

এই বাঙ্গলা দেশে যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ হইতেই কালে একদল গৃহস্থ বৈরাগীর উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ প্রবর্ত্তিত দশনাম* সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসিগণ হইতেই কালক্রমে এই ঘরবারী গোসাঁইদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তরাখণ্ডে এই জাতীয় বিস্তর ঘরবারী গোসাঁইয়ের বাস এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেককেই দেবসেবায় নিযুক্ত দেখিলাম। উত্তরাখণ্ডের শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্তদিগের উপাস্য দেব দেবীর প্রায় সকল মন্দিরগুলি এই "গিরি"

* ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের চারি জন প্রধান শিষ্য কর্ত্তৃক সন্ন্যাসিগণের এই দশ নাম পরিকল্পিত হইয়াছে। দশটী নাম যথা,—গিরি, পর্ব্বত, সাগর, বন, অরণ্য, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, তীর্থ ও আশ্রম।

"পুরী" নামা ঘরবারী গোসাঁইদিগের অধিকারভুক্ত। এই ঘরবারী গোসাঁইগণ সন্ন্যাসের চিহ্নস্বরূপ মস্তকে কেবলমাত্র একটী গৈরিক পাকৃড়ী ধারণ করেন। ৺কমলেশ্বর দেবের মোহান্তজীও স্ব সম্প্রদায়ের চিহ্ন স্বরূপ কেবল একটী গৈরিক পাকৃড়ী ধারণ করিতেন। পূর্ব্বে যে সকল ত্যাগী মহাপুরুষ এই মঠের মোহান্ত পদে বিরাজমান ছিলেন, তাঁহাদের পবিত্র আসন পূর্ব্বাপর সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। মঠে সন্ন্যাসের নিদর্শন স্বরূপ একমাত্র সেই আসনই এক্ষণে বিদ্যমান; তদ্ভিন্ন প্রকৃত সন্ন্যাসের আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর যদি দেখিতাম যে, মঠের দেবোত্তর সম্পত্তি কেবল জন সাধারণের হিত সাধনে ব্যয় হইতেছে, তাহা হইলেও না হয় কতক সন্তোষলাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, সেদিকেও মোহান্তজীর দৃষ্টি নাই। কেবল যে এই মঠেরই এই দুর্দশা, তাহা নহে, ক্রমশঃ উত্তরাখণ্ডের প্রধান যোষীমঠেই বা কি হইতেছে, তাহাও দেখাইব। যাহা হউক্, আমার সহিত মোহান্তজীর যতবার কথাবার্ত্তা হইল, দেব-সম্পত্তির যথোচিত সদ্ব্যয় না করিয়া তিনি যে প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন, তাহা আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইতে একবারও বিস্মৃত হই নাই। উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই আমি সন্ন্যাসীর মঠের যে দুর্দ্দশা দেখিলাম, তাহাতে প্রকৃতই আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল। পরম পবিত্র তপোভূমি বদরিকাশ্রমের সন্ন্যাসীর মঠগুলি যে, কেবল কতকগুলি ঘরবারী গোসাঁইয়ে পূর্ণ দেখিব, তাহা আমি একবারও ভাবি নাই। যাহা হউক, মোহান্তজীর পুত্রের সহিত আমার পূর্ব্বে একটু পরিচয় হওয়ায় মঠে আমার যত্নের ত্রুটি হয় নাই। অবশেষে আমার ভাগ্য এমনি সুপ্রসন্ন হইল যে, মোহান্তজী আমার শীতবস্ত্রের অভাব দেখিয়া আমাকে একখানি কম্বল দিলেন। চন্দ্রবদনীতে যাইবার সময় টীহরীর রাজগুরুও আমাকে একখানি কম্বল দিয়াছিলেন। কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সেখানিও আমার হস্তচ্যুত হয়। সুতরাং আমার একখানি কম্বলের নিতান্ত আবশ্যক হয়; সেইজন্য মোহান্তজীর একটু সদ্ব্যয় করাইয়া আমার সেই সময়ে বিশেষ উপকার হইল। কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির ব্যতীত এখানে আরও কতকগুলি প্রাচীন দেবমন্দির আছে। কিন্তু সেগুলি তত প্রসিদ্ধ নহে। আমি নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া সেইগুলিও দর্শন করিয়া

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে অগস্ত্য মুনিরই একজন পূজারী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তিনিও আমাদের মত একজন ৺ কেদার ও বদরিকাশ্রম দর্শনাভিলাষী যাত্রী। তবে পথে আসিতে আসিতে অগস্ত্য মুনি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া তিনি সেইখানে দুইদিন ছিলেন। অগস্ত্য মুনিতেই আমি তাঁহার সরল ও উদার ব্যবহারে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাহার পর এইখানে আমি তাঁহার সেই সকল গুণের বিশেষ পরিচয় পাইলাম। আমাকে দেখিয়াও তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেই সর্ব্বাঙ্গ অতি শুভ্র বিভূতিতে ভূষিত, সেই সহাস্যপ্রসন্নানন, কৌপীনধারী মহাপুরুষের হৃদয় যে, কি স্বর্গীয় বিমল আনন্দে পূর্ণ ছিল, তাহা তাঁহার সেই সরলতাময় মুখখানিতেই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আমাকে দেখিয়াই তিনি তাঁহার নিকট মহাবীরের প্রসাদ পাইবার জন্য বলিয়া রাখিলেন। তাঁহাকে মহাবীর হনুমানের উপাসক বলিয়া বোধ হইল। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তিভাবে ভক্তবীর হনুমানের নামোচ্চারণ করিতে শুনিলাম। তাঁহার সম্মুখের কয়েকটী দাঁত না থাকায় তাঁহার সহাস্য মুখখানি ঠিক বালকের মত দেখাইত। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত সাধু হইয়াও তাঁহার মালা, তিলক ও কণ্ঠি প্রভৃতি ধারণের আড়ম্বর ছিল না এবং তাঁহার হৃদয় যে, সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকভাবশূন্য ছিল, তাহা তাঁহার ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত, বিশেষতঃ শৈব সন্ন্যাসিগণের প্রতি প্রীতি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। বৈষ্ণব সাধুগণের মধ্যে প্রায়ই এইরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অমায়িক, উদার ও অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবও অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, তিনি আমাকে অন্য কোথাও ভিক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া রন্ধনের জন্য বনে কাষ্ঠাহরণ করিতে গেলেন। ইত্যবসরে আমি গুপ্তকাশীর দেব দর্শনাদি করিয়া গ্রামের চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর আমরা যে ঘর খানিতে ছিলাম, সেইখানে আসিয়া দেখিলাম যে, সাধু কাষ্ঠাহরণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং সেই ঘর খানির

এক কোণে বসিয়া অতি নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করিতেছেন। ঘরের মধ্যে তাঁহার একখানি কম্বল মাত্র ছিল, তাহাও শুনিলাম যে, তিনি বনে কাষ্ঠাহরণ করিতে গিয়া কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। গুপ্তকাশী হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি অনেকটা দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোথায় যে, তিনি তাহা ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার স্মরণ নাই সুতরাং আর তাহা খুঁজিয়া আনা অসম্ভব হইল। সেই দারুণ শীতপ্রধান দেশে সাধুকে এককালীন বিবস্ত্র হইতে দেখিয়া আমার কম্বলখানি সেই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই তাঁহার গায়ে দিয়া, আমি কিছুক্ষণের জন্য সেই স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলাম। সাধু এমনি একাগ্রচিত্তে বসিয়া ধ্যান করিলেন এবং এমনি স্বর্গীয় হাসিতে তাঁহার মুখখানি পূর্ণ হইল যে, বস্তুতঃই তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যেন তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবকে হৃদয়ে সাক্ষাৎকার করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন।

যাহা হউক্ কিছুক্ষণ পরে সেইখানে আসিয়া দেখিলাম যে, সাধু রন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সাধু রন্ধন করিতেছেন আর অনুচ্চ সুমধুর স্বরে মহাত্মা শ্রীতুলসীদাস কৃত রামায়ণ ও বিনয় পত্রিকা পাঠ করিতেছেন। আহা, ভক্তের মুখে সেই অমিয়রসাশ্রিত পদগুলি শুনিতে শুনিতে আমি যে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। বিনয় পত্রিকার ভজনগুলি এমনি সুন্দর যে, তাহা পাঠ করিতে করিতে সত্যই যেন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যলীলা সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। একে স্বর্গোপম তীর্থ দর্শনের আনন্দ, তাহার উপর পবিত্র সাধুসঙ্গলাভে গুপ্তকাশীতে আমি যে পরমানন্দ অনুভব করিলাম, তাহার তুলনা এ জগতে আর কোথাও নাই। তাহার পর সাধু রন্ধন করিয়া শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিলেন। পরম পরিতোষ সহকারে আমি সেই প্রসাদ পাইলাম। সাধুর তো এক কৌপীন সম্বল, অথচ কোথা হইতে যে, তিনি ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া পথে যাইতে যাইতে প্রত্যহ সাধু ভোজন করাইতেন, তাহা বলিতে পারি না। আমার সহিত আরও দুই একজন সাধুকে তিনি ভোজন করাইলেন। আমাদিগকে ভোজন করাইয়া অত্যল্পমাত্র প্রসাদ যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহাই ভোজন করিয়া তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন।

তাঁহার ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া আমাকে বিস্ময়ান্বিত হইতে হইল। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তিনি গুপ্তকাশী হইতে আর কেদারাভিমুখে যাত্রা করেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, "শ্রীকেদারনাথ

আমাকে এইখানেই দয়া করিয়া দর্শন দিয়াছেন আর আমি তথায় গিয়া কি করিব?" ধন্য তাঁহার বিশ্বাস ও ধন্য ভগবানের দয়া !!! ইহাকেই বলে, "বিশ্বাসের ভগবান্"। বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলেই মনুষ্য এই ভিক্ষু সাধুর ন্যায় হৃদয়, প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস লাভ করিতে পারে। এইরূপ নিঃস্ব, কৌপীনধারী মহাপুরুষগণই আপন মুখের অন্ন দানে প্রত্যহ নীরবে কত শত জীবের জীবন রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের বিলুপ্তপ্রায় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং ইঁহাদের আত্মত্যাগ ও চরিত্র বলেই যে, কণ্ঠাগত-প্রাণ ভারতের পরমায়ু এখনো শেষ হয় নাই, তাহা বোধ করি শিক্ষিত, স্বদেশহিতৈষিগণের মধ্যে অনেকেই অবগত নহেন। আত্মত্যাগপরায়ণ, পরমোদার পবিত্র মহাপুরুষচরিত্রই জাতীয়-জীবনের মুখ্য উপাদান। শত শত অন্তঃসারশূন্য সভা সমিতি ও নিবেদন আবেদনে যাহা না হয়, এইরূপ একটী মহাপুরুষচরিত্রের বলে তাহা অতি সহজেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। আজ যদি ভারতে এইরূপ মহাপুরুষ-চরিত্রের বিরল দৃষ্টান্ত দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এতদিন ভারতও অন্যান্য প্রাচীন সুসভ্য দেশসমূহের দশা প্রাপ্ত হইত।

জনৈক পাহাড়ীর মুখে শুনিয়াছিলাম যে, গুপ্তকাশী হইতে ৺কেদারের পথে ফাটাচটী নামক চটিতে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে সেই অঞ্চলের পাহাড়ীরা ফাটাচটীর স্বামী বলিত। তিনি তিব্বতে গিয়া কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন, আমারও কৈলাস দর্শনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সেই পাহাড়ী আমাকে তাঁহার নিকট তিব্বতে যাইবার সুগম পথ প্রভৃতি জানিয়া লইতে পরামর্শ দেয়। সেই অবধি আমার ফাটাচটীর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ ইচ্ছা হয়। গুপ্তকাশীতে পঁহুছিয়া শুনিলাম যে, ফাটাচটীর স্বামী এক্ষণে ওখিমঠে আসিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি ভাবিলাম যে, কি জানি, যদি তিনি ওখিমঠ হইতে আবার কোথাও চলিয়া যান, তাহা হইলে আর আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না সুতরাং আমি গুপ্ত-কাশী হইতে ওখিমঠাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

গুপ্তকাশী হইতে ওখিমঠ যাইতে হইলে প্রকাণ্ড দুইটী পর্ব্বতের একটী সুদীর্ঘ চড়াই ও একটী ওৎরাই করিতে হয়। প্রথমতঃ ওৎরাই। গুপ্তকাশী হইতে নামিতে নামিতে সেই প্রকাণ্ড পর্ব্বতের পাদমূলে একেবারে মন্দাকিনীর তীরে

আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার পর একটী পাকা সেতুতে পার হইয়া আর একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। একটী পর্ব্বত হইতে নামিতে ও আর একটী পর্ব্বতে উঠিতে আমার অনেক সময় লাগিযাছিল; তবে গুপ্তকাশী হইতে ওখিমঠের দূরতা সম্বন্ধে আমার ঠিক স্মরণ না থাকায় আমি তাহা ঠিক করিয়া লিখিতে পারিলাম না। প্রাতে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, বেলা প্রায় দশটার সময় ওখিমঠে গিয়া পঁহুছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ওখিমঠটী অত্যুচ্চ সুবৃহৎ একটী পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। ওখিমঠ হইতে উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করিলে ৺কেদারের চিরতুষারমণ্ডিত মহান্ পর্ব্বত-পাথার অতি সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ওখিমঠ হইতে অপার চিরহিমানীর সুবিশাল দৃশ্য যেরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, গুপ্তকাশী হইতে সেরূপ দেখিতে পাই নাই। সেই প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপর উঠিতে আমার যে শ্রান্তি বোধ হইয়াছিল, তাহা ওখিমঠে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই দূর হইল। এমনি স্থানমাহাত্ম্য! পর্ব্বতের চড়াইটা এতই বড় যে, সেই দারুণ শীতেও আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া ওখিমঠে পঁহুছিলাম। তথায় পঁহুছিয়া গ্রামের বহির্ভাগে আমি এক স্থানে বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম এবং তথা হইতে যখন নগাধিপ হিমাচলের মহান্ বিচিত্র দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইল ও তাহার অপার গাম্ভীর্য্য আমি হৃদয়ঙ্গম করিলাম, তখন আমার পথশ্রান্তি ও ক্লেশ দূর ত হইলই বরং আমার হৃদয় আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইল এবং মনে হইল যেন তথায় পঁহুছিতে আমাকে আদৌ কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই।

সে যাহা হউক, এইরূপে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ৺কেদার হইতে ৺বদরী-নারায়ণের পথে ওখিমঠ একটী প্রধান তীর্থ, গ্রামও সর্ব্বতোভাবে দর্শনীয় স্থান। শুনিলাম, দেবাদিদেব মহাদেবের পরম ভক্ত বাণরাজার পুরী এই ওখিমঠেই ছিল এবং বাণরাজকন্যা উষা-হরণাভিনয় এইখানেই হইয়াছিল। হিন্দীভাষাভাষীদের মধ্যে অনেকেই মূর্দ্ধণ্য "ষ"কারের উচ্চারণ "খ"কারের ন্যায় করেন বলিয়া "উষা"কে "উখা" বলেন এবং উষার নামানুসারেই "উষামঠ" "উখামঠ" হয়, তাহার অপভ্রংশ হইয়া সেই "উখামঠ" ক্রমশঃ "ওখিমঠে" পরিণত হইয়াছে। গ্রামে পঁহুছিয়াই আমি সেই ফাটা-চটীর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

এইখানে একটী ছোট সরকারী ডাক্তারখানা ও আরোগ্যশালা আছে। ৺কেদার বদরীনারায়ণের পথে স্থানে স্থানে গভর্ণমেণ্ট এইরূপ আরোগ্যশালা করিয়া যাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। স্বামীজি ডাক্তারখানাতেই ছিলেন, কারণ, সেইখানকার ডাক্তার মহাশয় তাঁহার একজন ভক্ত। স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি উক্ত ডাক্তার মহাশয়কে আমার ভিক্ষার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি সেই ডাক্তারখানার একটী ঘরে বসিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে, তিনি বহু-তীর্থ দর্শন করিয়া প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ সেই সুদূর হিমপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছেন। অত্যন্ত শীতে বালকগণের শরীর যেমন ফাটিয়া যায়, তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ সেইরূপ ফাটিয়া গিয়াছে দেখিলাম। বহুকাল অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশে অবস্থিতি করিয়া বা অন্য কোন কারণে তাঁহার শরীরের সেই অবস্থা হইয়াছিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন হয় নাই। সুদীর্ঘকাল যাবৎ দেশত্যাগী হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিতি করায় তাঁহার আচার ব্যবহারও অনেকটা পাহাড়ীদের মত হইযা গিয়াছিল। এই যাত্রার কয়েকমাস ভিন্ন তাঁহার সহিত আর ভিন্নদেশীয় লোকের সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অন্যান্যদেশীয় যাত্রিগণের মধ্যে আবার বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প! সুতরাং বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ ঘটিত না। কদাচিৎ কোন বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আহার্য্য ডাল ও আটা প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিতেন। স্বদেশীয় জ্ঞানে বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। পাহাড়ীরা তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিত। যাহা হউক, তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ আর কোন কথা স্মরণ নাই।

ফাটাচটী হইতে তাঁহার সেই খানে সেই দিন আসিবার কারণ শুনিলাম যে, এলাহাবাদ মিউর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই দিন ৺কেদার দর্শন করিয়া সেইখানে আসিয়া পঁহুছিবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসেই তিনি তথায় আসিয়াছিলেন। তাহার পর আমি তাঁহাকে তিব্বতে যাইবার পথ ঘাট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, ৺বদরী-

নারায়ণের নিকটবর্ত্তী যোষীমঠ হইতে নীতি ঘাট বা পাস দিয়া তিনি এক বৎসর তিব্বতে গিয়া কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। আমাকেও তিনি নীতি ঘাট দিয়া তিব্বতে যাইতে পরামর্শ দিলেন এবং সেই পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম হইবে বলিলেন। ৺বদরীনারায়ণ হইতে মানা ঘাট বা পাস দিয়াও তিব্বতে যাইবার একটী পথ আছে, কিন্তু সেই পথে গেলে কৈলাস ও মানস সরোবর কিছু দূর হইবে বলিলেন। তিব্বত যাত্রার বহুবিধ কষ্ট ও বিপদের কথা তিনি বলিলেন এবং অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রম সহিষ্ণু হইয়া, এমন কি, প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে না পারিলে যে, কৈলাস ও মানস সরোবরের দর্শন করা যায় না, তাহাও তিনি এই একটী প্রবাদবাক্যে আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, যথা,—"মান্ সরোবর কৌন্ পর্ সে বিনা বাদর্ হিম বর্ সে, উড়ত কঙ্কর জীব তর্ সে"॥ অর্থাৎ, যে মানস সরোবরে বারিবর্ষণ না হইয়া কেবল তুষারপাত হয়, এবং প্রবল বায়ুতে পাথর উড়িয়া জীবকে ত্রাসিত করে, সেই মানস সরোবরের দর্শন-স্পর্শনের ভাগ্য কদাচিৎ কাহারও হইয়া থাকে। আমার কৈলাস মানস সরোবরে যাইবার একান্ত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ফাটাচটীর স্বামী আমাকে, যদি একেবারেই আমি অতিশয় শীত সহ্য করিতে না পারি ভাবিয়া, প্রথম বৎসর উত্তরাখণ্ডেই অতিবাহিত করিতে বলিলেন। কারণ, দ্বিতীয় বৎসরে কৈলাস যাত্রা করিলে আমার পক্ষে তিব্বতের নিদারুণ শীত আর সেরূপ দুঃসহনীয় হইবে না। যাহা হউক্, তিব্বতযাত্রা সম্বন্ধে আরও কয়েকটী আবশ্যকীয় কথা তিনি আমাকে বলিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি আমাকে শ্রীকেদারনাথের অগাধতুষাররাশিপূর্ণ, অত্যুচ্চ মহান্, অলঙ্ঘ্য এবং অতিশয় নিভৃতগিরিমধ্যস্থ কয়েকটী দর্শনীয় স্থানের কথা বলিলেন। যে বিরাট্, উত্তুঙ্গ, সুবিশাল গিরি-প্রস্তে স্বয়ম্ভুলিঙ্গাকারে শ্রীকেদারনাথ আবির্ভূত, সেই গিরিসানুর লোকলোচনের অতীত অতি দুর্গম নির্জ্জন প্রদেশে "চোরাবাড়ী" ও "বাসুকী তলাও" নামক দুইটী অতি রমণীয় সরোবর আছে। অঙ্গুষ্ঠপরিমিতা মন্দাকিনী চিরনীহারময় গিরিগাত্র হইতে সিকতারাশি ভেদ করিয়া যথায় বহির্গত হইয়াছেন, সেই মন্দাকিনীর মূল উৎপত্তিস্থানও সেইখানে। তাহার পর আর একটী দর্শনীয় স্থান আছে, "মহাপন্থ" বা "মহাপ্রস্থান"। সে মহাপথে অপার চির-

হিমানী পার হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি স্বর্গারোহণ যাত্রা করিয়াছিলেন। ৺কেদারনাথের মন্দির হইতে ২।৩ মাইলের মধ্যেই এই কয়েকটী স্থানের দর্শন হয়। একজন পাণ্ডা পথ-প্রদর্শক হইয়া না গেলে অপরিচিতের পক্ষে তথায় পৌঁছানো অসম্ভব। ফাটাচটীর স্বামী আমাকে পুনঃ পুনঃ উক্ত কয়েকটী স্থান দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

আমাদের পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে ৺কেদারনাথ দর্শন করিয়া আদিত্যরাম বাবু অশ্বারোহণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আদিত্যরাম বাবুর সহিত আমার এই প্রথম আলাপ; তাঁহার ন্যায় এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আমার যে, এই সুদূর গিরি-প্রান্তে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইবে, তাহা আমি একবারও ভাবি নাই। আদিত্যরাম বাবু সুশিক্ষিত এবং নিষ্ঠাবান্, ধার্ম্মিক হিন্দু সুতরাং তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তায় আমার ওখিমঠে এই একটা দিন অতিশয় আনন্দেই অতিবাহিত হইল। গড়োয়াল জেলার তদানীন্তন ডেপুটী কলেক্টার, আলমোড়া-নিবাসী, পণ্ডিত ভবানী দত্ত যোষী, আদিত্যরাম বাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তিনিই আদিত্যরাম বাবুর উত্তরাখণ্ড যাত্রার লোকজন দিয়া অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন এবং পথে যেখানে যে দর্শনীয় বিষয় আছে, তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। ৺কেদারনাথের মহত্ত্ব আমি ওখিমঠ হইতেই কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম, তাহার পর আদিত্যরাম বাবুর মুখে ৺কেদারনাথ শৃঙ্গের চমৎকার অপার বিচিত্র দৃশ্যের কথা শুনিয়া আমার মন অধিকতর ব্যাকুল হইল। আরও শুনিলাম যে, কে একজন সাহেব ভ্রমণকারী নাকি ৺কেদারনাথের সুমহৎ বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এরূপ সুন্দর ও মহৎ দৃশ্য তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। আদিত্যরাম বাবু অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক, তিনি বলিলেন যে, মায়ার এমনি অচিন্ত্য প্রভাব যে, তিনি ৺কেদারনাথে পঁহুছিয়াও আপন সন্তান সন্ততি মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহা হউক, নানা সৎপ্রসঙ্গে সেদিনটা আমাদের অতিশয় সুখেই অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যার সময়ে আমরা দুইজনে ওখিমঠের দেব দর্শন করিতে গেলাম। গিরিজাপতি কৈলাসনাথ মহাদেব এই মঠের প্রধান দেবতা।

দাক্ষিণাত্যের একজন জঙ্গম* সাধু এই মঠের মোহান্ত। ৺কেদার-নাথের মোহান্তও ইনি এবং বাবা কেদারনাথের পরিচারকবর্গের প্রধান আবাসস্থানও এইখানে। ওখিমঠ যেন বাবার হেড্‌কোয়ার্টার। যাত্রার সময়ে নানাদেশীয় যাত্রিগণের সমর্পিত বিপুল দ্রব্যসম্ভার বাবার মন্দিরে আহৃত হইয়া এইখানে সঞ্চিত হয়। ওখিমঠের মোহান্তজী তাহার একমাত্র অধিকারী। বাবা কেদারনাথের প্রিয়-ভক্তগণ-প্রদত্ত বিবিধ দ্রব্যসমূহের, মোহান্তজী একমাত্র সত্ত্বাধিকারী। এই হেতু ওখি-মঠের মোহান্তজীর ঐশ্বর্য্যও নিতান্ত অল্প নহে। যাহা হউক, আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবদ্দর্শনান্তে মোহান্তজীর নিকটে গিয়া বসিলাম। বাবা কেদারনাথের গদী, তাহার যেরূপ গুরুত্ব হওয়া উচিত, সে সমস্তই ছিল। সুন্দর একখানি চন্দ্রাতপের নীচে সুকোমল উচ্চাসনে বসিয়া মৃদুমন্দ হাস্য সহকারে মোহান্তজী আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। মোহান্তজী দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলকায় পুরুষ, এবং শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রু দেখিয়া তাঁহাকে আমি বৃদ্ধের শ্রেণীতেই ধরিলাম। বাবা কেদারনাথের বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী মোহান্তজী, সুতরাং তাঁহারও অতুল বিভব। মোহান্তজীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই চারিদিকে সোনা রূপার যেন ছড়াছড়ী বলিয়া বোধ হইল। মোহান্তজীর সম্মুখে দুইখানি বড় রূপার থালা, অশ্‌রফী (মোহর) ও টাকায় পূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে এবং সোনা রূপার আশা, সোঁটা, ছড়ী প্রভৃতিতে স্থানটীকে যেন পার্থিব ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত লীলাস্থল বলিয়া বোধ হইল।

ক্রমশঃ।

---

* জঙ্গম, লিঙ্গায়ৎ, লিঙ্গবন্ত. বীরশৈব একই সম্প্রদায়ের কয়েকটী বিভিন্ন নাম। অনুমান খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্যের কল্যাণ নামক নগরে প্রথম এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। বাসব নামক এক ব্যক্তি ইঁহাদের প্রধান আচার্য্য। তাঁহাকে ইঁহারা নন্দীর অবতার বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা শিবলিঙ্গের প্রধান উপাসক। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণ গলায় এবং মাথার পাগ্‌ড়ীতে শিবলিঙ্গ ধারণ করেন। কর্ণাটী ভাষায় লিখিত পুস্তকা-দিতে এই সম্প্রদায়ের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণাটক, তৈলঙ্গ ও মহীশূর প্রদেশে ইঁহাদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব এবং ইঁহাদের প্রধান মঠ মন্দিরাদিও তথায় দৃষ্ট হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

প্রথম প্রস্তাব।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া যে সময় তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে লাগিলেন, সেই সময় ভক্তেরা কথাপ্রসঙ্গে, কে কিরূপে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন, তাহার আলোচনা হইত। সে সকল কথা বার বার বলিয়া ও শুনিয়া পুরাতন হইত না। পরস্পর পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতাম ও মুগ্ধচিত্তে বক্তা বলিতেন এবং শ্রোতারা শুনিতেন। এরূপ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের সহিত আমার অনেকবার হইয়াছিল। পরমহংস-দেবের সহিত বিবেকানন্দের প্রথম মিলন কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বার বার শুনিয়াও আমার তৃপ্তিলাভ হইত না এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতাম। যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যেন আজ শুনিয়াছি, এইরূপ আমার স্মৃতিতে জাগরিত আছে। এবং সেই ঘটনা আমার যেরূপ মধুর বোধ হয়, আমার প্রকাশ শক্তির অভাব সত্ত্বেও "উদ্বোধনের" পাঠকের সে সকল কথা মধুর হইবে, এই ভরসায় প্রবন্ধ লিখিতেছি। আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব, তাহা সৌজন্য সহকারে দীনভাবে প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে বলিতে হয় বলিয়া যে বলি-লাম, তাহা নহে। আমি সত্যই অভাব অনুভব করিতেছি। হৃদয়-ভাবে উৎফুল্ল বিবেকানন্দের মুখ-কান্তি আমি দেখাইতে পারিব না। তাঁহার জগৎ-মুগ্ধকারী কণ্ঠস্বর, মসী-চিত্রিত অক্ষরে নাই। তাঁহার বলিবার ছটার অভাব। প্রতি কথায় গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি-রসের স্রোত পাঠক পাইবেন না। তথাপি আমার ভরসা, সে মধুর ঘটনা আমার নীরস ভাষা সরস করিবে।

ভক্তচূড়ামণি ৺ রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দত্তের সমভিব্যাহারে বিবেকানন্দ প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্যকালে শিক্ষক ছিলেন। বিবেকানন্দের সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরেশ্বর মহাদেবকে মানত করিয়া তাঁহার জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন; ক্রমশঃ বীরেশ্বর নাম "বিলে"

নামে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে "বিলে" বলিতেন। বিবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রাম দাদা বলিলেন,—"বিলে, কি এ দিক ওদিক ব্রাহ্ম সমাজে ঘুরে বেড়াস,—যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্‌বার ইচ্ছে থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল্।—এ দিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে না!" রামবাবুর সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র,পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া,তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বিবেকানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পরিচিত,এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের চাতালে লইয়া গেলেন বলিতে লাগিলেন, তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী করিলি? গৃহী লোকের সহিত কথা কহিয়া, আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া জুড়াইব!" বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রাম দাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম! সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা।" বিবেকানন্দ যখন বাড়ী ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ী আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার কথাই ভাবেন। এ কি—এরূপ তিনি কখনো দেখেন নাই! কিছুই বুঝিতে পারেন না—অথচ আকৃষ্ট!

খ্যাপার কথা রাম দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরিচয় পাইলেন,—খ্যাপা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আশৈশব তিনি কামিনী-বিদ্বেষী, শিশুকালে মৃণ্ময় শ্রীরামমূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন; কিন্তু যে দিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সে দিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভাল লাগিল না। যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কল্‌কে কিনিয়া আনিলেন, সেইটী মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভান করিয়া, বাল্য খেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশব কাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে যদিচ শিব-উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী পুরুষ কখনই সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ উচ্চ ত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই! স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ, সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। প্রেমের শৃঙ্খল দিন দিন তাঁহাকে প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খ্যাপার অমানুষিক প্রেম—এ প্রেম জগতে তিনি কোথাও পান নাই, গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন,—"শোন্ না, কথা শোন্ না।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—"কথা শুনিতে আসি নাই।" পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি করিতে আসিস্?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে দেখিতে আসি।" ত্রস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া, বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরুশিষ্যে প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন,—"ও তোমার মাথার ব্যারাম!" দেবদৃষ্টিতে পরমহংস যাহা দর্শন করেন, তাহা তার্কিক বিবেকানন্দ বলেন—"ও তোমার মস্তিষ্কের ভ্রম! অন্ধবিশ্বাসে সাকার মূর্ত্তি মান।" বিবেকানন্দ বলিতেন, এইরূপে তো তর্ক বিতর্ক করি। একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তুই অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?" (পরমহংসদেব অন্ধ বিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন), জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্? গদ গদ হইয়া বিবেকানন্দ বলিতেন, সেই দিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম! বলিতেন—অন্ধ-বিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক্, আমি স্বয়ং অন্ধ-বিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি, একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ যতই দেবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণই অযৌক্তিক হয়।

বিদ্যা বুদ্ধি যত ছিল, সব নাড়া চাড়া করিতে লাগিলাম, অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না। এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক-যুক্তি, সিদ্ধবিশ্বাসের নিকট কোনরূপে অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ, গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন—"না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।" কি রূপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে, সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড় বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্যও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়! গুরু উপদেশে ও সাধনায় চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন, সমাধি মস্তিষ্কের বিকার নয়, গুরুর নিকট সমাধি লাভের প্রার্থী হইলেন,—বলিলেন—"আমায় পরম পদার্থ নির্ব্বিকল্প সমাধি দান করুন! আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিব!" গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—এই নির্ব্বিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতৃপ্ত? ইহা তো পূর্ব্বে এক দিন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময়, তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তুমি ভয় পাইয়া বলিলে,—'করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা আছে!' দক্ষিণেশ্বরের এ ঘটনা কি, পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম,—একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদান মাত্রই সমস্তই শূন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"করো কি গো! আমার যে বাপ আছে—মা আছে!"

সমাধি লাভের প্রার্থী হইলে আমরা বলিতেছিলাম, গুরু, শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন—"জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আসো নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে—প্রার্থনা করিতেছ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য্য কর। জীবের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। একবিংশতিদিবস গতে শরীর ত্যাগ

হয়। তুমি শক্তিবান, সমাধিলাভের পরও ফিরিবে, তোমার মহাকার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য সমাধা না করিয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।

অকস্মাৎ এক দিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের একটি অবস্থা হইল, যে সকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, "যাহা চাও, তাহা এই, এই নির্ব্বিকল্প সমাধি! তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। কার্য্য করো, কার্য্যান্তে পাইবে।"

কি কার্য্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরুর কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দিহানচিত্ত। পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন। সম্পূর্ণ ভ্রম। এই মাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহা জ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহা ভক্তি আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত! উভয়ের একই ভাব, কার্য্যে ভিন্ন ভাব ধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান-আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদ গদ—ভক্তি-বিভোর মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন, জ্ঞান-ভক্তির পার্থক্য লোকে অজ্ঞান বশত করিয়া থাকে। জ্ঞান ভক্তি এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ, ভক্ত পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞান লাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব যে বলিতেন, "ভাগবত ভক্ত ভগবান", তাহা সত্য।

সামাজিক ছবি।

(নং ৩)

পর দিন দুপুর বেলা দ্বারে একখানি গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতে বৌ দাসীকে ডাকিয়া বলিল, "কেওয়াড় খোল দেও, সরলা দিদি আয়া।"

সরলা ভিতরে আসিয়াই "মণি, মণি" বলিয়া চারুবাবুর ভগিনীকে ডাকিতে লাগিল। বৌ তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "মণির ভাসুর এসেছে, সে বেরুবে না, তুমি যদি পার এসে বার কর।" দুজনে মণির ঘরে গিয়া দেখে, সুহাস মণির কাপড় ধরিয়া টানিতেছে এবং বলিতেছে, "আয়না, সরলা পিসী এসেছে।"

সরলা সুহাসকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিল এবং মণির পিঠে একটা কিল মারিল।

মণি বলিল, "আমি যাব না, লজ্জা করে।"

"তোমাকে ইচ্ছা করে যেতে হবে না, আমি টেনে নিয়ে যাচ্ছি." বলিয়া সরলা মণির হাত ধরিয়া বৈষ্ণবীর ঘরে লইয়া গেল। বৈষ্ণবী মণিকে বলিল, "কেন বোন, আমাকে এত লজ্জা কেন"?

সরলা বলিল, "এবার লজ্জা ভেঙ্গে গেছে"।

বৈষ্ণবী গাহিল,—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরং।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরং।
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং॥"

সরলা চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আপনি ত অতি সুন্দর গাহিতে পারেন! মনে হয় যেন নিয়মমত কোন ওস্তাদের কাছে শিখেছেন।"

বৈষ্ণবী বলিল, "যথার্থই আমি একজন ভাল গায়িকার কাছে শিখেছি।"

গান শুনিয়া পিসীমা আসিলেন এবং সরলাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

সরলা বৈষ্ণবীকে বলিল, "রামপ্রসাদী গান জানেন?"

বৈষ্ণবী কয়েকটি রামপ্রসাদী গাহিল, গান শেষ হইলে বৌ বৈষ্ণবীর দিকে দেখাইয়া বলিল, "সরলা, ইনিও তোমার মত বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী।"

সরলা। "বটে, কিন্তু আমার মত কিছু বদ্‌লে গেছে ভাই। আমি বলি, বিধবাদের বিবাহ দেবার জন্য হাঙ্গামা না করে, স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার করা হোক। শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীনতা পেয়ে মেয়েরা আপনাদের ইচ্ছা মত বিবাহ করবে বা করবে না। যদি উচ্চ শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা বুঝ্‌তে পারে, বিবাহই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, তা ছাড়া আরো বড় জিনিষ আছে, তাহলে জবরদস্তি সমাজে বিধবা বিবাহ চালান একটা মহাভুল হয়ে যাবে!"

বৈষ্ণবী। "কিন্তু যতদিন মেয়েরা ঐ শিক্ষা ও স্বাধীনতা না পায়, তত দিন কি হবে?"

"ততদিন বিশেষ করে বিধবাদের পড়া শুনা ও কায কর্ম্ম শেখান হোক, যাতে তাদের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট ও অপর মনকষ্ট না হয়।"

"আপনি ঐ কথা বলে কুমারীদের জবরদস্তি বিবাহ বন্ধ করতে পারবেন কি? তা যদি না পারেন, তবে বিধবাবিবাহ না হয় কেন? যখন শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রভাবে বিবাহ বন্ধ হবে, তখন এক সঙ্গে দুই বন্ধ হবে।"

"কি কুমারীর, কি বিধবার, জবরদস্তি বিবাহ দেওয়া যদি খারাপ বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে খারাপের যত কম হয় ততই ভাল না? মনে করুন, গোড়াতেই কুমারীর জবরদস্তি বিয়ে বন্ধ করা গেল না, বিধবার যদি পারা যায় তা হলে মন্দের ভাল হল না? কতকটা লাভ হল ত?"

"ওকথা বুঝ্‌তে পারিনা। জবরদস্তি বিবাহ আর বিবাহ না হওয়া, এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটি আমার ভাল বোধ হয়। অবশ্য আমার মতে সেই বিবাহই ঠিক, যাতে স্ত্রীপুরুষ স্বাধীনভাবে পরস্পরকে মনোনীত করে এবং যত দিন ইচ্ছা বিবাহবন্ধন রাখ্‌তে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে ততটা উন্নতি হওয়ার এখন অনেক বিলম্ব আছে। বর্ত্তমান সময় যেমন কুমারীর বিবাহ হয়, তেমনি বালবিধবারও হওয়া উচিত। পতি পাবার অবসর দুজনকে সমান দেওয়া উচিত।"

"কেন, বালবিধবারা একবার অবসর পেয়েছিল ত ?"

পিসীমা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সরলা, তুমি ঠিক বলেছ, মা। এই দেখ, আমি নয় বছরে বিধবা হয়েছি। আমার মন বোঝে, আমি পতি পেয়েছিলুম, কপালের দোষে হারিয়েছি। এতে সমাজের দোষ দিতে পারি না। কিন্তু দুষ্ট লোকে মণির আমার বিবাহ হতে দিলে না, ওর পতি লাভের অবসরই হল না, এতো পুরো মাত্রায় সমাজের দোষ ?"

সরলা বৈষ্ণবীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার ও আমার মনে কি হয় তা দেখ্‌লে ত হবে না! সমাজে, সাধারণতঃ বিধবা ও কুমারীদের এ সম্বন্ধে কি মনের ভাব দেখ্‌তে হবে। পিসীমা যা বল্লেন, তাই সমাজের—" সরলার কথা শেষ না হইতে হইতে মণি উঠিয়া গেল। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। সরলা বলিল, "এ বিষয়টি মণির সুমুখে আলোচনা করা ঠিক হয় নি।"

কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণবী বলিল, "আমার বোধ হয় যাদের সন্তান হয়নি, সেই সমস্ত বিধবাদের কুমারীর মত মনে করা উচিত। যাদের সন্তান হয়েছে, তাদের না হয় বিয়ে না দিবেন।"

সরলা। "ও কথাটা বড় পাকা নয়। যাদের সন্তান হয়েছে, তাদের পতির আবশ্যক বেশি। একবার বিধবাবিবাহ চলে গেলে, বয়সের গণ্ডি বা সন্তানের গণ্ডিতে বাগ মান্‌বে না। যার ইচ্ছা হবে, সেই বিয়ে কর্‌বে।"

"তাতেই বা ক্ষতি কি? সংসারে সব বিষয়ে কম্পিটিষন্ আছে, বিবাহেও হবে। যেমন ইউরোপে আছে।"

বৌ। "কি বল্‌লে, বাঙ্গালায় বল। আমরা যে ইংজিরি জানি না।"

সরলা। "উনি বল্‌ছেন, সংসারে যেমন সব বিষয়ে প্রতিদ্বন্দিত্ব আছে, পরস্পর লড়ে, টক্কর দিয়ে, যে বলবান বা কৌশলী, সেই যেমন জেতে, বিবাহেতেও তাই হোক। কিন্তু এ প্রশ্নটি অতি গুরুতর। ইউরোপে ঐ প্রথা আছে বলে এদেশেও যে তাই করতে হবে, তার মানে কি ?"

বৈষ্ণবী। "মানে আর কিছু নয়, সকলকে সমান অধিকার দেওয়াই হচ্চে, ন্যায়। সব বিষয়ে সকলের সমান অধিকার আছে, যার যা দরকার, চেষ্টা চরিত্র করে লাভ করুক। কতকগুলো কুসংস্কার, অথবা সমাজ, লোকের স্বাধীনতা বা সুখে বাধা দেয় কেন ?"

সরলা। "স্ত্রীপুরুষ সকলে সমান অধিকার, স্বাধীনতা পায়, এই ত সভ্যসমাজের লক্ষ্য ও গতি। তবে এক রকম জবরদস্তি স্বাধীনতা দেওয়া আছে, যা পরাধীনতার চেয়ে অনিষ্টকর। স্বাধীনতা সামর্থ্যের সঙ্গে যায়, অসমর্থের স্বাধীনতা অশেষ কষ্টজনক। মেয়েদের লেখা পড়া, উচ্চভাব, উচ্চ আদর্শ প্রভৃতি শেখালে তারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারলে আপনাদের সমস্যা আপনারা মীমাংসা করতে পারবে। কানুনে কি দুর্ব্বলকে বলবান করতে পারে?"

"তোমরা বস মা, আমি ওদিকে যাই।" বলিয়া পিসীমা উঠিলেন।

"আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, আমি একবার মণিকে দেখি," বলিয়া সরলাও উঠিয়া গেল। মণির ঘরে গিয়া দেখিল, সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বলিল, "পোড়ার মুখ উঠে এলে যে?"

"পিসীমা কাঁদ্‌ছিলেন, আমি ভাব্‌লুম, আমি উঠে এলে, তিনিও উঠে আস্‌বেন।"

"এ বৈষ্ণবী কে বল্ দেখি? এর বিষয় কিছু শুনেছিস?"

বৈষ্ণবী বৌকে নিজের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিল, মণি সরলাকে বলিল।

সরলা শুনিয়া বিস্মিত হইল,—"তাইত, মেয়েটিকে আশ্চর্য্য বল্‌তে হবে ত। কথাবার্ত্তা ক'য়ে, এর সব মনের ভাব, জীবনের কি উদ্দেশ্য করেছে, জান্‌তে হবে। যদি আজ একে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাই, তোর দাদা কিছু মনে কর্‌বে কি?"

"দাদা কিছু মনে কর্‌বে না। কিন্তু ওকে তোমার বুড় কর্ত্তাটির মনে না ধরে যায়।"

"যার সমুদ্রে বাস, তার শিশিরে কি ভয়? ওকে সঙ্গে নিয়েই যাই, সব জান্‌বো এখন।"

"ভাল। শেষ কালে আমাদের দোষ দিও না যে, আর একটি সতীন পছিয়ে দিয়েছি।"

"না, তোকে দোষ দোবো না। এখন আয়, খাবার কথা বলিগে।"

সরলা বলিবামাত্র বৈষ্ণবী যাইতে সম্মত হইল এবং সরলা ছাড়িয়া দিলেই ফিরিয়া আসিব বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইল।

কিছু জলযোগের পর সরলা বিদায় লইল এবং বৈষ্ণবীকে লইয়া গাড়িতে বসিল। গাড়ি চলিল।

"ধর্ম্ম বিষয়ে আপনার কি মত," সরলা জিজ্ঞাসা করিল।

"কোন মতই নাই। অতীন্দ্রিয় কিছু আছে কি না জানি না। তবে বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থায় সমাজে বোকা লোকদের জন্য একটা ধর্ম্মবন্ধন দরকার, বোধ হয়।"

"আপনি একজন এগনষ্টিক দেখ্ছি," সরলা হাসিয়া বলিল।

"এগনষ্টিক এবং ফ্রিলান্স্," বৈষ্ণবী হাসিয়া উত্তর দিল।

"আপনি এতদিন এদেশ ওদেশ ঘুর্ছেন, এমন কোন লোক দেখেন নি যে, ভগবান্ সাক্ষাৎকার করেছে?"

"না। অধিকাংশ লোকই ধর্ম্ম কর্তে সেল্ফ-হিপ্নটিজ্ম্ করে বসে আছে। কতকগুলো আছে জুয়াচোর, ধর্ম্মের নামে নিজের স্বচ্ছন্দ করে, যার মধ্যে আমি একজন; অবশিষ্ট গুলো ভেড়া। ফিলজফিতেও যেমন ভগবান্ পেয়েছে, ধর্ম্মেও তেমনি পেয়েছে। তবে দেখুন, যেদিন আমি প্রথম এখানে আসি, ষ্টেশনের কাছে ধর্ম্মশালায় একজন পরমহংসকে দেখেছিলুম, সে লোকটা একটু ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে।"

"কি রকম বলুন দেখি?"

"অল্পক্ষণ তার সঙ্গে কথা কয়েছিলুম, কিন্তু লোকটার জ্ঞান ও তেজ যেন আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। এক একবার মনে হয়, লোকটার সঙ্গে দেখা করি ও কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আবার সন্দেহ আসে, বলে, হয়ত সে তোমার চেয়ে বড় ফাঁকিদার। কিন্তু লোকটার রকম সকম দেখে বোধ হল, যেন কিছু পেয়েছে।"

"কোন্ দেশী লোক, কত বয়স, বলুন দেখি? আমাদের কর্ত্তার একটি বন্ধু একজন পরমহংসকে নিজের বাগানে এনে রেখেছেন। তাঁর সম্বন্ধে খুব ভাল রিপোর্ট শুন্ছি। কাল বেলা দুটার সময় সেই বাগানে সন্ন্যাসীর লেকচার হবে, পরে গাওনা বাজনা হবে। আমাদের কর্ত্তাও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।"

"তা হলে সেই পরমহংসই হবে। লোকটির বয়স ৩৫।৩৬, কোন্ দেশী লোক, বুঝ্তে পারিনি। আমি তার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথা কইলুম, সে বেশ বুঝ্তে লাগ্লো, কিন্তু আমাকে হিন্দিতে জবাব দিলে। বাঙ্গালী হলেও হতে পারে।"

গাড়ি থামিল। সইস আসিয়া দ্বার খুলিল। সরলা নামিয়া বৈষ্ণবীকে হাত ধরিয়া নামাইল। বৈষ্ণবী দেখিল, একটি বৃহৎ প্রাসাদে আসিয়াছে। সমস্ত সিঁড়ি ও মেজে মার্বল পাথরের, বড় বড় হল ও সুসজ্জিত ঘরের শ্রেণী, কতকগুলি দেশী ভাবে সাজান, কতকগুলি বিলাতী ভাবে, সম্মুখে শোভমান উদ্যান, বাটীর ভিতর যাইতে বৈষ্ণবী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল এবং সরলাকে বৈভবশালিনী জানিল।

সরলা অন্দরমহলে একটি সজ্জিত কামরায় বৈষ্ণবীকে লইয়া গেল, বলিল, "এই ঘরে আপনি থাকবেন," এবং একটি দাসীকে ডাকিয়া বৈষ্ণবীর সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিল ও জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি চা খান? আমি এই সময়ে চা খেয়ে থাকি।"

বৈষ্ণবী। "পেলেই খাওয়া যায়।"

দাসীরা চা আনিল। একখানি ছোট, গোল মেহগনির মেজের উপর দুধের মত সাদা গোল টেবিল ক্লথ বিছাইয়া উত্তম চীনে বাসনের টিসেট সাজান হইল। দুখানি গদিআঁটা গোল চৌকি পাশে পড়িল। সরলা ও বৈষ্ণবী কোচ হইতে উঠিয়া চৌকিতে বসিল।

সরলা। "আপনি চার সঙ্গে চিনি খান?"

বৈষ্ণবী। "খাই।"

চা খাইতে খাইতে সরলা বলিল,—"মরালিটি সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

"মরালিটি নামে এব্‌সলিউট্ কোন পদার্থ নেই, তবে কুসংস্কার আছে। আমার মতে ইন্‌টেম্‌পারেট্ না হয়ে আর ঢাক না বাজিয়ে সব রকমের আনন্দ ভোগ করা যেতে পারে। সমাজের পায়ের ফোস্‌কা না মাড়ালেই হল——"

"বাবু ভিতরে আস্‌ছেন," একটি দাসী আসিয়া বলিল।

সরলা। "কর্ত্তাকে এখানে চা খেতে ডাক্‌তে পারি?"

বৈষ্ণবী। "স্বচ্ছন্দে।"

সরলা আগু বাড়িয়া দুর্গাদাস বাবুকে সেই ঘরে ডাকিয়া আনিল। বৈষ্ণবীকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ আমাদের বাড়ীতে কে এসেছেন।"

"কে ইনি?"

"ইনি একটি উচ্চ শিক্ষিতা ও লিবারেল আইডিয়ার ভদ্রমহিলা, এঁর সঙ্গে আলাপ করে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। সংগীত বিদ্যাতেও ইনি খুব

পটু। চারুবাবুদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেখানে ইনি ছিলেন, আমি ধরে এনেছি।”

দুর্গাদাস বাবুর জন্য আর একখানি চৌকি আসিল, তিনি সেইখানেই চা খাইতে বসিলেন, “তা বেশ। আমাকে এখনি একটা মিটিংএ যেতে হবে। সকাল সকাল আস্‌তে পারি ত এঁর সঙ্গে ভাল করে আলাপ কর্‌ব। তুমি একবার এস,” বলিয়া দুর্গাদাস বাবু সরলাকে লইয়া গেলেন।

“এখানকার স্কুলের ফণ্ড্ বাড়াবার জন্য কমিসনার মিটিং কর্‌বেন। সম্ভবতঃ মিটিংএতেই চাঁদা দিতে হবে। চেক বইখানা বার করে দাও।”

সরলা লোহার সিন্ধুক খুলিয়া চেক বহি বাহির করিতে লাগিল। দুর্গাদাস বাবু বলিলেন,—

“এ বৈষ্ণবীর চেহারা দেখে মহা চতুরা বলে বোধ হয়, এর রকম কি বল দেখি?”

সরলা বৈষ্ণবী সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিল, বলিল। দুর্গাদাস বাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

একটি সুন্দর সুসজ্জিত ঘরে, কোচ, সোফা, গদিআঁটা চৌকি অনেকগুলি, মাঝখানে একখানি টেবিলে ফুলদানে মস্ত একটি ফুলের তোড়া, মার্বলের মেজেতে বহুমূল্য কার্পেট, উপরিভাগ হইতে একটী বৃহৎ ল্যাম্প ঈষৎ নীলাভ ঘরভরা আলো দিতেছিল, দেওয়ালে রূপ, যৌবন, হাব, ভাব ও প্রণয়-ব্যঞ্জক বড় বড় ছবি—সন্ধ্যার পর সরলা বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া আনিল। দুর্গাদাস বাবু একখানি সোফাতে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, অল্পক্ষণ হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন, বলিলেন, “তুমি একটু হারমনিয়ম বাজাবে, উনি গাইবেন?”

সরলা বৈষ্ণবীর দিকে চাহিল। বৈষ্ণবী বলিল, “বেশ ত।” সরলা টেবিল হারমনিয়মের নিকট বৈষ্ণবীকে লইয়া বসিল, বলিল, “আমি কি এঁর সঙ্গে বাজাতে পার্‌ব।”

বৈষ্ণবী গাহিল।

গান শুনিয়া দুর্গাদাস বাবু অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং আর একটা গাহিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাজাইবার জন্য সরলাকেও বাহবা দিলেন। এই প্রকারে গানের পর গানে প্রায় এক ঘণ্টার উপর হইয়া গেল। দুর্গাদাস বাবুর বাহবা আর ধরে না। পরে “তোমরা

একটু বিশ্রাম কর, আমি আস্‌ছি” বলিয়া তিনি বাহিরে গেলেন। তাঁহার ফিরিতে বড় বিলম্ব হইল না। হুইস্‌কি রসে রসিক হইয়া আবার আসিয়া আপনার জায়গায় বসিলেন এবং বৈষ্ণবীকে বলিলেন,—

“আপনাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মকে প্রেমের ধর্ম্ম বলে, এ প্রেমের মানে কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?”

“প্রেম মানে অনেকে অনেক কথা বলেন, কিন্তু বৈষ্ণবদের অনুষ্ঠান ও ভিতরের ভাব দেখে এক প্রকার ফ্রিলভের ডিইফিকেসন বলে মনে হয়। রূপ, যৌবন, প্রণয়ের পূজা বৈষ্ণব ধর্ম্ম, অন্ততঃ প্র্যাকটিকালি তাই।”

সরলা। “আপনি কি বলেন, সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষের প্রেম বল্‌লে যা বুঝায়, বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রেমও তাই?”

“তা ছাড়া আর কি? মধুর ভাবের ভিত্তি হচ্চে স্ত্রী পুরুষের আকর্ষণ। হাজার সূক্ষ্ম করা যাক্, জিনিষ থাকে তাই।”

“কেন, বৈষ্ণবেরা বলেন, কাম গন্ধ থাক্‌তে সে প্রেম নয়?”

“ওটা ত কাযের কথা নয়, কেবল লোক দেখান, প্ররোচনা মাত্র।”

দুর্গাদাস বাবু। “তবে ধর্ম্ম কি হল?”

“তা ত এ পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারিনি?”

“কিছু আছে বলে মনে হয়?”

“কৈ? কখন সামান্য রূপ খেয়াল হয়, কিছু আছে। সেটা আবার মনে করি হয়ত হেরিডিটির শক্তি। বাস্তবিক কিছু ঠিক কর্‌তে পারিনি, তবে না'র দিকে পনর আনা।”

“মানুষের কিছু কর্ত্তব্য আছে?”

“কর্ত্তব্য, যাতে মনের ও শরীরের সুখ হয়, তাই করা। কুসংস্কার দূর করা, সকলকে সমান অধিকার দেওয়া, সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রচার করা, যাতে দেশের সকলের ও নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ হয়, সেই রূপ কায করাই কর্ত্তব্য, আর কি?”

“আপনি মদ খাওয়া খারাপ বলেন?”

“অতিরিক্ত খাওয়া খারাপ। নিয়মমত খাওয়ায় দোষ কি?”

“আপনি খেয়ে থাকেন?”

“আমরা বৈষ্ণব, আমাদের খেতে নেই।”

“আমি আস্‌ছি, তোমরা বস,” বলিয়া দুর্গাদাস বাবু উঠিলেন।

সরলাও উঠিয়া বলিল, "না, আমরা আর বস্‌ব না। ইনি ক্লান্ত হয়েছেন, এঁকে খাওয়াইগে, আবার কাল কথাবার্ত্তা কোয়ো।"

দুর্গাদাস বাবু অতি কষ্টে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া "আচ্ছা" বলিলেন এবং পুনরায় মদ্যপানে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতে চারুবাবু ও স্থানীয় একটি ভদ্রলোক, নাম লালা রামপ্রকাশ, দুর্গাদাস বাবুর বাটীতে আসিলেন। রামপ্রকাশ বাবু নিজের বাগানে পরমহংসকে রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মশালার কারিন্দার মুখে বৈষ্ণবীর বহু প্রশংসা শুনিয়া সে দিনের মিটিংএ তাহাকে নিমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে চারুবাবুর বাটীতে আসেন। বৈষ্ণবী সেখানে নাই শুনিয়া চারু বাবুকে সঙ্গে লইয়া ওখানে আসিলেন। খবর পাইতেই বৈষ্ণবী বাহিরে আসিল। আগন্তুকেরা নমস্কার করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইলেন।

বৈষ্ণবী। "আমি যেতে পারি, কিন্তু তাতে ফল কি?"

চারুবাবু। এঁর অভিপ্রায়, লোকে ধর্ম্ম বিষয়ে আপনাকে প্রশ্নাদি কর্‌বে, আপনি তাদের সদুত্তর দিয়ে সন্দেহ দূর কর্‌বেন।"

"ধর্ম্ম বিষয়ে আমারই কিছু স্থির হয়নি, আমি পরের সন্দেহ মেটাব কেমন করে?"

চারুবাবু তাঁহার সঙ্গীকে বৈষ্ণবীর কথা বুঝাইয়া বলাতে, তিনি বলিলেন, মায়ির বিনয় অসামান্য। যাহা হউক, মায়ি সেখানে উপস্থিত থাকিলে তিনি বড়ই আহ্লাদিত হবেন। আর সঙ্গীতেরও কিছু আযোজন হবে, মায়ি দয়া করে দু একটি গীত গাহিলে তিনি বাধিত হবেন।

চারুবাবু ঐ কথা গুলি বৈষ্ণবীকে বাঙ্গালায় তরজমা করিয়া শুনাইলেন। বৈষ্ণবী বলিল, "হাঁ, যা জানি, তাতে রাজি আছি। কখন যেতে হবে?"

"আমাদের সঙ্গে এখনই আস্‌বেন না? সকালে মেয়েরা পরমহংস বাবাকে দর্শন করতে আস্‌বে, আপনাকেও দর্শন কর্‌বে।"

বৈষ্ণবী সরলার কাছে বিদায় লইয়া আসিয়া চারুবাবু ও রামপ্রকাশ বাবুর সহিত তাঁহার গাড়িতে উঠিল। গাড়ি বাগানে গেল।

বাগানটি সুবৃহৎ। লাল খোয়ার সুন্দর রাস্তা। অসংখ্য ফুল ফলের গাছ। বাগানের তিনদিকে তফাতে তফাতে তিনখানি দোতালা বাড়ী। একখানি বাড়ী নানাপ্রকার সব্‌জি ও ফুলে সে দিন সাজান হইয়াছিল।

গাড়ি সেই বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে নামিয়া বাড়ীর উপরের তালায় উঠিলেন এবং একটি ঘরে, যেখানে একখানি কম্বলে একটি মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন।

রামপ্রকাশ বাবু সহাস্যে সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "মায়িকো লে আয়া হুঁ।"

সন্ন্যাসীও তাঁহাদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বৈষ্ণবী চারু বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনিই পরমহংস?"

চারুবাবু। "হাঁ।"

বৈষ্ণবী একদৃষ্টে সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল। বড় বড় চুল দাড়ি ছিল বলিয়া সে দিন চিনিতে পারে নাই! এ যে তাহার বাল্যের পরিচিত, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের ছেলে সুরেন! অল্প বয়স হইতে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিত, জোর করিয়া বিবাহ দেওয়াতে মাস খানেক পরেই কোথায় চলিয়া গেল, আর খবর পাওয়া যায় নাই। লোকে ভাবিয়াছিল, মারা গিয়াছে। চৌদ্দ পনর বছরে চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে কিন্তু এ ত সেই! বৈষ্ণবী চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেল। চারুবাবু বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। রামপ্রকাশ বাবু সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "আউরতেঁ আপকো দর্শন করনা চাতি হৈ।" সন্ন্যাসী তাহাদিগকে আসিতে অনুমতি দিলেন। রামপ্রকাশ বাবু চলিয়া গেলেন। ১৮।১৯টি স্ত্রীলোক আসিয়া ফুল, চন্দন, কর্পূর, খড়ুলি নারিকেল, কত প্রকারের ফল, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ প্রভৃতি সন্ন্যাসীর সম্মুখে রাখিল, পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূর জ্বালাইয়া আরতি করিল। সন্ন্যাসী শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাহাদের কত উপদেশ দিলেন। বৈষ্ণবীকে তাহারা প্রণাম করিল, কত কথা জিজ্ঞাসা করিল, বৈষ্ণবী শূন্যদৃষ্টিতে দেখিল মাত্র। বৈষ্ণবী কি ভাবিতেছিল?

ভাবিতেছিল, সুরেন আজন্ম শুদ্ধস্বভাব। ১৯।২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিল, চরিত্র ও বিদ্যাতে পাড়ায় তাহার সমান কেহ ছিল না। বৈরাগ্যবান হইয়া সে সংসার ত্যাগ করে, আজ ১৪।১৫ বৎসরের কথা। তাহার সঙ্গে ধর্ম্মশালায় আলাপে বুঝিয়াছিল যে, ধর্ম্ম তাহার কাছে আন্দাজ বা যুক্তির বিষয় নহে, পরন্তু অনুভবসিদ্ধ। সে বলিয়াছিল, পরমানন্দরূপী আত্মা প্রামাণিক বস্তু। সন্দেহ করাতে তীক্ষ্ণ তিরস্কার করিয়াছিল, "আদার ব্যাপারির জাহাজের খবর কি সাজে!" সুরেন তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল কি? তাহার গুপ্ত প্রণয়, পিত্রালয় হইতে পলায়ন প্রভৃতি সে

শুনিয়াছে কি? বৈষ্ণবী সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিল। তাহার বোধ হইল যেন সন্ন্যাসী তাহার মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাসিতেছে। আর চাহিতে সাহস করিল না, সেখানে বসিতেও পারিল না। "সুরেন অত শুদ্ধ ও শান্ত স্বভাব হইয়া তাহাকে ঘৃণা করিবে কি?" বৈষ্ণবী সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেল। বৈষ্ণবী ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, "দেখাই যাক্ ও কিছু বলে কি না, আমি কেন ধরা দোবো?" কিন্তু একবার যেন শুনিল, কে তাহাকে তাহার পুত্রের নামে "অনুপ" বলিয়া ডাকিল। শিহরিয়া সন্ন্যাসীর ঘরের দিকে দেখিল, কিছু দেখিতে পাইল না। ভাবিল, "আমার মনের ধোঁকা। মন চঞ্চল হয়েছে। স্নানটা করে ফেলা যাক্।" একটি কুয়ার দিকে গেল, কেহ নাই দেখিয়া স্নান করিল এবং আপনার কাপড় শুকাইতে লাগিল। ওদিকে রামপ্রকাশ বাবু ফিরিয়া আসিয়া বৈষ্ণবীকে না দেখিয়া চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে লাগিলেন এবং প্রায় ঘণ্টাখানেকের পর তাহাকে কুয়ার ধারে পাইলেন। প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপ্‌কো বহুত দেরসে ঢুঁড়তা হুঁ। প্রসাদ তৈয়ার হৈ, আইযেগা।"

সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবীকে এক স্থানেই ভোজন করিতে বসাইল। বৈষ্ণবীর খাওয়া হইল না, মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী একটী কথাও কহিলেন না।

আহারান্তে সন্ন্যাসী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। রামপ্রকাশ বাবু বৈষ্ণবীকে একটি দাসী সঙ্গে দিয়া নীচের তালায় একটি নিভৃত কামরা দেখাইয়া তাহাতে থাকিতে বলিলেন। বৈষ্ণবী দাসীকে বিদায় দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল এবং তাহার জন্য প্রস্তুত শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তার সাগরে ভাসিতে লাগিল।

অপরাহ্নে ক্রমশঃ বাগানের নিস্তব্ধতা কোলাহলে পরিণত হইল। গাড়িতে, বাইসিকলে, পদব্রজে, কত লোক আসিল। দাসী বৈষ্ণবীর দ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে উঠাইল। দ্বার খুলিতেই রামপ্রকাশ বাবু বলিলেন, "সব লোক আপকো ঠহর রহা হৈ, আপ আইয়ে।" বৈষ্ণবী গিয়া দেখিল, একটি বৃহৎ হল লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক পার্শ্বে একখানি টেবিলের কাছে একখানি চৌকীতে সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, একখানি চৌকী খালি রহিয়াছে। রামপ্রকাশ বাবু সেই চৌকীতে বৈষ্ণবীকে বসাইলেন এবং

নিজে একটু তফাতে গিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলেন। বিষয় "আত্মার অস্তিত্ব।" তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর স্বরে হল ভরিয়া গেল। তীক্ষ্ণ সারবান যুক্তিরাশি সন্দেহসমূহ ভেদ করিতে লাগিল। বল ও আশাপ্রদ বাক্যাবলী দুর্ব্বল ও নিরাশকে নবজীবন দিতে লাগিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিল, বক্তৃতার শেষে বহুক্ষণব্যাপী করতালি বাজিল। কেহ কেহ প্রশ্ন করিল; সন্ন্যাসী প্রীতিপূর্ণস্বরে তাহাদের সদুত্তর দিলেন। পরে দুর্গাদাস বাবু উঠিয়া সন্ন্যাসীকে বহুতর ধন্যবাদ দিলেন এবং জ্ঞাপন করিলেন, "এক্ষণে স্থানীয় অবৈতনিক নাট্যশালার যুবকদিগের গীতবাদ্য হইবে।"

হলের মধ্যস্থলে আপন আপন বাদ্যযন্ত্র লইয়া যুবকেরা বসিয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু বসিতেই বাজনা সুরু হইল। একটি তান বাজিল। রামপ্রকাশ বাবু বৈষ্ণবীর কাছে উঠিয়া গিয়া বলিলেন, "মায়ি, সবকো প্রার্থনা কি আপ পহলে এক ভজন শুনাওঁযে।"

বৈষ্ণবী গাহিল, সঙ্গে বাজনা বাজিতে লাগিল।

"প্রভু মেরো অবগুণ চিত না ধরো।
সমদরশী হৈ নাম তুমহারো॥
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নহি হোয়,
দুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী, এক নহর, বহত মিলি নীর ভরো।
যব মিলিতে তব এক বরণ হোয, গঙ্গা নাম পরো॥
এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥

গীতে একটী উন্মাদ ভাবলহরী বহিতেছিল, যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ মগ্ন হইল, এবং বৈষ্ণবীর স্বর, সুর লয় বোধ, নিপুণতা প্রভৃতি অলক্ষ্য হইয়া গেল। যেন বৈষ্ণবীর প্রাণ একটি জীবন্ত আর্ত্তনাদের প্রবল ঝড়ে পরিণত হইয়া সমস্ত দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মন্ত্রসৃষ্ট দেবতার মত, একটি সকরুণ প্রার্থনা মূর্ত্তিমতী হইয়া সকলের মনশ্চক্ষু ভরিয়া ফেলিল, গীত শুনিতে দিল না। কাহারও চক্ষের একবিন্দু জলও সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল না।

গান শেষ হইলে প্রথমে সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন, বৈষ্ণবী চৌকিতে ঢলিয়া পড়িয়াছে, নিস্পন্দ, সংজ্ঞাহীন। তখনি রামপ্রকাশ বাবুকে ইসারা করিয়া ডাকিয়া দুজনে পশ্চাৎদিক্ দিয়া চৌকি ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। দুর্গাদাস বাবু ও আর কয়েকটি লোক বাহিরে আসিলেন। তাঁহা- দিগকে বৈষ্ণবীর মুখে চোখে জল দিতে ও হাওয়া করিতে বলিয়া সন্ন্যাসী হলে ফিরিয়া আসিলেন এবং ইংরাজিতে বলিলেন, "চিন্তার কারণ নাই, সম্ভবতঃ উৎকট চেষ্টার নিমিত্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এখনি সুস্থ হইবেন, সংগীত আরম্ভ হউক।" সংগীত আরম্ভ হইল এবং রামপ্রকাশ বাবু ব্যতীত অন্য সকলে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি, বৈষ্ণবী সংজ্ঞালাভ করিলে দাসীর সাহায্যে বৈষ্ণবীকে তাহার কামরায় রাখিয়া, দুগ্ধাদি পান করাইয়া, তবে ফিরিলেন।

সভা ভাঙ্গিয়া গেলে দুর্গাদাস বাবু ও চারু বাবু উভয়েই বৈষ্ণবীকে নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। বৈষ্ণবী গেল না, সেখানেই সে রাত্রি থাকিবে বলিল। সন্ধ্যা হইতে রামপ্রকাশ বাবু চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী নিচে আসিয়া দাসীকে বলিলেন, "মাগিকি তবিয়ৎ আচ্ছা হৈ তো যঁহা বোলায় লাও।" দাসী খবর দিতেই বৈষ্ণবী আসিল, দেখিল, সন্ন্যাসী তাহার অপেক্ষায় বাটীর সম্মুখে পথে পাইচারি করিতেছেন।

"দেখ অনুপ!" বৈষ্ণবী চমকিয়া উঠিল, বলিল, "তুমি আমায় চিন্তে পেরেছ ?"

"আমি তোমাকে ধর্ম্মশালাতেই চিনেছি—সে যা হোক, আমি তোমাকে দুচারটি কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি।"

"সেই জন্যই ত আজ এখানে রইলুম।"

"আমার মনে হয়, তুমি এখনও ইচ্ছা করলে তোমার জীবন বদ্‌লে ফেল্‌তে পার। বুঝে দেখ, তুমি জান্‌বার চেষ্টা না করেই 'অতীন্দ্রিয় কোন ধর্ম্ম বা আত্মা বলে পদার্থ নাই,' 'ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া অন্য নিত্য সুখ কেবল মস্তিষ্কের বিকার মাত্র,' প্রভৃতি বলে থাক। অতীন্দ্রিয় কোন অবস্থা বা সুখ আছে কি না, তুমি বিধিমতে জান্‌তে চেষ্টা করেছ কি ? তুমি বুদ্ধিমতী, বিবেচনা কর, সব বিষয় শিখ্‌তে গেলেই অধিকারী হওয়া চাই। তুমি ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারিণী হতে যত্ন করেছ কি ? শমদমাদি সাধন করেছ ? কোন একটি সামগ্রী পাবার জন্য যাওয়া চাই উত্তরে, কোন লোক অনবরত দক্ষিণেই যদি যায়, আর বলে,

সে সামগ্রী নাই, তার কথা কি কাযের? এ পর্য্যন্ত তোমার অবস্থা কি ঠিক তাই নয়? কোন জিনিষ না দেখ্‌লে, না অনুভব কর্‌লে, ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় না। এবং কোন জিনিষ দেখ্‌বার বা অনুভব করার চেষ্টা না কর্‌লেও, জান্‌তে পারা যায় না। সাংসারিক সুখই সব, এই উপদেশ তুমি লোককে দিয়ে বেড়াও, স্ত্রীপুরুষে বাধারহিত স্বেচ্ছাধীন প্রণয়, ইন্দ্রিয়সম্ভোগ, সমাজ বন্ধনের অপসারণ প্রভৃতি শেখাও। তোমার জড়বাদ সত্য ও আত্মবাদ মিথ্যা হলে একদিন ও সব কথা বলা চল্‌তো। কিন্তু তুমি একটাকে সত্য, অপরটাকে মিথ্যা প্রমাণ কর্‌বার কি করেছ?"

"তুমি এ সব কথা বল্‌বে, আমি মনে করি নি। ঘৃণা করে দশটা কটু কাটব্য শোনাবে, ভেবেছিলুম। যা হোক, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বল্‌বে কি?"

"বল।"

"তোমাকে ছেলে বেলা থেকে শুদ্ধ ও সত্যবাদী ব্রাহ্মণসন্তান বলে জানি। তুমি আমাকে ঠকাবে না। আমাকে বল, তুমি নিজে অনুভব দ্বারা জেনেছ কি যে অতীন্দ্রিয় আত্মা আছে এবং সে আত্মানুভব সুখ-দুঃখাতীত আনন্দময়?"

"হাঁ, আমি অনুভব দ্বারা জানি যে, আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ।"

বৈষ্ণবী সন্ন্যাসীর পদতলে পড়িল। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিল, "তুমি আমার গুরু, আমার ত্রাণকর্ত্তা পিতা, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে এই আত্মবস্তু জান্‌বার উপায় বলে দাও।"

সন্ন্যাসী তাহাকে অভয় দিলেন।

* * * * *

পাঠক, বৈষ্ণবীকে চিনিলেন কি? ইনি আমাদের প্রথম ছবির পূর্ণ বাবুর বিধবা কন্যা।

"খ"

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহুবর্ষব্যাপী সাধনায় যে ভূমি তীর্থীভূত হইয়াছে, সেই পূতজাহ্নবীসলিলবিধৌত দক্ষিণেশ্বরস্থ রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে বিগত ২রা মাঘ শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক ভক্ত সাধক পরমহংসদেবের সাধনস্থান বলিয়া পবিত্র জ্ঞানে এবং স্থানের রমণীয়তায় আকৃষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া থাকেন। কিন্তু বিষয়ী লোকদের সব দিন সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। এই কারণে উৎসবের উদ্যোক্তাগণ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুবিধাকর রবিবার দিনে এই স্থানে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া এবং সমস্ত দিন আহিরীটোলা ঘাট হইতে ষ্টীমার যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরমহংসদেব যে গৃহে বাস করিতেন, তাহা অতি সুন্দর-রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। কাটোয়া হইতে এক বিখ্যাত কীর্ত্তন সম্প্রদায় আসিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ লীলাগান গাহিয়া ভক্তগণের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন। বরাহনগরের বিখ্যাত কথক নারায়ণদাস শিরোমণি মহাশয় কথকতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে অতি সরলভাবে ভগবত্তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। প্রসাদাদিও বিতরিত হইয়াছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লোকসমাগম ছিল।

গত ডিসেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মিশনের মান্দ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রাম-কৃষ্ণানন্দ টিনেভেলি (Tinnevelly) নামক স্থানে গিয়া তথায় ৬টী বক্তৃতা করেন। টিনেভেলির সন্নিকট নরসিংহ নেল্লুর নামক গ্রামস্থ "ব্রহ্মনিষ্ঠা মঠে"র অধ্যক্ষ করুণানন্দ স্বামী উক্ত মঠের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনেক সাধু মহাত্মাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং মান্দ্রাজে আসিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তথায় যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজি ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে মান্দ্রাজ হইতে রওনা হইয়া ২৫শে তথায় উপস্থিত হন। রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। তথা হইতে সমারোহের সহিত মঠে লইয়া যাওয়া হয়। মঠে

যাইয়া স্বামীজি পথকষ্টে ক্লান্ত থাকিলেও তত্রস্থ সকল লোকের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেন। তার পর উপর্য্যু-পরি তিন দিন তাঁহার ৩টী বক্তৃতা হয়। বিষয় (১) হিন্দুধর্ম্ম কি? (২) আত্মার স্বরূপ (৩) ভক্তি। ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে টিনেভেলি সহরের বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামীজি তথায় গমন করেন ও তথাকার বৃহত্তম শিবমন্দিরের বসন্তমণ্ডপে "মূর্ত্তিপূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় প্রায় ২।৩ সহস্র লোকের সমাগম হয়। বক্তৃতান্তে স্বামীজি শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেন। তাঁহার সহিত বহুসংখ্যক ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসাহান্বিত ও ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া সমস্বরে "নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে হর হর মহাদেব' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মন্দিরে প্রবেশ করে। তৎপরদিবস (৩০শে) স্বামীজির মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিবার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু সাধারণের নিতান্ত অনুরোধে সে দিবস তাঁহাকে তথায় থাকিতে হইয়াছিল। উক্ত দিবস তিনি "পরা ভক্তি" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিশের বন্দোবস্ত করিতে হয়। সকলেই নিতান্ত আগ্রহের সহিত স্বামীজির বক্তৃতা শ্রবণ করেন। স্বামীজির সকল বক্তৃতা-তেই ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য স্বামী সদানন্দ নামক জনৈক মালাবারি সন্ন্যাসী প্রত্যেক বক্তৃতার পরে উহা তামিল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। টিনেভেলির লোকেরা স্বামীজির বক্তৃতা ও চরিত্রে এত মোহিত হইয়াছিল যে, তিনি যখন তথা হইতে রওনা হন, তখন বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। ৩১শে ডিসেম্বর টিনেভেলি পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজি তৎপরদিবস মান্দ্রাজে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।

কনখল রামকৃষ্ণসেবাশ্রমের বিষয় উদ্বোধনপাঠকবর্গ অনেকেই অবগত আছেন। কলিকাতানিবাসী জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তায় আশ্রমের জন্য জমি খরিদ করা হয়, এ সংবাদও পাঠকবর্গকে দেওয়া হইয়াছে। আশ্রমগৃহ নির্ম্মাণ এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে। বিগত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের আশ্রমের জমাখরচ পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

জমা —		খরচ —	
পূর্ব্বের উদ্বৃত্ত—	৩৮০॥/১৫	খাইখরচ—	৭৭৬৶১৫
শ্রীশীতলাচরণ মুখো—	১০৲	ঔষধ—	৩১।/১৫
পরিচারক, রামকৃষ্ণসেবাশ্রম—	১৫৲	চাকরের মাহিনাদি	২০॥১৫
নরজন স্বামী রাজু—	৫৲	আলো—	৫।১৫
হর্শাদ রায় মেটা—	১৲	পোষ্টেজ—	৪॥৵০
লালা রাম সহায়—	৬৲	কাপড় চোপড়—	২।/১০
শিবপ্রসাদ অজিত্রল—	১২।৵০	আশ্রমের অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি	
ডি, কে, কার্ণি—	১৲		১২।৶০
চম্পক রাও—	৩০৲	দান—	১৲
রঙ্গদাস দ্বারা সংগৃহীত	৭৸০		১৫৫॥/১০
এ. সি, ভাট—	১৲		
ডাঃ নিতাইচাঁদ হালদার—	৫০৲	সর্ব্বশুদ্ধ জমা—৫৩৯॥৶১৫	
যদুপতি চট্টো—	২০৲	সর্ব্বশুদ্ধ খরচ—১৫৫॥/১০	
	৫৩৯॥৶১৫	হস্তে স্থিত— ৩৮৪৵৫	

এই টাকার মধ্যে ৭০৲ টাকা আশ্রমে কূপখননের জন্য প্রদত্ত। কলিকাতা বিবেকানন্দসমিতির সম্পাদক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয় উক্ত সমিতির তরফ হইতে দুই প্যাকেট কট্‌ন উল (Cotton wool) ও এক প্যাকেট ব্যাণ্ডেজ (Bandage) সেবাশ্রমে দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের জনৈক সহৃদয় বন্ধুর নিকট হইতে ৫ মণ ৩১ সের আটা, ৩ মণ ৫ সের চাল, ১ মণ ৩৫ সের ডাল ও ৯ টাকার দুগ্ধ পাওয়া গিয়াছিল। তাহার সমুদয় খরচ হইয়াছে।

এই কয়েক মাসে আশ্রম হইতে ৬৮৭ জন গরিব গৃহস্থ ও ২৫৬ জন সাধু ঔষধ লইয়া যান। ১৭ জন রোগীকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়।

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। উন্নত জীবন ও চরিত্রগুণে মহর্ষি নানাশাখায় বিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের সকলেরই বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন। হিন্দুসমাজও তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি

করিতেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তদবধি সমগ্র জীবন ধরিয়া উপনিষদের আদর্শানুসারে নিজ জীবন গঠন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শেষ জীবন তিনি একরূপ যোগধ্যান করিয়াই যাপন করিতেন—তাঁহার মন অধিকাংশ সময় অতীন্দ্রিয় রাজ্যেই বিচরণ করিত। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন মহর্ষির শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

কোন সহৃদয় বন্ধু 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রের ৫০ কপির এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম প্রদান করিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল স্কুল, কলেজ বা লাইব্রেরি উক্ত পত্র এক বৎসরের জন্য লইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা উহা বিনামূল্যে পাইবেন। স্কুল ও কলেজের পক্ষে হেডমাষ্টার বা প্রিন্সিপ্যালের স্বাক্ষরিত এবং লাইব্রেরি হইলে স্থানীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র ম্যানেজার, প্রবুদ্ধ ভারত, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় পাঠাইলে ইংরাজী ১৯০৫ সালের পত্র বিনামূল্যে পাইবেন।

বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতি স্বামী অভেদানন্দের The Scientific Basis of Religion (ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি) নামক বক্তৃতাটী প্রকাশিত করিয়া /০ আনা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন। প্রাপ্তিস্থান—৫৩ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার অথবা উদ্বোধন আফিস।

দুইটী বিপরীত শক্তি জগতে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। তন্মধ্যে একটীকে সাম্যকরী ও অপরটীকে বৈষম্যকরী নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা হইতেই সাধারণতঃ এই জগতের সকল বিভাগেই দুইটী করিয়া বিভিন্ন দল দেখা যায়। এক দলের মূলমন্ত্র সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা; অপর দল বলেন, মূর্খ, ভেদ জগতের সনাতন নিয়ম। এ নিয়ম ভঙ্গ করিবে কি করিয়া? এক দল বলেন, জাতিভেদ সকল অনর্থের মূল, অপর দল বলেন, ইহাই সকল সভ্যসমাজের ভিত্তি। এক দল বলেন, রাজা প্রজা ভেদ থাকিবার আবশ্যক নাই—এই মত হইতেই ডেমোক্রাট, রিপাব্লিকান, সোসিয়ালিষ্ট, এনার্কিষ্ট, নিহিলিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, অপর দল বলেন, রাজা দেবাংশ। চিরকালই এই মতদ্বৈধ বলিয়া আসিতেছে। তবে বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য জাতির সংঘর্ষে

ভারতে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের সবিশেষ বিকাশ হইয়াছে। প্রাচ্য বীরপূজক, পাশ্চাত্য সাম্যবাদী। ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, বিশেষ চিন্তার বিষয়।

মান্দ্রাজের বিশপ হোয়াইটহেড সাহেব নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী পত্রিকায় "ভারতে উচ্চশিক্ষা" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন,—"বর্ত্তমানে ভারতবাসীরা যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহা অতি অল্পদিন মাত্র আরম্ভ হইযাছে। সুতরাং ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, বলা যায় না। তবে তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ ত্রুটি লক্ষিত হয়। তাহার মধ্যে প্রধান ধর্ম্মশিক্ষার অভাব। অবশ্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যখন ভারতবাসীর শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সকল স্কুল কলেজে খানিকটা করিয়া বাইবেল পড়াইলে কতকটা ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবাসী যে ধর্ম্মে ও যে শাস্ত্রে বিশ্বাস করে না, সেই ধর্ম্ম ও সেই শাস্ত্র শিক্ষা দেওযাতে কি ফল? আর গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও এরূপ বিস্তারিত প্রচার কার্য্যে লিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এই সকল কারণে এক্ষণে ইংরাজী শিক্ষা ধর্ম্মসংস্রবশূন্য কেবল অর্থকরী বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইযাছে। অথচ প্রাচীনকালে ভারতের সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত জীবন ধর্ম্মভাবপূর্ণ ছিল। ইউ-রোপের ন্যায় এক আধ ঘণ্টা বাইবেল পড়ানই হিন্দু ধর্ম্মশিক্ষা বলিয়া বিবেচনা করে না। সেই ধর্ম্মশিক্ষা ভারত হইতে লোপ হইতে বসিযাছে, অথচ যদি ভারতের উন্নতির কোন আশা থাকে, তবে তাহা ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই হইবে।"

আমরা বিশপের কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। ধর্ম্মশিক্ষা যে সবিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা অতি সত্য। কিন্তু যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জীবনপ্রদ স্পর্শ আমরা না পাইতাম, তবে আজ চতুর্দ্দিকে যে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানপূর্ব্বক চর্চ্চা দেখা যাইতেছে, তাহা দেখা যাইত কি না সন্দেহ। ক্রমশঃ হিন্দুগণ যতই স্বধর্ম্মের মহিমা প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে কি কি শিখিবার, তাহাও জানিবে, ততই তাহারা নিজেদের শিক্ষাভার নিজেরাই গ্রহণ করিবে। কিন্তু আমাদের নিদ্রা যে এখনও সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই।

বিশপ তাঁহার প্রবন্ধে ভারতবাসিগণের মৌলিকতার অভাব প্রভৃতি আরও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অতঃপর শ্রীরামানুজ নম্মা আলোয়ার্ বা শঠারি বিরচিত সহস্রগীতি নামক তামিল প্রবন্ধমালা নিজ শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে ইহা মহাপূর্ণ ও মালাধরের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় অমানুষী প্রতিভাবলে তিনি বহুবিধ নূতন রহস্যার্থের অবতারণা করিয়া নিজ শিষ্যগণকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। উক্ত প্রবন্ধের একস্থলে শ্রীশৈল বা তিরুপতি নামক স্থানের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে—"এই শ্রীশৈল পার্থিব বৈকুণ্ঠ স্বরূপ। যিনি এখানে আজীবন বাস করেন, তিনি প্রকৃত বৈকুণ্ঠেই বাস করিয়া থাকেন এবং অন্তেও বৈকুণ্ঠগমন করিয়া শ্রীমন্নারায়ণের পাদচ্ছায়া আশ্রয় করেন।" পাঠ শেষ হইলে তিনি শিষ্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে, উক্ত শ্রীশৈলে গমনপূর্ব্বক তথায় আজীবন বাস করিতে সমর্থ?" তাহাতে শ্রীঅনন্তাচার্য্য নামক এক শান্ত শিষ্য কহিলেন, "প্রভো, যদি আদেশ করেন, তবে উক্ত গিরিবরে যাবজ্জীবন বাস করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করি।" শ্রীরামানুজ ইহাতে নিরতিশয় হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "ধন্য বৎস, তোমার ন্যায় কুলপাবন পুত্র যে বংশে জন্মিয়াছে, তাহার ভাগ্যের সীমা নাই। তুমি তোমার ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ হইলে। তোমার ন্যায় শিষ্য পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।" শ্রীমদনন্তাচার্য্য শ্রীগুরু-পাদ-বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীশৈলে প্রস্থান করিলেন।

যতিরাজ ইহার পর শিষ্যগণের সহিত বারত্রয় সমগ্র সহস্রগীতি অধ্যয়ন করিলেন। পাঠ পরিসমাপ্ত হইলে তিনিও শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া শ্রীশৈলোদ্দেশে গমন করিলেন। হরিনামসঙ্কীর্ত্তনই তাঁহাদের পাথেয় স্বরূপ হইল। তাঁহারা প্রথম দিবস দেহলীনগরে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। পর দিবস অষ্ট সহস্র নামক গ্রামের দিকে চলিলেন। উক্ত গ্রামে যজ্ঞেশ ও বরদা-চার্য্য নামক তাঁহার দুই ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমটি অতি ধনাঢ্য। তিনি ঐ শ্রীমান্ ব্যক্তির গৃহেই আতিথ্যগ্রহণমানসে আপনার সমভিব্যাহারী

দুইজন শিষ্যকে তাঁহাদের আগমন সম্বাদ দিবার জন্য অগ্রে প্রেরণ করিলেন। শিষ্যদ্বয় দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া এই শুভ সম্বাদ যজ্ঞেশকে নিবেদন করিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ পরিবারবর্গকে যতিরাজের অভ্যর্থনোচিত যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, ও সমাগত শ্রান্ত পথিকদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতে একবারে বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা গৃহস্বামীর এইরূপ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া শ্রীরামানুজ-সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্তই নিবেদন করিলেন।

যতিরাজ তাহাতে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বরদাচার্য্য নামক অন্য শিষ্যের আতিথ্য স্বীকার করিতে মনঃস্থ করিলেন। এই দ্বিতীয় শিষ্যটী বিদুরের ন্যায় দরিদ্র ও পবিত্রস্বভাব। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিনি অক্ষয়পাত্র (ভিক্ষাপাত্র) হস্তে লইয়া ভিক্ষাটন পূর্ব্বক বেলা দ্বিপ্রহরের পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা নারায়ণের সেবা করিয়া সতী সাধ্বী পরমলাবণ্যময়ী লক্ষ্মী নাম্নী সহধর্ম্মিণীর সহিত পরম সন্তোষে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার গৃহের পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কার্পাসবৃক্ষ থাকায় লোকে তাঁহাকে পরিহাসপূর্ব্বক কার্পাসারাম কহিত। যখন সশিষ্য শ্রীরামানুজ কার্পাসারামের গৃহে অতিথিরূপে প্রবেশ করিলেন, সেই সময় লক্ষ্মীদেবীর পতি ভিক্ষাটনার্থ গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। গৃহে কোনও পুরুষকে না দেখিয়া যতিরাজ অন্তঃপুরের দিকে গমন পূর্ব্বক আপনার আগমনসম্বাদ গৃহস্বামিনীকে উদ্দেশ করিয়া নিবেদন করিলেন। লক্ষ্মীদেবী তৎকালে স্নান করিয়া চীরখণ্ডধারণপূর্ব্বক বস্ত্র আতপতাপে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য স্বীয় গুরুর সম্মুখীন হইতে না পারিয়া করতালি-ধ্বনি দ্বারা ইঙ্গিতপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। যতি-রাজ তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশ হইতে আপনার উত্তরীয় গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী তদ্দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক গুরুসম্মুখে বহির্গতা হইলেন ও আনন্দে উন্মত্তা হইয়া বারবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! আমার স্বামী ভিক্ষাটনার্থ গিয়াছেন। আপনারা সুখে উপবেশন করুন। এই পাদপ্রক্ষালনার্থ জল গ্রহণ করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন। সম্মুখে পুষ্করিণী আছে, তথায় স্নান করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। আমি শীঘ্রই শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি গৃহাভ্য-

স্তরে প্রবেশ করিলেন। গৃহে তণ্ডুলকণা মাত্রও নাই। তিনি কি করিবেন, কিরূপে সেবা দ্বারা শ্রীগুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃতকৃতা হইবেন, এই বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

অতি সমীপে এক ধনাঢ্য বণিকের নিবাস। উক্ত শ্রেষ্ঠিনন্দন লক্ষ্মীদেবীর পরমমোহনরূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া গিয়াছিল। সে মদনাতুর হইয়া কতবার দূতী দ্বারা তাঁহাকে অর্থাদির প্রলোভন দেখাইয়াছে, কিন্তু কোনরূপেই তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় নাই। লক্ষ্মীদেবী ভাবিলেন, "অস্থিমাংসমলমূত্রময় দেহপিণ্ডের বিনিময়ে অদ্য শ্রীগুরুর সেবা করিয়া কৃতার্থ হই না কেন? কলিঘ্ন নামক এক পরম ভক্ত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় ইষ্টদেবতার সেবা করিয়াছিল। ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া কহিয়াছিলেন, 'মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি পুণ্যায় কল্পতে। মামনাদৃত্য তু কৃতং পুণ্যং পাপায় কল্পতে।' অতএব এই-ক্ষণেই আমি শ্রেষ্ঠীর নিকট গমন করিয়া, 'তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিব,' এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়া যাবতীয় অতিথিসৎকারোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনি।" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অপর দ্বার দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বণিকের সপ্তদ্বারসমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকায় প্রবেশ পূর্ব্বক একে একে দ্বার কবাট অতিক্রম করতঃ তাহার নিভৃত প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। তিনি তাহাকে দর্শন করিয়া আপনার মনোভাব এইরূপে ব্যক্ত করিলেন, "হে শ্রেষ্ঠিন্, অদ্য রজনীতে আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। আমার গুরু শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া অদ্য অতিথিরূপে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার সেবোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য আহরণ করিয়া এখনই পাঠাও। তাহা হইলেই তুমি সফলকাম হইবে।" বণিক্ ইহা শুনিয়া পরম বিস্মিত হইল। যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সে কতকাল ধরিয়া কত প্রলোভন দেখাইয়াছে, কত দূতী প্রেরণ করিয়াছে, ও পরিশেষে হতাশ হইয়া তদীয় সম্ভোগবাসনা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি কি না স্বয়ং অদ্য উপযাচিকা হইয়া তাহার নিকট আসিয়াছেন। তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে তখনই নানাবিধ উত্তম উত্তম দ্রব্য ভারে ভারে যুবতীর পশ্চাৎ প্রেরণ করিল।

লক্ষ্মীদেবী তৎসমুদয় লইয়া বিষ্ণুর নৈবেদ্য রন্ধন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া

সশিষ্য গুরুদেবকে ভোজনার্থ আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা অতি তৃপ্তির সহিত সেই সমুদয় ভোজন করিয়া তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অতঃপর তাঁহার পতি ভিক্ষাবৃত্তি সমাপন পূর্ব্বক গৃহে আগমন করিলেন ও সশিষ্য স্বীয় গুরুবরকে সন্দর্শন ও বন্দন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পত্নী তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদরের সহিত অমৃতোপম নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা সুতৃপ্ত করিয়াছেন, তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কপর্দ্দকশূন্য দরিদ্র। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কোথা হইতে উক্ত সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন, তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জায়াকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মীদেবী আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিয়া যুক্তকরে অবনতমুখী হইয়া পতিসম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বরদাচার্য্য ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, হর্ষাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া "ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহম্," বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি জায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অয়ি সাধ্বি, তুমি অদ্য তোমার সতীত্বের যথার্থ পরিচয় দিয়াছ। গুরুরূপী নারায়ণই একমাত্র পুরুষ এবং তিনিই যাবতীয় প্রকৃতিকুলের পতি। অস্থিমাংসময় দেহের বিনিময়ে তুমি যে অদ্য সেই পরমপুরুষের সেবা করিতে সমর্থা হইয়াছ, ইহাপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? অহো! আমি কি ভাগ্যবান্! কে বলে আমি দরিদ্র? তোমার ন্যায় পরম ভক্তিমতী রমণী যাহার সহধর্ম্মিণী, তাহার কি সৌভাগ্য!" এই বলিয়া রমণীর হস্তধারণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অনেকক্ষণ ধরিয়া দণ্ডবৎ পতিত রহিলেন। পরে দরিদ্র বরদাচার্য্য যতিরাজকে নিজ পত্নীর আচরণ নিবেদন করিলে, শিষ্যগণের সহিত তিনি চমৎকৃত হইলেন।

গুরুর আদেশানুসারে দম্পতি প্রসাদগ্রহণপূর্ব্বক, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলেন; পরে অবশিষ্ট সমস্ত প্রসাদ লইয়া উভয়ে বণিকৃগৃহে গমন করিলেন। বরদাচার্য্য বহির্দ্দেশে রহিলেন, লক্ষ্মীদেবী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তৎসমুদয় বণিক্‌কে গ্রহণ করিতে অনুনয় করিলেন। সে পরম আগ্রহের সহিত উক্ত প্রসাদ গ্রহণ করিল। অহো, সেই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের কি মাহাত্ম্য! ভোজন সমাপ্ত হইলে বণিক্ অন্য এক প্রকারের লোক হইল।

তাহার পূর্ব্ব কামপ্রবৃত্তি কোথায় প্রস্থান করিল! লক্ষ্মীদেবীকে কামভাবে দেখা দূরে থাকুক, তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া সে রোদন করিতে করিতে কহিল, "আমি কি ঘোর মহাপাতক করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। নিষাদ যেরূপ দময়ন্তীকে স্পর্শ করিতে গিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছিল, আমার অদৃষ্টে তাহাই ছিল, কিন্তু তোমার অপার করুণায় আমি এ যাত্রা জীবন লাভ করিলাম। মাতঃ, আমার অপরাধরাশি ক্ষমা কর এবং এই নরপশুর যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন শুদ্ধি হইয়া নরত্ব সম্পাদিত হয়, সেইরূপ বিধান কর। তোমার অভীষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করাইয়া আমায় কৃতার্থ কর।" সতী বণিকের এই বাক্যে যুগপৎ চমৎকৃত ও প্রীত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের যাবতীয় আবেগ দূর হইয়া গেল, সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল ভাবিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শ্রীগুরুর মহিমা সন্দর্শন করিয়া ভক্তিসাগরে নিমজ্জিতা হইলেন। পতির সহিত মিলিতা হইয়া সমস্ত কহিলে সেই দরিদ্র বিশুদ্ধ-হৃদয় ব্রাহ্মণ পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বণিক্‌কে সঙ্গে লইয়া শ্রীগুরুপাদমূলে উপনীত হইলেন এবং সকলে কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাগত হইয়া শ্রীপাদসম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

শিষ্যগণ এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার শ্রবণ ও দর্শন করিয়া যার পর নাই চমৎকৃত হইলেন এবং যতিরাজের অসীম শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আরও ভক্তিমান হইয়া উঠিলেন। শ্রীরামানুজ স্বীয় পবিত্রকর দ্বারা দম্পতি ও বণিক্‌কে স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের যাবতীয় দুঃখ বিনাশ করিলেন। বণিক্ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তিনি তাহাকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিলেন। তিনি বণিক্‌প্রদত্ত প্রভূত অর্থ দ্বারা দরিদ্র দম্পতির দারিদ্র্যদোষ বিনাশ ও তাঁহাদিগকে সর্ব্বরূপে সুখী ও নিশ্চিন্ত করিবার মানসে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে তাঁহাদিগকে অনুনয় করিলেন। ইহাতে দরিদ্র, শীলবান্ ব্রাহ্মণ গললগ্নীকৃতবাস হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "প্রভো, আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোনও অভাব নাই। ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা যাহা কিছু পাই, তাহাতেই আমাদের সমস্ত সঙ্কুলান হয়। অর্থ যাবতীয় অনর্থের মূল। ইহাতে ইন্দ্রিয়লৌল্য বৃদ্ধি করিয়া ভগবৎপাদপদ্ম হইতে চিত্তকে দূরে নিক্ষেপ করে। এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে এ অধমদাসকে অনুরোধ করিবেন না।" এতচ্ছ্রবণে যতিরাজ অতীব প্রীত হইয়া সেই নির্ম্মলস্বভাব পরম ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "অদ্য

আমি তোমার ন্যায় নিস্পৃহ, শান্তরসময় মহাত্মাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইলাম। তোমাদের পরমাভক্তি ও নিস্পৃহতা সকলেরই অনুকরণীয়।”

যখন তত্রত্য সকলে এই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময় যতিরাজের ধনাঢ্য শিষ্য যজ্ঞেশ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বগৃহে গুরুর জন্য ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, পরে যখন লোকমুখে শুনিলেন যে, তিনি দরিদ্র কার্পাসারামের সেবা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইযা ভাবিতে লাগিলেন, “আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে গুরুদেব আমার সেবা গ্রহণ করিলেন না? নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে; নতুবা জীবহিতচিকীর্ষাই যাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তিনি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে কৃতার্থ করিলেন?” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি কৃতাপরাধের ন্যায় ভয়ে ভয়ে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া শ্রীরামানুজান্তিকে উপনীত হইলেন ও তাঁহার পাদগ্রহণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যতিরাজ তাঁহাকে সাদরে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, “বৎস, তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি নাই, তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছ। তাহার কারণ বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবসেবার ন্যায় পরমধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই। তুমি সেই সেবায় অনাদর করিয়া অতি দোষযুক্ত হইয়াছ। পথশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত মদীয় শিষ্যদ্বয়ের প্রমুখাৎ আমাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তুমি তাহাদিগকে পাদধৌত করিবার জন্য জল দেওয়া দূরে থাকুক, একবার উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিতেও বল নাই। ইহাতে তোমার অতিশয় নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইয়াছে। এই জন্যই তোমার সেবাগ্রহণে আমার রুচি হইল না। এই কপর্দ্দকশূন্য অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ আমায় আজ কি অমৃতই ভোজন করাইয়াছে! তাহা কি তোমার ন্যায় ধনগর্ব্বিতের আতিথ্য গ্রহণ করিলে পাইতাম?” যজ্ঞেশ ইহা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে কহিলেন, “হে গুরো, ধনমদান্ধতার জন্য আমার এরূপ নৃশংসের ন্যায় আচরণ ঘটে নাই, কিন্তু আপনার আগমনজন্য উল্লাসই ইহার কারণ। আমি বড়ই দুর্ভাগ্য, কারণ, আপনার সেবায় বঞ্চিত হইলাম।” এই বলিয়া যজ্ঞেশ আপনাকে শত শত ধিক্কার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজ, শ্রীশৈল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই অনুতাপতপ্ত সরলহৃদয় ভক্তকে সান্ত্বনা করিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে সশিষ্য শ্রীরামানুজ অষ্ট সহস্র গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কাঞ্চিপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তথায় উপনীত হইয়া শ্রীবরদরাজ স্বামীর সন্দর্শন লাভ করতঃ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। পরে মহাত্মা কাঞ্চিপূর্ণের সহিত মিলিত হইয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। তথায় তাঁহারা ত্রিরাত্র বাস করিয়া কাপিল তীর্থে গমন করিলেন। সেখানে স্নানাদি করিয়া সেই দিবসই শ্রীশৈলের পাদদেশে উপনীত হইলেন। শৈল সন্দর্শনে তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেই ভূবৈকুণ্ঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন, "এই সেই মহাস্থল, যেখানে শ্রীহরি স্বয়ং লক্ষ্মীর সহিত বিরাজ করিতেছেন। অহো! এই জন্যই ইহার এরূপ দিব্য শোভা। পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যপুঞ্জ এই শৈলাকারে অবস্থিত। সেই মহাপুণ্যরাশির উপরই লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। আমি এই কলুষবহুল দেহ লইয়া এই পবিত্র শৈলোপরি আরোহণ পূর্ব্বক ইহাকে কলুষিত করিব না। এই স্থান হইতে ইহাকে প্রতিদিন দর্শন করিয়া আমার অশুচি দেহ মনকে পবিত্র করতঃ কৃতার্থ হইব।" এইরূপ স্থির করিয়া তিনি শ্রীশৈলের পাদদেশেই বাস করিতে লাগিলেন। তদ্দেশস্থ বিট্‌টলদেব নামক রাজা শ্রীরামানুজের আগমনসম্বাদ শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণের সহিত তাঁহার পাদমূলে উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব লাভের জন্য সকাতরে নিবেদন করিলে, করুণহৃদয় যতিরাজ সংস্কার দ্বারা তাঁহার শুদ্ধিবিধান করিয়া আপনার শিষ্যরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। বিট্টলদেব গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ ইলমণ্ডীয় নামক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ শ্রীরামানুজকে দান করিলেন। যতিরাজ উক্ত প্রদেশটি দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন।

এ দিকে শ্রীশৈলস্থ সাধু তপস্বিগণ যতিরাজের আগমনবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন, শ্রীরামানুজ পাদস্পর্শভয়ে তদুপরি আরোহণ করিবেন না, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন এবং অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনার ন্যায় মহাত্মাগণ যদি

পাদস্পর্শভয়ে শৈলোপরি আরোহণ না করেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকেরাও তদ্রূপ আচরণ করিবে। তাহারা কহিবে, 'যখন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা রামানুজ পাদস্পর্শভয়ে শৈলারোহণ করেন নাই, তখন আমাদের কথা কি? আমরা ত স্বভাবতঃই মলিন।' এইরূপে হয় ত অর্চ্চকগণও ভগবৎসমীপে গমন করিবেন না। অতএব আপনি কালবিলম্ব না করিয়া আরোহণে মনোযোগী হউন। অপরঞ্চ, আপনার ন্যায় মহাত্মাগণের হৃদয়ই শ্রীহরির প্রকৃত মন্দির। তথায় ভক্তিরূপ পরমামৃতের দ্বারা তাঁহার নিরন্তর সেবা হইতেছে। ভক্তিই শ্রীহরির একমাত্র প্রিয় পদার্থ। যাঁহার হৃদয়ে সেই ভক্তি আছে, নারায়ণ তথায় নিত্যই বিরাজ করিতেছেন। এইজন্য যুধিষ্ঠির বিদুরকে কহিতেছেন, 'ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ম্প্রভো। তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥' আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষগণ তীর্থস্থলে আগমন করেন বলিয়াই তীর্থসমূহের তীর্থত্ব নিষ্পন্ন হয়।" সেই মহাত্মাগণের বিনয়গর্ভ বচনসমূহকে আদেশবাক্যের ন্যায় গ্রহণপূর্ব্বক সশিষ্য রামানুজ শৈলারোহণে প্রবৃত্ত হইলেন।

তুঙ্গদেশে আরোহণ করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে গিরিশিখর হইতে ভগবানের প্রসাদ ও শ্রীপাদতীর্থ (শ্রীচরণামৃত) হস্তে লইয়া বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানগম্ভীর পরমভক্তিমান শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও প্রসাদ এবং তীর্থ যতিরাজের হস্তে অর্পণ করিয়া তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সেই ঋষিতুল্য মহাপুরুষ তাঁহার জন্য প্রসাদ বহন করিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া যতিরাজ কহিলেন, "হে মহাত্মন্ আপনি এরূপ বিসদৃশ কর্ম্ম কেন করিলেন? অধম দাসের জন্য আপনার ন্যায় গুরুগণের এরূপ ক্লেশ স্বীকার করা বড়ই অনুচিত হইয়াছে। সামান্য একটা বালককে বলিলে সে বহন করিয়া আনিত।" শ্রীশৈলপূর্ণ তচ্ছ্রবণে কহিলেন, "যতিপতে, আমিও তাহাই স্থির করিয়া একটী সামান্য বালকের অন্বেষণ করিতেছিলাম, কিন্তু আমাপেক্ষা হীনমতি বালক কাহাকেও না পাওয়ায় সুতরাং আমাকেই বহনভার সহ্য করিতে হইয়াছে।" শ্রীশৈলপূর্ণের এরূপ দীনতা দ্বারা রামানুজ যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "অদ্য আমার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। আপনার নিকট হইতে দীনভাব শিক্ষা করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম।"

তিনি ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে পূর্ণপ্রজ্ঞ পূর্ণের পাদগ্রহণ করতঃ শিষ্যগণের সহিত প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদয় শ্রান্তি নিবারণ করিলেন এবং কিয়ৎকাল আরোহণের পর শ্রীপতি বেঙ্কটনাথের মন্দির সম্মুখে উপনীত হইলেন। শৈলবাসী শিষ্য অনন্তাচার্য্য আসিয়া তাঁহার পাদগ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পরে মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শ্রীবেঙ্কটনাথের সম্মুখে উপনীত হইয়া প্রেমভরে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। এরূপ অবস্থায় বহুক্ষণ থাকিয়া তিনি ক্রমে বাহ্যদশায় ফিরিয়া আসিলেন। অর্চ্চকগণ পরমভক্তি সহকারে তাঁহাকে শ্রীপাদতীর্থ ও প্রসাদ অর্পণ করিলেন। তিনি শিষ্যগণের সহিত তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিলেন। ভগবদ্দর্শনের পর তত্রত্য অন্যান্য দেবদেবী বিগ্রহদর্শন করতঃ শ্রীরামানুজ সর্ব্বতীর্থময় পুণ্যোদক সরোবরে সশিষ্যে স্নান সমাপন পূর্ব্বক পরম সুখী হইলেন। তিনি তথায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া অবরোহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীশৈলপূর্ণের পরম অনুগত শিষ্য, স্বীয় মাতৃস্বস্রেয় গোবিন্দ তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বপ্রাণরক্ষাকর্ত্তা, বাল্যবন্ধুকে দর্শন করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করতঃ পরম তুষ্ট হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশৈলপূর্ণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত হইয়া গোবিন্দ শ্রীরামানুজের নিকট গমন করেন। তিনি তাঁহার সহিত তথায় কয়েক দিবস থাকিয়া স্বীয় গুরু শ্রীশৈলপূর্ণের জন্য এতদূর কাতর হইয়াছিলেন যে, যতিরাজ তাহাকে তাঁহার গুরুর সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তদবধি গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের নিকটেই আছেন। গুরুসেবায় তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ যে, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন বিষয়ে স্পৃহামাত্র ছিল না। তাঁহার স্বভাব পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়।

গিরিশিখর হইতে অবরোহণ করিয়া শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণের অনুরোধে তাঁহার আলয়ে এক বৎসরকাল বাস করিলেন। মহাত্মা পূর্ণ প্রতিদিন তাঁহাকে শ্রীরামায়ণ পাঠ করাইতেন। তাঁহার সুললিত ও গভীর ব্যাখ্যা শ্রবণে যতিরাজের তদ্বিষয়িণী জিজ্ঞাসা বলবতী হইল। তিনি এক বৎসরকাল তথায় বাস করিয়া সমগ্র রামায়ণ উক্ত মহাপুরুষের নিকট অধ্যয়ন করতঃ আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিলেন। তথায় বাসকালে তিনি গোবিন্দের রীতি নীতি দর্শন করিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

একদা তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার বাল্যবন্ধু স্বীয় গুরুর জন্য শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি স্বয়ং শয়ন করিলেন। ইহাতে যতিরাজ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট উক্ত ব্যাপার নিবেদন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার শয্যায় শয়ন করিয়াছ। জান, গুরুতল্পে শয়ন করিলে কি হয়?" গোবিন্দ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "গুরুতল্পশায়ীর অনন্তকাল নরকবাস হয়।" পূর্ণ কহিলেন, "ইহা জানিয়াও কেন এরূপ আচরণ করিলে?" গোবিন্দ উত্তর করিলেন, "আমি নরকবাস ইচ্ছা করিয়াই ভবদীয় শয্যায় শয়ন করি। শয্যা সুখস্পর্শ হইল কি না, তাহাতে শয়ন করিলে আপনার সহজে নিদ্রাকর্ষণ হইবে কি না, ইহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আমি অন্তে নরকগমন স্বীকার করিয়াও প্রতিদিন শয্যারচনার পর তদুপরি একবার শয়ন করিয়া থাকি। আমার নিরয়বাস দ্বারা যদি আপনার কিঞ্চিৎ সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভ হয়, তাহা আমি স্বর্গবাসাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করি।" সমীপবর্ত্তী যতিরাজ ইহা শুনিয়া গোবিন্দের গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা পর্য্যালোচনা করতঃ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি অজ্ঞানবশতঃ মাতৃস্বস্রেয়ের সম্বন্ধে অন্যায় ভাব পোষণ করার জন্য স্বয়ং লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

আর এক সময় দূরে শ্রীরামানুজ দেখিলেন যে, গোবিন্দ একটা সর্পের মুখের ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশিত করিয়া তাহা সবেগে টানিয়া লইলেন, এবং সর্পটী যন্ত্রণায় যেন মৃতকল্প হইয়া রহিল। এইরূপ আচরণ পূর্ব্বক গোবিন্দ স্নান করিয়া যতিরাজের নিকট আসিলে, তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি এ কি কর্ম্ম করিলে? একটা বিষাক্ত সর্পের মুখে অঙ্গুলি দেওয়া কি উন্মত্তের কর্ম্ম নয়? ভাগ্যবলেই তোমার শোণিতে বিষ সংক্রামিত হয় নাই। বালকের ন্যায় এরূপ আচরণ করিয়া তুমি আপনাকেও বিপদে ফেলিয়াছিলে এবং ঐ নিরপরাধী জীবটিও এক্ষণে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছে। তোমার ন্যায় সদাশয় পুরুষের কোন জীবকেই কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।" ইহাতে গোবিন্দ কহিলেন, "ভ্রাতঃ, কোন একটি কণ্টকান্বিত দ্রব্য ভোজন করিতে গিয়া সর্পটির গলে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় উহা যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছিল, তজ্জন্যই উহার মুখমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া আমি সেই কণ্টকটি উদ্ধার করিয়াছি। উহার আর পূর্ব্ব যন্ত্রণা নাই। কেবল ক্লান্তি বশতঃ নির্জ্জীবের ন্যায় হইয়া আছে। কিয়ৎকাল পরেই সুস্থ হইবে, তজ্জন্য

চিন্তিত হইও না।" রামানুজ এতচ্ছ্রবণে গোবিন্দের জীবহিতচিকীর্ষার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই ঘটনায় গোবিন্দের প্রতি তাঁহার প্রেম প্রগাঢ়তর হইল।

বৎসরান্তে সমগ্র রামায়ণ পাঠ শেষ হইলে তিনি যথোচিত গুরু-দক্ষিণা দিয়া শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট বিদায় লইতে চাহিলে উক্ত মহানুভব কহিলেন, "বৎস রামানুজ, তোমার যদি কোনও অভিলাষ থাকে, আমায় বল। আমি তাহা সাধ্যাতীত না হইলে এখনই পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব।" ইহাতে যতিরাজ কহিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনার দেব-তুল্য শিষ্য গোবিন্দকে আমায় অর্পণ করুন। ইহাই আমার প্রার্থনীয়।" এতচ্ছ্রবণে পূর্ণ নিজ প্রিয়তম শিষ্যকে তৎক্ষণাৎ শ্রীরামানুজের করে সমর্পণ করিলেন। গোবিন্দকে পুনর্লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া শিষ্যগণের সহিত ঘটিকাচলে (শোলিঙ্গাল) গমন করিলেন, তথায় নৃসিংহদেবকে সন্দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তথা হইতে পক্ষিতীর্থে (তিরুক্কিড়িকুণ্ড্রম্) গমন করিয়া দেবদর্শন ও স্নানদানাদি করিয়া, কাঞ্চিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীবরদরাজ স্বামী সন্দর্শন করিয়া যতিরাজ কাঞ্চিপূর্ণের সহিত মিলিত হইলেন ও তাঁহাকে গোবিন্দের গুরুভক্তি এবং জীবহিতপরায়ণতা নিবেদন করিয়া কহিলেন, "হে মহাত্মন্, আপনি আমার মাতৃস্বস্রেয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া উহাকে আরও গুরুভক্তিপরায়ণ ও জীবহিতরত করুন।" কাঞ্চিপূর্ণ স্মিতবিকশিত বদনে কহিলেন, "তোমার ইচ্ছা সর্ব্বদাই ফলবতী; তুমি যাহার হিতবাসনা কর, তাহার কখনও কোন অহিত থাকিতে পারে না।"

সমীপস্থ গোবিন্দের মুখে মালিন্য ও বৈবর্ণ্য নিরীক্ষণ করিয়া কাঞ্চিপূর্ণ কহিলেন, "যতিরাট্, গুরুসেবার অভাবে গোবিন্দের মুখশশী মলিন হইয়া গিয়াছে। তুমি ইহাঁকে শ্রীশৈলপূর্ণ সমীপে প্রেরণ কর।" তচ্ছ্রবণে শ্রীরামানুজ গোবিন্দকে তৎক্ষণাৎ গুরুসন্নিধানে যাইতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দ সরল পথ আশ্রয় করিয়া অনতিবিলম্বে শ্রীশৈলপাদবর্ত্তী স্বীয় গুরুগৃহে আগমন করিলেন। পূর্ণ তাঁহার প্রত্যাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একবার-মাত্র তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইল, সকলে ভোজন সমাপন করিলেন। পূর্ণ গোবিন্দকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন না! বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। গোবিন্দ অনাহারে

বহির্দ্বারে বসিয়া আছেন। কোমলপ্রাণা পূর্ণসহধর্ম্মিণী ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভর্ত্তাকে কহিলেন, "গোবিন্দের সহিত বাক্যালাপ করুন বা নাই করুন, বৎসকে ভোজন করিতে আদেশ করুন।" ইহাতে তদীয় ভর্ত্তা কহিলেন, "যে অশ্ব বিক্রীত হইয়াছে, তাহাকে তৃণোদক দিতে আমি আর কর্ত্তব্যবদ্ধ নহি। নূতন স্বামী কর্ত্তৃকই তাহার এক্ষণে প্রতিপালিত হওয়া উচিত।" গোবিন্দ ইহা শুনিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অনাহারে কাঞ্চিপুরে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরামানুজের পাদগ্রহণ করিয়া কহিলেন, "যতিরাট্, আপনি আর আমায় ভ্রাতা সম্বোধন করিবেন না, পূর্ব্বস্বামীর প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, আপনিই আমার বর্ত্তমান স্বামী। কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।" সমস্ত দিন অনাহারে ও পথশ্রমে গোবিন্দকে নিতান্ত ক্লান্ত ও মলিন দেখিয়া শ্রীরামানুজ তখনই তদীয় স্নান ভোজনাদি সম্পাদন দ্বারা শ্রান্তি দূর করিলেন। তদবধি গোবিন্দ যেরূপ ভক্তির সহিত শ্রীশৈল-পূর্ণের সেবা করিতেন, তদ্রূপ মনোযোগ ও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত বর্ত্তমান গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চিপুরে তিরাত্র বাস করিয়া ইঁহারা সকলে অষ্টসহস্র গ্রামে উপনীত হইয়া যজ্ঞেশের সেবা গ্রহণ করিলেন। তথায় একরাত্রি বাস করিয়া গোবিন্দ ও অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গ-নাথ স্বামী ও স্বীয় গুরুগণকে সন্দর্শন করিয়া স্বমঠে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ।

৺ গোপীনাথ দর্শন।

(শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস গুপ্ত লিখিত।)

আজ চল্লিশ বৎসর হইল, একদা আমার একটী শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র একটুকরা বোতল-ভাঙ্গা গিলিয়া ফেলে। উহা এমন ভাবে গলায় ঠেকিয়া থাকে যে, কিছুতেই এ দিক্ ও দিক্ হয় না, অবিশ্রান্ত রক্ত পড়িতে থাকে। মুহূর্ত্ত-মধ্যে বাটীতে ভয়ানক হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে একত্র করিল। বাটীতে তিন চারিটী ঠাকুরঘর আছে। বাড়ীর মেয়েগণ পাগলিনীর ন্যায় এখানে সেখানে মাথা

খুঁড়িয়া কপাল ফুলাইয়া ফেলিল। ছেলেটীর গলায় আঙ্গুল দিয়া কাচখণ্ড বাহির করিবার চেষ্টারও ত্রুটি হইল না, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ছেলেটী যায় আর কি! ভ্রাতা মহাশয় অবস্থাপন্ন। তাঁহার এই একমাত্র ছেলে। তাঁহার তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত। এমন সময় আমার জেঠীমা ঠাকুরাণী কিম্বা অন্য একজন প্রাচীনা রমণী কহিলেন, ছেলেটী জন্মিলেই মানস করা হয় যে, এ বাঁচিয়া থাকিলে ইহাকে ৺ গোপীনাথের প্রসাদ দিয়া অন্নারম্ভ করা হইবে। তাহা কিন্তু করা হয় নাই। বোধ হয় তাহাতেই ৺গোপীনাথ এ শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া ৺ গোপীনাথ দর্শন ও তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ জন্য রওনা হওয়া আবশ্যক। তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র সকলে ৺ গোপীনাথগতপ্রাণ হইয়া উঠিলেন। দিগ্বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই বোতলভাঙ্গাবিদ্ধ ছেলে নিয়া ৺গোপীনাথের বাটী রওনা হওয়া স্থির হইয়া গেল। দাদা মহাশয়ের নিজের তিনখানি নৌকা ছিল, তৎক্ষণাৎ তাহা সজ্জিত করা হইল। চাল, ডাল, চিঁড়া, চিনি, হাড়ি, কুঁড়ি, কাঠ, উনান, থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতি দৌড়াদৌড়ি করিয়া নৌকায় উঠান হইল। ১৫।২০ মিনিটের ভিতর দুই নৌকা সজ্জিত করিয়া "হে গোপীনাথ", "হে গোপীনাথ" করিতে করিতে বধূ ঠাকুরাণী দাসদাসী-পরিবেষ্টিতা হইয়া ললাটে করাঘাত করিতে করিতে ছেলে কোলে নিয়া নৌকারোহণ করিলেন। ঘাটে গ্রামের অসংখ্য নরনারী দণ্ডায়মান হইয়া কেবলই "গোপীনাথ" "গোপীনাথ" করিতে লাগিল।

আমাদের বাটী হইতে ৺ গোপীনাথের বাটী দুই চারি দণ্ডের পথ নহে। নৌকাপথে যাইতে চারি পাঁচদিন লাগে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পথে দস্যুরও বিলক্ষণ ভয় ছিল। স্ত্রীলোক নিয়া যাতায়াত আরো ভয়ের কারণ। তাঁহারা পনর দিনের জন্য যাত্রা করিলেন। ভগবানের প্রতি কিরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে মুমূর্ষু একটী শিশু লইয়া এরূপ ভয়সঙ্কুল দীর্ঘপথ যাওয়ার সাহস হয়, তাহা পাঠকগণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সকলে একাগ্র অন্তঃকরণে "হে গোপীনাথ", "হে গোপীনাথ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে বেলা প্রহরেক থাকিতে নৌকা খুলিয়া দিলেন।

ভগবানের উপর এরূপ নির্ভর করিতে পারিলেই তাঁহার কৃপালাভ হয়। আজকাল আমাদেরও নির্ভর নাই, তাঁহারও কৃপা নাই। আজকালের এই বিজ্ঞান চর্চ্চার দিনে এমন একটী বিপৎপাত হইলে ছেলে নিয়া নিশ্চয়ই চারি

পাঁচ ঘন্টার পথ ঢাকাভিমুখে রওনা হইতে হইত। সেখানে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার সদৃশ ডাক্তার সাহেবকে ফেলিয়া চারি পাঁচ দিনের পথ ৺ গোপীনাথের বাটী যাওয়ার জন্য কে প্রস্তাব করিতে সাহস পাইত, আর কেই বা যাইত? পূর্ব্বকালে প্রহ্লাদ ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দে এরূপ নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই হস্তিপদদলিত হইয়া, অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে লোষ্ট্রবৎ ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া, সুতীক্ষ্ণ শেল বর্শা প্রভৃতি শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও অক্ষতশরীর ছিলেন। এইরূপ যখন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র মোচন করিবার জন্য দুঃশাসন কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, তখন ক্ষণকাল দ্রৌপদী বামহাতে বস্ত্র ধরিয়া রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ভগবান্‌কে আহ্বান করিতেছিলেন। অর্থাৎ তখনও দ্রৌপদী ভগবানের উপর সম্যক্ রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। পরে যখন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারিলেন, তখন কাপড় ছাড়িয়া দিয়া উভয় হস্তে করযোড়ে ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। আর্ত্তত্রাণ ভগবান্ তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অক্ষয় বস্ত্র দ্বারা দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। ঐ রূপ অকৃত্রিম নির্ভর করিতে পারিলে অবশ্যই ভগবৎকৃপা লাভ হয়।

বধূ ঠাকুরাণী প্রভৃতি এইরূপ অকৃত্রিম নির্ভরই করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নৌকা খুলিয়া দুই দণ্ডের পথ আসিতে না আসিতেই আপনাপনি গলা হইতে কাচখণ্ডটা খসিয়া পড়িল। সকলে "জয় গোপীনাথ" "জয় গোপীনাথ" বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তীরে নৌকা লাগাইয়া কাচ বাহির হওয়ার সংবাদ সহ আপন এলাকার জনৈক লোক বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারাও সুখে ৺গোপীনাথের বাটী চলিয়া গেলেন। ৺ গোপীনাথের মহিমা দর্শনে সকলেরই গোপীনাথের প্রতি ভক্তি বৰ্দ্ধিত হইল। আমার বধূ ঠাকুরাণী সযত্নে কাচখণ্ডটা রক্ষা করিয়াছিলেন। ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীমান্ জয়চন্দ্র দাস গুপ্ত আজ চল্লিশ বৎসর বয়স্ক এবং সুস্থশরীরে বালেশ্বর জিলায় পোষ্ট ইন্‌স্পেক্টরের কাজ করিতেছেন। এই ৺ গোপীনাথের মহিমার সহিত তাঁহার নাম আমাদের কর্ণে প্রথম প্রবেশ করে।

আজ ২৮ বৎসর হইল, বিষয়কৰ্ম্ম উপলক্ষে ময়মনসিংহ সহরে বাস করিতেছি। ৺ গোপীনাথের বাটী এই জিলারই অন্তর্গত। সহর হইতে নৌকাপথে যাইতে দুই দিন, আসিতে দুই দিন লাগে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ২৮ বৎসরের মধ্যে কতবারই প্রস্তাব করিলাম যে, ৺ গোপীনাথের শ্রীচরণার-

বিম্ব দর্শন করিব কিন্তু কখনও সফলমনোরথ হইতে পারি নাই। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, আমার ন্যায় নরাধম তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের অযোগ্য। আজ ছয়মাস হইল, এখানে আমার একটী দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করে। জন্মাবধিই সে রোগা। কয়েক দিন হইল, দৌহিত্রটীর সমবয়স্ক আমার দুইজন বন্ধুর দুইটী ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। তখন মনে হইল, ইহারও ত অন্নপ্রাশন দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু উহার চেহারা দর্শন করিয়া আর কিছুতেই উৎসাহ হয় না। এ সময় হঠাৎ একদিন ৺ গোপীনাথের প্রসাদ দিয়া তাহার অন্নপ্রাশন দিতে ইচ্ছা হইল। সমমতে ৺ গোপীনাথের আদেশ প্রাপ্ত হইলাম। তখন কালবিলম্ব না করিয়া ৺ গোপীনাথের বাটী রওনা হওয়া স্থির করিলাম।

একখানা নৌকা ভাড়া হইল। সঙ্গে উক্ত দৌহিত্র ও কন্যা ভিন্ন আমার স্ত্রী, এক পুত্র, অন্য কন্যা ও তাহার এক ছেলে এবং একজন ভৃত্য চলিল। শনিবার মধ্যাহ্নে আহার করিয়া নৌকারোহণ করিলাম। পথে মঠখলা নামক স্থানে রবিবার মধ্যাহ্নে ৺ কালীবাটীতে প্রসাদ গ্রহণ জন্য মঠখলার ভূমাধিকারী মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলাম। ইনি আমার জনৈক বিশেষ বন্ধু। তিনি রেলে কাওরাইদ ষ্টেশনে নামিয়া আমাদের আগেই মঠখলা চলিয়া আসিলেন। আমাদের নৌকা মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল। কালীবাজার পৌঁছিতেই প্রায় সন্ধ্যা হইল। সম্মুখ বাতাসে ব্রহ্মপুত্রবক্ষ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু এমন ঢেউ নয় যে, নৌকা বান্ধিয়া রাখা আবশ্যক। সকল নৌকাই চলিতেছিল, কিন্তু আমাদের মাঝিগণ নৌকা বান্ধিয়া রাখিল। নৌকা দৈনিক হিসাবে ভাড়া করা। বান্ধিয়াই রাখুক আর চালাইয়াই যাক, তাহাদের ভাড়া চলিবেই, এই হিসাবে বান্ধিয়া রাখিয়াছে কি ঢেউ থাকা বশতঃ নৌকা চালাইতে অক্ষম বলিয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। ইহার মধ্যে একটু বৃষ্টিও হইয়া গেল। অতঃপর মাঝিদিগকে নৌকা খুলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় তাহারা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু দেখিতে পাইলাম যে, একটী মাঝি নৌ-বিদ্যায় একেবারেই মূর্খ, দ্বিতীয়টীর বিদ্যাও তথৈবচ। নদীর ঢেউ ও তাহাদের মূর্খতা দেখিয়া ভীত হইলাম। নৌকা ঢেউয়ের মধ্যে খুব আছাড় খাইতে লাগিল। মেয়েগণ সন্ত্রস্ত। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, বাতাসও কমিয়া গেল। মাঝিগণ নৌকা বান্ধিবার জন্য ব্যস্ত,

কিন্তু বান্ধিতে দিলাম না। জোর জবর করিয়াই তাহাদিগের দ্বারা নৌকা চালাইতে লাগিলাম। নৌকাতে পাক হইলে সকলে আহার করিল। অবশেষে মাঝিগণও নৌকা তীরে বান্ধিয়া আহার করিয়া শুইয়া থাকিল।

রাত্রি প্রভাত হইলেও মাঝিগণ উঠিতেছে না দেখিয়া ডাকিয়া উঠাইয়া নৌকা খুলিয়া দিলাম। তখন বেশী বাতাস বা ঢেউ ছিল না। যেই চরভূমি ছাড়িয়া নৌকা উচ্চ পাড়ের নিকট আসিল, অমনি যেমন স্রোত, তেমনি ঢেউ প্রাপ্ত হইলাম। মাঝিগণ নৌকা ঠিক রাখিতে পারিল না। তাহারা হাল ও দাঁড় ছাড়িয়া দিয়া এক উচ্চ চীৎকার ছাড়িল। আমরা দক্ষিণমুখে যাইতেছিলাম। নৌকাখানা এক ঢেউয়ে পশ্চিম মুখ হইয়া গেল। দ্বিতীয় ঢেউয়ে নৌকাখানা না ডুবিয়া উত্তর মুখ হইয়া একেবারে তীরস্থ হইয়া গেল। বাস্তবিক ভগবান্ গোপীনাথ যেন হাতে ধরিয়া নৌকাখানা পাড়ে লাগাইয়া দিলেন। নচেৎ নৌকাখানা যখন হালশূন্য হইয়া ঘুরিতেছিল, তখন যে ডুবিয়া গেল না, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্য কাণ্ড বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আমাদের মানবলীলা শেষ হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া সে সময় নিতান্তই মনে করিয়াছিলাম। নৌকা তীরস্থ হইলে আমার নিরেট মাঝিটী ঢোক গিলিয়া বলিল, "আজ কেবল ঈশ্বরই রক্ষা করিলেন"।

আমাদের কাহারও মুখে তখন শব্দ ছিল না। মেয়েগণ অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা। এবার সকলেই যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম। আমরা আবার পিছনের চরভূমি অবলম্বন করিয়া একটা পাট ক্ষেতের আড়ালে নৌকা রাখিয়া দিলাম। বাতাস থামিতেছে না। ব্রহ্মপুত্র খুব সোঁ সোঁ করিতেছে। ঢেউগুলি উঠিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া যে জল উদ্গীরণ করিতেছে, নৌকায় বসিয়া তাহা দেখিতে লাগিলাম। দুই একখানা উজান নৌকা পাল তুলিয়া যাইতেছে। ভাটী নৌকার চলাচল একেবারে বন্ধ; বেলা হইল। পাক শাক খাওয়া লওয়া হইয়া গেল, তথাপি বাতাস থামিতেছে না। অতঃপর একপ্রহর বেলা থাকিতে বাতাসটা কিছু কমিল। তখন ভগবানের নাম লইয়া নৌকা খুলিতে আদেশ করিলাম। আমার ভৃত্যটী বরং মাঝিগণ হইতে নৌবিদ্যায় পটু ছিল। এবার সে হাল ধরিল। উভয় মাঝি দাঁড় ও লগি চালাইতে লাগিল। খানিক দূর গেলে দাঁড় কি লগি দুটার একটাও চলিল না। তখন গুণ টানিয়া যাওয়ার

প্রয়োজন। কিন্তু আমার মাঝিগণ নির্গুণ! তখন ভাবিলাম, বেশ হইয়াছে। আমি সর্ব্বদাই অভাব টানাটানিতে থাকি এবং আমার কার্য্য-গুলিও সোজাসুজি নির্ব্বাহ হয় না। এবারও তাহাই হইল। আমি ইহাতে বিস্মিত বা দুঃখিত হইলাম না। সকলে মাঝিদিগকে মন্দ বলিতে লাগিল। আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। অনন্তর তাহারা নৌকার আগায় একটা দড়ি বান্ধিয়া টানিয়া চলিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদ্ আশ-ঙ্কায় মেয়েগণ সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিল। সন্ধ্যার পর বাতাস কমিল। তখন মাঝিগণ দাঁড় টানিয়া চলিল। রাত্রিতে মঠখলার নিকট আসিয়া থাকি-লাম। আমার বন্ধুবরের অনুরোধ যে রক্ষা করিতে পারিলাম না, সেজন্য মুহুর্মুহুঃ চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরদিন বেলা নয়টার সময় বেতালের ঘাটে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে ৺গোপীনাথের বাটী দেড় মাইল ব্যবধান। স্থলপথে যাইতে হয়।

৺গোপীনাথের বাটী ভোগবেতাল গ্রামে। উক্ত গ্রামে অন্য বাড়ী ঘর নাই। ভোগবেতালের সংলগ্ন আচমিতা গ্রামে আমার জনৈক বন্ধুকে ইতিপূর্ব্বে আমাদের ৺গোপীনাথের বাটী আসিবার সংবাদ জানাইয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বেতালের ঘাটে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারী রাখিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের নৌকা ঘাটে পৌঁছামাত্র একটী লোক আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া কহিল, শরৎ বাবু আমাকে এখানে রাখিয়া দিয়াছেন। আপনার জন্য কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। আপনাদের জন্য শোয়ারী পালকী প্রস্তুত আছে। আমি আমার বন্ধুবরের এতাদৃশ সৌজন্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত ও আহ্লাদিত হইলাম। আমার স্ত্রী ও কন্যাগণ শোয়ারী আরোহণ করিয়া ৺গোপীনাথের বাটী যাইতে ইচ্ছা করেন না। সকলেই পদব্রজে যাইব, অতএব শোয়ারী গ্রহণ করা হইল না। লোকটীকে আমি পথ প্রদর্শন করিতে কহিলাম।

নৌকা হইতে ৺গোপীনাথের মাটীতে পাদবিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ৺গোপীনাথকে ও তাঁহার পবিত্র ভূমিকে সকলে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলাম। দৌহিত্র দুইটীকে প্রণাম করাইয়া গড়াগড়ি দেওয়াইলাম। অতঃপর "জয় গোপীনাথ" বলিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া রাস্তা চলিতে লাগিলাম। আমি মুহূর্ত্তের জন্যও দয়াল গোপীনাথকে

ভুলিতে পারিতেছি না। এই সুদীর্ঘ ২৮ বৎসরের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে কখনও যে দিন পাই নাই, আজ আমার সে দিন উপস্থিত! ৺কাশী, ৺প্রয়াগ, ৺মথুরা, ৺বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্য ভূমিতে ভগবান্ আমাদের সকলকে একত্র করিয়া নেন নাই, কিন্তু আজ আমার দয়াল গোপীনাথ কেমন করুণা বিতরণ করিয়া সকলকে একত্র করিয়া আনন্দবাজার জমাইয়া নিয়া চলিয়াছেন!! আমি একবার এ দৌহিত্রকে আরবার ও দৌহিত্রকে কোলে নিয়া আনন্দে মাতিয়া চলিয়াছি। স্ত্রী ও মেয়েগণ আনন্দে উৎফুল্ল। পথ চলার কষ্ট নাই। কষ্ট অনুভব করিবার অবসরই বা কোথায়? আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে দুচারি ফোঁটা বৃষ্টি ও বাতাস হইতেছিল। কিন্তু আমরা রাস্তা চলা বন্ধ করি নাই। ইতিপূর্ব্বে দৌহিত্রটীকে কখনও ঘরের বাহির করা হয় নাই। জন্মাবধিই উহার কফ। এখন এই যে বৃষ্টি বাতাস লাগিতেছে, তবু কিন্তু উহার মুখে হাসি লাগিয়াই রহিয়াছে। আমার স্ত্রী কহিলেন, উহার এমন ফুর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। কিয়দ্দূর যাইবার পর পথপ্রদর্শক কহিল, "ঐ গোপীনাথের বাড়ী দেখা যায়"। দেখিলাম, গাছের ভিতর দিয়া ৺গোপীনাথের বাড়ী দেখা যাইতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে আমি ৺গোপীনাথের মন্দিরকেই ৺গোপীনাথ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সেখানেই মাটীতে পড়িয়া ৺গোপীনাথকে প্রণাম করিলাম। সকলেই প্রণাম করিল। ১০০ কি ১৫০ হাত আসিলেই গ্রামের সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া খাস ৺গোপীনাথের বাটীর রাস্তায় পৌঁছিলাম। সকলে ভক্তিভাবে সেখানে প্রণাম করিলাম। দৌহিত্র দুটীকে প্রণাম করাইয়া গড়াগড়ি দেওয়াইলাম।

দেখিতে দেখিতে ৺গোপীনাথের বাটী পৌঁছিলাম। ৺গোপীনাথের বাটীর যাহা দেখিতেছি, তাহাই প্রণাম করিতেছি। বাটী উঠিতেই ইটের একটা উচ্চ পোল আছে। তাহাকেই ৺গোপীনাথ ভাবিয়া প্রণাম করিলাম। দুচারি পা অগ্রসর হইয়াই ৺গোপীনাথের আঙ্গিনা প্রাপ্ত হইলাম। সেই আঙ্গিনা, সেই আঙ্গিনার প্রত্যেক রেণু ৺গোপীনাথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আঙ্গিনার কোণায় একটী বিল্ব বৃক্ষ। আঙ্গিনাকে, বিল্ববৃক্ষকে সকলে প্রণাম করিয়া ৺গোপীনাথের বাটী প্রবেশ করিলাম। বাটীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল ভিটায়ই কোঠা আছে। কোন্ মন্দিরে ৺গোপীনাথ আছেন জানিতে না পারিয়া পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে মন্দির প্রদর্শন করাইয়া কহিল, এখনও দ্বার খোলা হয় নাই। বোধ হয়

ঘণ্টা খানেক বিলম্ব আছে। এ কথাটা ভাল লাগিল না। কিন্তু কি করি? একটা কোঠায় আমাদের বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল। আমরা সেখানে বসিয়া এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। যাহা দেখি, সকলই যেন ৺গোপীনাথ। অনন্তর আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলাম। ৺গোপী-নাথের মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়া মনের সাধে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। এবার চিত্তের কপাট খুলিয়া গেল। শরীর যেন নাচিতে লাগিল। গোপীনাথের মন্দিরের পার্শ্বেই ভাণ্ডার ঘর। দেখিলাম, উহার দরজায় বসিয়া জনৈক ভদ্রলোক লেখাপড়া করিতেছেন। শুনিলাম, তিনি দেওয়ানজি। সেখানে খানিক বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ৺গোপীনাথের যে ভূসম্পত্তি আছে, তাহার বার্ষিক আয় ১২০০ টাকা কিন্তু সেবার ব্যয় প্রায় ৩৫০০। ৪০০০ টাকা। যাত্রিপ্রদত্ত অর্থের উপরই অনেক নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু আজকাল লোকের শ্রদ্ধা ভক্তির যেরূপ হ্রাস হইয়াছে, তাহাতে আশানুরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। এইরূপ দুই চারি কথা শুনিয়া বাসায় আসিয়া ভগবদ্গীতা পাঠ করিতে বসিলাম।

ক্রমশঃ।

দেব-বোধন।

কেন আজি দেবগণ বাজায় দুন্দুভি ঘন?
কেন আজি কেন আজি পুলকিত জগজন?
মহর্ষি, চারণগণ　　করে কার সম্বোধন,
আঁধার ভারতে পুন হল কার আগমন!
কে তুমি গো বীরাগ্রণি,　　ধর্ম্মের কৌস্তুভ মণি,
জ্বলে যেন দিনমণি হইয়ে শিরোভূষণ!
জ্ঞান-বর্ম্মে ঢাকা তনু,　　হৃদে ভক্তি-স্রোত অনু,
করেতে কর্ম্মের ধনু, বিজিত হে বীরগণ!
সমর-সঙ্গীত তব,　　'তত্ত্বমসি' মহারব,
শুনি ধর্ম্ম-বীর সব ছাইল হে ত্রিভুবন!

যখনি হে বিশ্বরূপ, ভুলে নর স্ব-স্বরূপ,
ধরি তমোনাশী রূপ জাগাও পতিত জন !
বিবেক-আনন্দ নাম, বিবেক-বৈরাগ্য-ধাম,
বিজিত কাঞ্চন কাম বন্দিত ধার্ম্মিকগণ !

পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২৭শে জানুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা হইয়াছিল। দিবাভাগে গুরুপূজা, সঙ্গীতাদি এবং রাত্রে ৺ শ্যামাপূজা হয়। অনেক ভক্ত এই পূজায় যোগদান করেন।

২৯শে জানুয়ারি রবিবার এতদুপলক্ষে সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র নানাবিধ মনোহর পুষ্প লতা পাতা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রাতে পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী বেদের অন্তর্গত পুরুষসূক্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সামগান করেন ও স্বামী শুদ্ধানন্দ কঠোপনিষদের কয়েক অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে একদিকে আধ্যাত্মিক সঙ্গীত চলিতে লাগিল, অপর দিকে মধুর রামায়ণী কথা হইতে লাগিল। গায়ক বাবু পুলিনবিহারী মিত্র ও বাবু লালচাঁদ বড়াল। কালীঘাট নিবাসী হরিপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথকতা করেন। এই কথকতা একটু নূতন রকমের। শুনিতেছি, পণ্ডিত প্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় এই নূতন কথকতার পালা বাঁধিতেছেন। এই কথকতার মধ্যে সুবিধামত স্থানে স্থানে জাতীয় ভাবের সঙ্গীত ও বক্তৃতা দেওয়াতে সাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা এবারে ভদ্রলোক ও দরিদ্র উভয়ের সংখ্যাই অধিক হইয়াছিল। সকলকেই অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন ও অন্যান্য প্রসাদাদি দ্বারা সেবা করা হয়।

দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুড় জেলার অন্তর্গত আল্লেপি নামক স্থানের সনাতন ধর্ম্ম বিদ্যাশালার সভাপতি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে উক্ত বিদ্যাশালার প্রতিষ্ঠার্থে নিমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে স্বামীজি উক্ত আল্লেপিতে যাইয়া বিগত ১৮ই জানুয়ারি প্রাতে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে ও তৎপর দিবস ১৯শে জানুয়ারি উক্ত স্থানে তাঁহার দুইটী বক্তৃতা হয়। বিষয় "সনাতন ধর্ম্ম" ও "গীতা"। তথা হইতে মান্দ্রাজ প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথে কোচিনস্থ থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভ্যগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। স্বামীজি তথায় ২০শে জানুয়ারি অপরাহ্নে "চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। পরে ২১শে জানুয়ারি তারিখে অর্ণাকুলম্ নামক স্থানের কলেজ গৃহে "মৃত্যু ও তাহার পর এবং ভক্তি" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। স্বামীজি ২৩শে জানুয়ারি প্রাতে মান্দ্রাজ ফিরিয়াছেন।

মান্দ্রাজ মঠে বিগত ২৯শে জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব হইয়াছিল। বেলা ৯টা হইতে অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত দুইদল ভজন সম্প্রদায় ভজন গাহিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে এক দল উচ্চবর্ণ ও অপর দল নিম্নজাতি দ্বারা গঠিত। জনৈক ব্রাহ্মণ এই শেষোক্ত দলটী গঠন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বজাতির নিকট বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইযাছে। মঠস্থ সন্ন্যাসিগণ উভয় দলকেই সমান আদর যত্ন করেন। বেলা ১০টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ দরিদ্র ব্যক্তিকে ভোজন করান হয়। বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার প্রায় একঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতা করেন। ইনি স্বামীজির একজন বিশেষ বন্ধু ও ভক্ত। ইনি স্বামীজির জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া অবশেষে স্বামীজি ও তৎকৃত প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় এবং তিনিই বা স্বামীজির সঙ্গে ও কথোপকথনে কিরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, এই সকল বর্ণন করিলেন। অবশেষে মিষ্টার স্যাটেসান মহাশয়ও কিয়ৎক্ষণ স্বামীজির প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। স্বামীজির প্রায় ২০০ শত শিষ্য ও ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন; ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ভাবদা অনাথাশ্রমেও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৭শে জানুয়ারি স্বামীজির একখানি বড় ছবি আসনে বসাইয়া পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হয় এবং পূজা, হোম, ভোগ, আরতি হয়। তৎপরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভজন হয়। পরদিন শনিবার স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজির চিত্রের সমক্ষে যজুর্ব্বেদীয় শতরুদ্রী, চণ্ডী ও উপনিষৎ প্রভৃতি পাঠ করেন। পরে প্রায় সমস্ত রাত্রি ভজনকীর্ত্তন হয়। পরদিন রবিবার স্কুলের সমুদয় ছাত্র, আশ্রমের কর্ম্মচারী ও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হয়। সে দিনও সারা রাত্র ভজন কীর্ত্তন হইয়াছিল।

আশ্রমভুক্ত একটী কায়স্থ বালক এ বৎসর অনাথাশ্রম স্কুল হইতে আপার প্রাইমারি পরীক্ষায় ২ বৎসরের জন্য মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছে। এইবার হইতে আশ্রমের স্কুলটী মাইনর স্কুলে পরিণত হইবে।

বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে স্বামীজির জন্মোৎসবোপলক্ষে জনৈক সিংহলবাসী সন্ন্যাসী বক্তৃতা করেন। হরিসঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রাদি পাঠও হইয়াছিল। প্রায় ২০০ জন দরিদ্রকে লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্ত করা হয়। এতদ্ব্যতীত সেবাশ্রম হইতে যাঁহারা সাহায্য পান, তাঁহাদেরও সেবার জন্য উৎসবফণ্ড হইতে কিছু দেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক হইতে জনৈক সংবাদদাতা বিগত ১৫ই নবেম্বর তারিখে লিখিতেছেন,—

স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত সমিতির গ্রীষ্মাবকাশের সময় অষ্ট্রিয়া প্রদেশে ভ্রমণার্থ গিয়াছিলেন, কিন্তু সমিতির কার্য্য একেবারে বন্ধ হয় নাই, কারণ, তাঁহার সহকারী স্বামী নির্ম্মলানন্দ বরাবর সমিতিতে থাকিয়া যোগশিক্ষা দিতেছেন। বিশেষতঃ, সমিতির নূতন গৃহ হওয়াতে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে সমিতিকে বক্তৃতার জন্য সাধারণ হলে যাইতে হয় না। সমিতির নিজের হলেই প্রায় ৩০০ লোক বসিবার স্থান হয়। তাহাতে এই সুবিধা হইয়াছে যে, সাধারণ হলে কেবল বক্তৃতা হইবারই সুবিধা হইত, কিন্তু এক্ষণে সমিতির গৃহে বক্তৃতার পূর্ব্বে ধ্যান ও বেদপাঠ হইয়া থাকে। আরও এই সমিতি গৃহে একটী স্বতন্ত্র যোগ-গৃহ সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য থাকায়

সাধনার্থিগণের সবিশেষ সুবিধা হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ "ধর্ম্মের আবশ্যকতা" ও "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" নামক দুইটী অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন। আগামী দুই মাসে তিনি এই কয়েকটী বক্তৃতা করিবেন,—(১) বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম (২) জীবাত্মা ও ইহার গতি (৩) পুনর্জ্জন্মবাদ (৪) প্রাণায়ামতত্ত্ব (৫) আধ্যাত্মিক জীবন (৬) খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টম্যাস।

শুনিয়া সুখী হইলাম, বহুবাজার রামকৃষ্ণ সমিতি কিছুদিন হইতে অনাথভাণ্ডার ও তৎসঙ্গে এক অনাথালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে ৩ জন অনাথকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতেছেন ও ভাল ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের এই নবোদ্যমের জন্য আমাদের ও সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আশা করি, সমিতির এই সদ্দৃষ্টান্ত কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় ও বঙ্গের প্রতি পল্লীগ্রামে অনুকৃত হইবে।

শালখিয়া রামকৃষ্ণ অনাথবন্ধু সমিতির ১৩১০ সালের ১লা কার্ত্তিক হইতে ১৩১১ সালের ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা পাইয়াছি। এই এক বৎসরে সমিতির আয় হয় প্রায় ৪৩৪ টাকা ও প্রায় ৪৮মন চাল। ইহার প্রায় সমুদয় খরচ হইয়াছে। সমিতির উদ্দেশ্য,—অন্নবস্ত্রাভাবে পরিক্লিষ্ট অসহায় ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ বা আংশিক অভাবমোচন, অসহায় রুগ্ন ব্যক্তির সেবাশুশ্রূষা, দরিদ্র বালকগণকে স্কুলের বেতন ও পাঠ্যপুস্তকাদি দান, অনাথ দরিদ্রগণকে শীত বস্ত্রাদি প্রদান, নিরাশ্রয় দরিদ্রগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় ভার বহন, অনাথা সচ্চরিত্রা ভদ্র বিধবাদিগকে অন্নবস্ত্রাদি দান, চরিত্রবান্ সাধু সন্ন্যাসীদিগকে প্রয়োজনানুযায়ী সাহায্য করা, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার, প্রতিবৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে একটী উৎসব করা এবং তাহাতে বিশেষ ভাবে দরিদ্রগণের সেবা। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, সমিতি দিন দিন নবোৎসাহ ও নব বল সঞ্চয় করিয়া কার্য্য করিতে থাকুন।

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্ত্তৃক এক সভা আহূত হয়। প্রায় ২৫০।৩০০ ছাত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোকের সমাগম হয়। জষ্টিস সারদাচরণ মিত্র, অধ্যাপক জগদীশ বসু, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় চুণিলাল বসু বাহাদুর, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সমিতি একখানি ষ্টিম লঞ্চ জোগাড় করিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মান্যবর গোখলে ও অন্যান্য ভদ্র মহোদয়-গণ বিশেষ কার্য্যবশতঃ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভার কার্য্যের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, এই বিষয় সভার গোচর করেন। বাবু পুলিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক স্বামীজির বিরচিত "রামকৃষ্ণ আরাত্রিক" ও "সমাধি" বিষয়ক সঙ্গীত গীত হইলে স্বামীজির গ্রন্থ হইতে নিম্ন-লিখিত অংশ গুলি পাঠ ও আবৃত্তি হইয়াছিল। (১) Appeal to young men of Bengal (এই অংশটী সমিতি মুদ্রিত করাইয়া সভাস্থলে ছাত্রবৃন্দকে বিতরণ করেন।) (২) To the Awakened India (৩) "বর্ত্তমান ভারত" প্রবন্ধের শেষাংশ (৪) "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতার শেষাংশ। বক্তাগণের মধ্যে বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং মিঃ এন ঘোষ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। গিরীশ বাবু তাঁহার "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত বিবেকানন্দের সম্বন্ধ" নামক প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—তাহা পঠিত হয়। তৎপরে স্বামী শুদ্ধানন্দ বাঙ্গালাভাষায় "স্বামীজির শিক্ষাপ্রণালী" সম্বন্ধে এবং সিষ্টার নিবেদিতা—ইংরাজী ভাষায় "স্বামীজির পশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচার" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে পুলিন বাবু কর্ত্তৃক গিরীশ বাবু বিরচিত স্বামীজি সম্বন্ধীয় দুইটী গীত হইলে, সভা ভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গের পর প্রসাদ বিতরিত হয়।

স্বামী সচ্চিদানন্দ আমেরিকার অন্তর্গত ক্যালিফোর্ণিয়ার পঁহুছিয়া প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা না একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। আমরা হিন্দু; আমরা বলি, অনন্ত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে মানুষের জীবন একটী বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; কারণ, অনন্ত অতীতকালের কর্ম্মসমষ্টিই বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ পায় আর আমরা বর্ত্তমানের যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, এই পৃথিবীতে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না একদিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে; সেই পথেই তাহাকে যেন চলিতেই হইবে। সেই ভাব অবলম্বন ব্যতীত সে বাঁচিতেই পারিবে না। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতিরও একটা না একটা যেন বিশেষ ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক জাতিকেই যেন সমগ্র মানব জাতির জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে। কখন ছিলও না আর জানিয়া রাখ, কখন হইবেও না। তবে আমাদের অন্য জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই,—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুতাধারে রক্ষা করা এবং যখনি সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনি এই সমষ্টীভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব বা ইংরাজেরা তাঁহাদের অজেয় বাহিনীযোগে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন তখনই ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা এই সকল নূতন পথের মধ্য দিয়া জগতের বিভিন্নজাতির শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে। সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় হিন্দুরও কিছু দিবার আছে। আধ্যাত্মিক আলোকই জগৎকে ভারতের দান।

এইরূপে অতীতের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যখনই কোন প্রবল দিগ্বিজয়ী জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতির সম্মিলন ঘটাইয়াছে, চিরস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ভারতের যখনই স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ করিয়াছে,

যখনই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, তখনই তাহার ফলস্বরূপ সমগ্র জগতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক তরঙ্গের বন্যা ছুটিয়াছে। বর্ত্তমান (ঊনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত জর্ম্মান্ দার্শনিক শোপেনহাওয়ার * বেদের এক প্রাচীন অনুবাদ হইতে জনৈক ফরাসী যুবক কৃত অস্পষ্ট লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, "ঔপনেখতের (উপনিষদের পারস্য অনুবাদের নাম) মূল ব্যতীত উহা অপেক্ষা জগতে হৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক আর কোন গ্রন্থ নাই। জীবদ্দশায় উহা আমাকে শান্তি দিয়াছে, মৃত্যু-কালেও উহাই আমায় শান্তি দিবে।" তৎপরে সেই বিখ্যাত জর্ম্মাণ ঋষি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, "গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ে জগতের চিন্তা-প্রণালীতে যেরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, শীঘ্রই তদপেক্ষা শক্তি-শালী ও বহুস্থানব্যাপী ভাববিপর্য্যয় ঘটিবে।" আজ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে। যাঁহারা চক্ষু খুলিয়া আছেন, যাঁহারা পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন জাতির মনের গতি বুঝেন, যাঁহারা চিন্তাশীল এবং বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, তাঁহারা দেখিবেন, ভারতীয় চিন্তার এই ধীর, অবিরাম প্রবাহের দ্বারা জগতের ভাবগতি, চালচলন এবং সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তবে ভারতীয় প্রচারের একটী বিশেষত্ব আছে। আমি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আমরা কখন বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাব প্রচার করি নাই। যদি ইংরাজি ভাষায় কোন শব্দ থাকে, যাহা দ্বারা জগতের নিকট ভারতের দান প্রকাশ করা যাইতে পারে, যদি ইংরাজি ভাষায় এমন কোন শব্দ থাকে, যদ্দ্বারা মানব জাতির উপর ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা

* মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শুকো পারস্য ভাষায় উপ-নিষদের অনুবাদ করেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদকার্য্য সমাপ্ত হয়। সুজা উদ্দৌলার রাজসভাস্থ ফরাসী রেসিডেণ্ট জেণ্টিল সাহেব বর্ণিয়ার সাহেবের দ্বারা এই পারস্য অনুবাদ আঁকেতিল দুপেরোঁ নামক বিখ্যাত পর্য্যটক ও জেন্দাবেস্তার আবিষ্কর্ত্তাকে পাঠাইয়া দেন। তিনি উহার লাটিন অনুবাদ করেন। বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার এই লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়া বিশেষরূপ আকৃষ্ট হন। শোপেন-হাওয়ারের দর্শন এই উপনিষদের দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত। এইরূপে ইউরোপে উপনিষদের ভাব প্রবেশ করিয়াছে।

এই,—Fascination (সম্মোহনী শক্তি)। হঠাৎ যাহা মানুষকে মুগ্ধ করে, ইহা সেরূপ কিছু নহে; বরং ঠিক তাহার বিপরীত। অনেকের পক্ষে ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় প্রথা, ভারতীয় আচার ব্যবহার, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হয়। কিন্তু যদি তাহারা অধ্যবসায় সহকারে আলোচনা করে, মনোযোগ সহকারে ভারতীয় গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করে, ভারতীয় আচার ব্যবহারের মূলীভূত মহান্ তত্ত্বসমূহের সহিত সবিশেষ পরিচিত হয়, তবে দেখা যাইবে, শতকরা নিরনব্বই জন ভারতীয় চিন্তার সৌন্দর্য্যে, ভারতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ ঊষা-কালীন ধীর শিশিরসম্পাতের ন্যায় এই শান্ত সহিষ্ণু সর্ব্বংসহ ধর্ম্মপ্রাণ জাতি চিন্তাজগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, আজ যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যাবিষ্কারের মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে প্রাচীন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্ম্মবিশ্বাসসমূহের ভিত্তি পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, যখন বিভিন্ন সম্প্রদায় মানবজাতিকে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী করিবার যে বিশেষ বিশেষ দাবি করিয়া থাকেন, তাহা শূন্যমাত্রে পর্য্য-বসিত হইয়া হাওয়ায় উড়িয়া যাইতেছে, যখন আধুনিক প্রত্নতত্ত্বানু-সন্ধানের প্রবল মুষলাঘাতে প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারসমূহকে ভঙ্গুর কাচপাত্রের ন্যায় গুঁড়াইয়া ফেলিতেছে, যখন পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম কেবল অজ্ঞ-দিগের হস্তে এবং জ্ঞানিগণ ধর্ম্মসম্পর্কিত সমুদয় বিষয়কে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই ভারতের দর্শন, ভারতবাসীর মনের ধর্ম্মবিষয়ক সর্ব্বোচ্চ ভাবসমূহ জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক সত্য সকলের দ্বারাই ভারতবাসীর ধর্ম্ম-জীবন নিয়মিত। তাই আজ এই সকল মহান্ তত্ত্ব—অসীম অনন্ত জগতের একত্ব, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, জীবাত্মার অনন্ত স্বরূপ ও তাহার বিভিন্ন জীবশরীরে অবিচ্ছেদ সংক্রমণরূপ অপূর্ব্ব তত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তত্ব,—এই সকল তত্ত্ব পাশ্চাত্য জগৎকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে স্বভাবতঃই অগ্র-সর হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহ জগৎকে একটী ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ড মাত্র মনে করিত আর ভাবিত, কালও অতি অল্প দিন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। দেশ কাল ও নিমিত্তের অনন্তত্ব এবং সর্ব্বোপরি মানবাত্মার

অনন্ত মহিমার বিষয় কেবল আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে বর্ত্তমান এবং সর্ব্বকালই এই মহান্ তত্ত্ব সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি। যখন ক্রমোন্নতিবাদ, শক্তিপরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধিরাহিত্য (Conservation of energy) * প্রভৃতি আধুনিক ভয়ানক মত সকল সর্ব্বপ্রকার অপরিণত ধর্ম্মমতের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তখন সেই মানবাত্মার অপূর্ব্ব সৃজন, ঈশ্বরের অদ্ভুত বাণীস্বরূপ বেদান্তের অপূর্ব্ব হৃদয়গ্রাহী, মনের উন্নতি ও বিস্তার সাধক তত্ত্বসমূহ ব্যতীত আর কিছু কি শিক্ষিত মানব জাতির শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারে?

কিন্তু আমি ইহাও বলিতে চাই, ভারতবহির্ভূত প্রদেশে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাব বলিতে ভারতীয় ধর্ম্মের মূলতত্ত্বসমূহ, যে ভিত্তি-মূলের উপর ভারতীয় ধর্ম্মরূপ সৌধ নির্ম্মিত, আমি তাহাই মাত্র লক্ষ্য করিতেছি। উহার বিস্তারিত শাখা প্রশাখা, শত শত শতাব্দীর সামাজিক আবশ্যকতায় যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৌণ বিষয় উহার সহিত জড়িত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রথা, দেশাচার ও সামাজিক কল্যাণ বিষয়ক খুঁটিনাটি বিচার প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হইতে পারে না। আমরা ইহাও জানি, আমাদের শাস্ত্রে দুই প্রকার সত্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ করাও হইয়াছে। একটী সনাতন। উহা মানুষের স্বরূপ; আত্মার স্বরূপ; ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ; ঈশ্বরের স্বরূপ; পূর্ণত্ব; সৃষ্টিতত্ত্ব; সৃষ্টির অনন্তত্ব; জগৎ যে শূন্য হইতে প্রসূত নহে, পূর্ব্বাবস্থিত কোন কিছুর বিকাশ মাত্র, এতদ্বিষয়ক মতবাদ; যুগপ্রবাহ সম্বন্ধীয় অদ্ভুত নিয়মাবলি এবং এতদ্বিধ অন্যান্য তত্ত্বসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল সনাতন তত্ত্ব—এমন সকল প্রাকৃতিক বিষয় লইয়া, যে গুলি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। এ গুলি ব্যতীত আবার অনেক গুলি গৌণ বিধিও আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; সেই গুলির দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্য্য নিয়মিত। সে গুলিকে শ্রুতির অন্তর্গত বলিতে পারা যায় না, তাহারা প্রকৃত পক্ষে স্মৃতি ও

* জগতে যত বিভিন্ন শক্তি আছে, তাহারা ক্রমাগত একটী অপরটীতে পরিণত হইতেছে, সমুদয় কিন্তু শক্তির সমষ্টির পরিমাণ সর্ব্বদাই একরূপ। এই তত্ত্বকে Conservation of energy বলে।

পুরাণের অন্তর্গত। এই গুলির সহিত প্রথমোক্ত তত্ত্বসমূহের কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের আর্য্য জাতির ভিতরও এ গুলি ক্রমাগতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত হইতেছে, দেখা যায়। এক যুগের যে বিধান, অন্য যুগের তাহা নহে। যখন এ যুগের পর অন্য যুগ আসিবে, তাহারা আবার অন্য আকার ধারণ করিবে। মহামনা ঋষি সকল আবির্ভূত হইয়া নূতন দেশকালোপযোগী নূতন নূতন আচার প্রবর্ত্তন করিবেন।

জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডের এই সকল অপূর্ব্ব অনন্ত চিরোন্নতিবিধায়ক ক্রমবিকাশশীল ধারণার ভিত্তিস্বরূপ মহান্ তত্ত্বসমূহ ভারতেই প্রসূত হইয়াছে। ভারতেই কেবল মানুষ ক্ষুদ্র জাতীয় দেবতার জন্য প্রতিবেশীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় নাই। "আমার ঈশ্বর সত্য, তোমার ঈশ্বর মিথ্যা, এস যুদ্ধের দ্বারা ইহার মীমাংসা করি!" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার জন্য যুদ্ধরূপ সংকীর্ণ ভাব কেবল এই ভারতেই কখন দেখা দিতে পারে নাই। এই সকল মহান্ মূলতত্ত্ব মানুষের অনন্ত স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের ন্যায় আজও মানবজাতির কল্যাণ-সাধনে শক্তিসম্পন্ন। যতদিন এই পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন কর্ম্মফল থাকিবে, যতদিন আমরা ব্যষ্টি জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিব এবং যতদিন স্বীয় শক্তির দ্বারা আমাদিগকে নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতে হইবে, ততদিন উহাদের ঐরূপ শক্তি বর্ত্তমান থাকিবে।

সর্ব্বোপরি, ভারত জগৎকে এই তত্ত্ব শিখাইবে। যদি আমরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরিণতির প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে আমরা সকল স্থলেই দেখিব যে, প্রথমে প্রত্যেক জাতিরই পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ছিল। এই সকল জাতির মধ্যে যদি পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, তবে সেই সকল দেবতার আবার এক সাধারণ নাম হয়। যেমন বেবিলোনীয় দেবতাগণ। যখন বেবিলোনিয়েরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের দেবতা সকলের সাধারণ নাম বাল (Baal) ছিল। এইরূপ ইহুদী জাতিরও বিভিন্ন দেবগণের সাধারণ নাম মোলক (Moloch) ছিল। আরও দেখিতে পাইবে, এই সকল বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতিবিশেষ অপর সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে এবং তাহারা আপন রাজাকে সকলের রাজা বলিয়া

দাবি করে। ইহা হইতেই স্বভাবতঃই এই ভাব আসিয়া থাকে যে, সেই জাতি নিজের দেবতাকেও অপর সকলের দেবতা করিয়া তুলিতে চায়। বেবিলোনিয়েরা বলিত, বাল মেরোডক দেবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য দেবগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। মোলক য়াভে অন্যান্য মোলক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আর দেবগণের এই শ্রেষ্ঠতা-নিকৃষ্টতা যুদ্ধের দ্বারা স্থিরীকৃত হইত। ভারতেও এই দেবগণের মধ্যে সংঘর্ষ, এই প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব বিদ্যমান ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দেবগন শ্রেষ্ঠতালাভের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতের ও সমগ্র জগতের সৌভাগ্যবলে এই অশান্তি কোলাহলের মধ্য হইতে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (সেই সত্যস্বরূপ একমাত্র, বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানা প্রকারে বর্ণন করিয়া থাকেন) এই মহাবাণী উত্থিত হইয়াছিল। শিব, বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন অথবা বিষ্ণুই সর্ব্বস্ব, শিব কিছুই নহেন,তাহাও নহে। এক ভগবান্‌কেই কেহ শিব কেহ বিষ্ণু আবার অপরে অন্যান্য নানা নামে ডাকিয়া থাকে। নাম বিভিন্ন কিন্তু বস্তু এক। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী কথার মধ্যে সমগ্র ভারতের ইতিহাস পাঠ করিতে পারা যায়। সমগ্র ভারতের ইতিহাস বিস্তারিত ওজস্বী ভাষায় সেই এক মূল তত্ত্বের পুনরুক্তিমাত্র। এই দেশে এই তত্ত্ব বার বার পুনরুক্ত হইয়াছে; পরিশেষে উহা এই জাতির রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জাতির ধমনীতে প্রবাহিত প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে উহা মিশ্রিত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে, জাতীয় জীবনের এক অঙ্গস্বরূপ হইয়া গিয়াছে, যে উপাদানে এই বিরাট্ জাতীয় শরীর নির্ম্মিত তাহার অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে এই ভূমি, পরধর্ম্মে বিদ্বেষ-রাহিত্যের এক অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র রূপে পরিণত হইয়াছে। এই শক্তি-বলেই আমরা আমাদের এই প্রাচীন মাতৃভূমিতে সকল ধর্ম্মকে, সকল সম্প্রদায়কে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবার অধিকার লাভ করিয়াছি।

এই ভারতে আপাতবিরোধী বহু সম্প্রদায় বর্ত্তমান, অথচ সকলেই নির্ব্বি-রোধে বাস করিতেছে। এই অপূর্ব্ব ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা—এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্য। তুমি হয়ত দ্বৈতবাদী আমি হয়ত অদ্বৈতবাদী। তোমার হয়ত বিশ্বাস,—তুমি ভগবানের নিত্য দাস, আবার আর একজন হয়ত বলিতে পারে, আমি ভগবানের সহিত অভিন্ন, কিন্তু উভয়েই খাটি হিন্দু। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই ইহা কিরূপে হয়,

বুঝিবে,—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (সেই সংস্বরূপ একমাত্র; বিপ্র অর্থাৎ সাধুগণ তাঁহাকে নানাভাবে বর্ণনা করেন।) হে আমার স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দ, সর্ব্বোপরি, এই মহান্ সত্য আমাদিগকে জগৎকে শিখাইতে হইবে। অন্যান্য দেশের মহা মহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণও নাক সিঁট্‌কাইয়া আমাদের ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করেন। আমি তাহাদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি; তাহারা স্থির হইয়া কখন এটী ভাবে না যে, তাহাদের মস্তিষ্কে কি ঘোরতর কুসংস্কার সকল বর্ত্তমান। এখনও সর্ব্বত্র এই ভাব,—এই ঘোর সাম্প্রদায়িকতা, মনের এই ঘোর সঙ্কীর্ণতা! তাহার নিজের যাহা আছে, তাহাই জগতে মহা মূল্যবান্ সামগ্রী! অর্থোপাসনাই তাহার মতে জীবনের একমাত্র সদ্ব্যবহার! তাহার যাহা আছে, তাহাই যথার্থ উপার্জ্জনের বস্তু, আর সকল কিছুই নহে! যদি সে মৃত্তিকার কোন অসার বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে, অথবা কোন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়, তবে আর সব ফেলিয়া দিয়া তাহা-কেই ভাল বলিতে হইবে! জগতে শিক্ষার বহুল প্রচার সত্ত্বেও সমগ্র জগতের এই অবস্থা! কিন্তু বাস্তবিক জগতে এখনও শিক্ষার প্রয়োজন—জগতে এখনও সভ্যতার প্রয়োজন। বলিতে কি, এখনও কোথাও সভ্য-তার আরম্ভমাত্র হয় নাই, এক্ষণে মনুষ্যজাতির শতকরা ৯৯.৯ জন অল্প বিস্তর অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে। বিভিন্ন পুস্তকে তোমরা অনেক বড় বড় কথা পড়িতে পার, পরধর্ম্মে বিদ্বেষরাহিত্য ও এতদ্বিধ উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসম্বন্ধে আমরা গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, জগতে এই ভাবগুলির বাস্তব সত্তা বড় কম; শতকরা নিরনব্বই জন, এ সকল বিষয় মনে স্থানই দেয় না। পৃথিবীর যে কোন দেশেই আমি গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি, এখনও প্রবল পরধর্ম্মবিদ্বেষ বর্ত্তমান; নূতন বিষয় শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেও যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইত, এখনও সেই প্রাচীন আপত্তি সকল উত্থাপিত হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ, জগতে যতটুকু পরধর্ম্মে বিদ্বেষরাহিত্য ও ধর্ম্মভাবের সহিত সহানুভূতি আছে, তাহা এখানেই, এই আর্য্যভূমেই বিদ্যমান্, অপর কোথাও নাই। এখানেই কেবল ভারতবর্ষবাসীরা মুসলমানদের জন্য মস্‌জিদ ও খ্রীশ্চিয়ানদের জন্য গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, আর কোথাও নহে। যদি তুমি অন্যান্য দেশে গিয়া মুসলমানগণকে বা অন্য

ধর্ম্মাবলম্বিগণকে তোমার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিও, তাহারা কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্ত্তে তাহারা সেই মন্দির এবং পারে ত সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটীও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। এই কারণেই জগতের পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন—ভারতের নিকট জগৎকে এখনও এই পরধর্ম্মে দ্বেষরাহিত্য—শুধু তাহাই নহে, পরধর্ম্মের সহিত প্রবল সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে। শিবমহিম্নস্তোত্রে কথিত হইয়াছে,—

> "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
> প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
> রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
> নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

অর্থাৎ "বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত মত ও বৈষ্ণব মত, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বন্ধে কেহ একটীকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটীকে হিতকর বলে। সমুদ্র যেমন নদী সকলের একমাত্র গম্যস্থান, এইরূপ রুচিভেদে সরলকুটিল নানাপথগামী জনগণের তুমিও তদ্রূপ একমাত্র গম্য।" ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতেছে বটে কিন্তু সকলেই একস্থানে চলিয়াছে। কেহ একটু বক্রপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া, কেহ বা সরল পথে যাইতে পারে, কিন্তু অবশেষে হে প্রভু, সকলেই তোমার নিকট আসিবে। তখনই তোমার ভক্তি এবং তোমার শিব সম্পূর্ণ, যখন তুমি শুধু তাঁহাকে কেবল যে শিবলিঙ্গে দেখিবে, তাহা নহে, সর্ব্বত্র দেখিবে। তিনিই যথার্থ সাধু, তিনিই যথার্থ হরির ভক্ত, যিনি সেই হরিকে সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে দেখিয়া থাকেন। যদি তুমি যথার্থ শিবের ভক্ত হও, তবে তুমি তাঁহাকে সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে দেখিবে। যে নামে, যেরূপে তাঁহাকে উপাসনা করা হউক না কেন, তোমাকে বুঝিতে হইবে, সে তাঁহারই উপাসনা। কেব্‌লার * দিকে মুখ করিয়াই কেহ জানু অবনত করুক অথবা খ্রীষ্টিয়

* মহম্মদের জন্মভূমি মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থ মক্কানগরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ মস্‌জিদের মধ্যবর্ত্তী আয়তাকার ক্ষুদ্র মন্দিরবিশেষে যে কৃষ্ণপ্রস্তর রক্ষিত আছে, তাহার নাম কেব্‌লা। কথিত আছে, দেবদূত গেব্রিয়েলের নিকট হইতে এই প্রস্তর খণ্ড পাওয়া যায়। মুসলমানেরা ইহাকে অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যেখানেই থাকুন

গোপীনাথ দর্শন

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসগুপ্ত।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তিন অধ্যায় পাঠ হওয়ার পর আমাদিগের ৺গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্য ডাক পড়িল। এ সময় ভগবানের বাল্য ভোগ হইয়া আরতি আরম্ভ হইয়াছে। আনন্দে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। গায় রোমাঞ্চ হইয়া অবশ বোধ হইতে লাগিল। আমরা গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের মন্দিরের দ্বারদেশে যাইতেছি, এমন সময় ভগবানের সেবক অধিকারী মহাশয় আমাদিগকে নাট মন্দিরের ভিতর দিয়া যাইতে কহিলেন, কারণ, সেখান হইতে ভাল রূপ দর্শন করা যায়। আমরা তাহাই করিলাম।

দেখিলাম, গরুড় ভগবানের আসন পৃষ্ঠে লইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান। দক্ষিণে ভগবান্ বলরাম। মধ্যে ভগবান্ গোপীনাথ, তাঁহার বামে ভগবতী লক্ষ্মী। ভগবানের সুন্দর সুঠাম শরীর। মুখপদ্ম সুপ্রশস্ত। চক্ষুর্দ্বয় নীলোৎপলসদৃশ। হস্তে বাঁশি। পরিধান পীতবসন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন। গলদেশে বনমালা, মস্তকে চূড়া। তিনি কিশোর-বয়স্ক তিনি চিন্ময় হইয়াও দারুময় রূপে প্রকাশিত। তিনি জন্মরহিত হইয়াও উৎপথগামীদিগের বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মরহিত হইয়াও জীব সকলের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য কর্ম্ম করিতেছেন।

তাঁহাকে দেখিয়া ভাগবতোক্ত লীলা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত বাক্যাবলী যুগপৎ মনে হইতে লাগিল। তিনি অজ হইয়াও বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তবীর্য্য হইয়াও কংসভয়ে ভীতের ন্যায় ব্রজে গমন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে বাস করেন। তিনি মথুরায় কুব্জা ত্রিবক্রাকে সরল ও সমানাঙ্গ করিয়াছিলেন। বিশাল ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন। মল্লক্রীড়া করিয়া হস্তীসহ মল্লগণকে নিহত করিয়াছিলেন। মহাবীর্য্যবান্ অসুররাজ কংসকে বধ করিয়া আপন জনক জননীর উদ্ধার সাধন করিয়া তাঁহাদিগের পাদবন্দনা পূর্ব্বক কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রজধামে গোপদিগকে ব্রহ্মরূপ দেখাইয়াছিলেন। তিনি শৈশবাবস্থায় কংসপ্রেরিত দুষ্টা পূতনা রাক্ষসীকে বধ করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র কর্ত্তৃক বারিধারা

বর্ষণের সময় তিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। গোপবালক ও গোপকুমারীগণ তাঁহার প্রণয়ে সর্ব্বদা তদ্গতপ্রাণ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতেন। তাঁহার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া যমুনা উজান বহিত। গোপীগণ যিনি যে কাজে যেখানে থাকিতেন, তিনি সেই কাজ পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইতেন। কেহ দুগ্ধ দোহন করিতে থাকিলে গাভী ও দুগ্ধপাত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে ধাবিত হইতেন। কেহ চুল্লীতে দুগ্ধ চাপাইয়া, কেহ বা পক্ক অন্ন না নামাইয়া অমনি গমন করিতেন। কেহ বা পরিবেশন করিতে থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, কেহ বা স্তন্যপানশীল শিশুকে ফেলিয়া কেহ বা স্বামী সেবা করিবার সময় স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া সবেগে প্রস্থান করিতেন। ভোজন, অনুলেপন, গাত্রমার্জ্জন ও নয়নে অঞ্জনলেপনপরায়ণা রমণীগণ নিজ নিজ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া একান্ত অন্তঃকরণে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। কোন কোন গোপকুমারী অলঙ্কার পরিধান করিতে যাইয়া এক অঙ্গের অলঙ্কার অন্যাঙ্গে পরিধান করিয়া প্রস্থান করিতেন। পিতা, ভ্রাতা, পতি, বন্ধুগণ নিবারণ করিলেও নিবৃত্ত হইতে পারিতেন না। কোন গোপকুমারী গুরুজন কর্ত্তৃক বলদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া গৃহে অবরুদ্ধা হইলে তাঁহার ধ্যানে তদ্গতপ্রাণা হইয়া শরীর ত্যাগ করিতেন। তিনিও গোপীগতপ্রাণ ছিলেন। এই জন্যই তিনি গোপীনাথ।

আমরা সতৃষ্ণনয়নে সেই ভগবান্ গোপীনাথের চরণারবিন্দ হইতে মুখপদ্ম পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। দৌহিত্র দুটীকে এবং আমার ছেলেকেও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাইলাম। আমার ছোট কন্যা ভগবানের জন্য একখানা সোণার ধুক্‌ধুকি তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা দেওয়া গেল। পূজক তাহা ভগবানের গলদেশে পরাইয়া দিলেন। আমরা যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিলাম। যতক্ষণ মন্দিরের দ্বার খোলা থাকিল, আমরা প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করিতে লাগিলাম। আমরা নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে করিতেই ভগবানের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। আমরা বাল্যভোগের প্রসাদ চিঁড়া, চিনি, কলা এবং কাঁঠাল পাইয়া বাসাঘরে আসিয়া ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিলাম। বাল্যভোগের সময় যে আতপ ভোগ হয়, তদ্দ্বারাই অন্নপ্রাশন করান রীতি। আমরা সেই প্রসাদ দ্বারাই খোকার অন্নপ্রাশন করিলাম। খোকার নাম গোপীনাথ রাখিলাম।

শুনিলাম, এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই ভগবানের এই প্রসাদ দ্বারা শিশুর অন্নপ্রাশন করাইয়া থাকে। মুসলমানগণই না কি হিন্দুগণ হইতে উক্ত প্রসাদের উপর অধিকতর ভক্তিসম্পন্ন। স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই ভগবানের মহিমা অধিকতর প্রচার। ভগবানের মন্দিরের সমীপবাসী ভদ্র লোকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও শ্রদ্ধা ভক্তির অল্পতা দেখিলাম। মনে করিলাম, ইহাও ভগবানের একলীলা। অতঃপর অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভগবানের ভোগ হইলে আমাদিগকে ভোগ দর্শনের জন্য ডাকিল। বাস্তবিক ইহা দেখিবার জিনিষই বটে! প্রত্যহ ২৭ সের চাউলের অন্ন ও তদনুরূপ ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ হয়। ছোট বড় নয়খানা থালাতে অন্ন সজ্জিত। থালার পিছনে বড় বড় বাটিতে ডাল তরকারী। আমরা ভোগ দর্শন করিয়া প্রণাম করিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম যে, ভোগ দর্শন করিয়া কিছু দর্শনী দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু পূর্ব্বে তাহা না জানা থাকায় দর্শনী দিতে পারি নাই। অগ্রেই ভোগের জন্য যৎকিঞ্চিৎ এবং অন্নপ্রাশনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম। খানিক পরে অধিকারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগকে প্রসাদ পরিবেশন করিয়া দেওয়া হইবে কি একত্রে দেওয়া হইবে। আমি মেয়ে-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া একত্রেই প্রসাদ দিতে বলিলাম। জনৈক পাচক পাঁচজনের উদরপূর্ত্তি হয়, এমন একটী ভোগ ও তদুপযোগী ব্যঞ্জনাদি দিয়া গেল। আমরা প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলাম। সকলকেই কহিলাম, যেন একটী অন্নও মাটীতে না পড়ে।

আমরা ভক্তিসহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার স্ত্রী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তরকারীর শুক্তা, কচু বেগুন ভাজা, কুমড়ার ঘণ্ট, বুটের ডাল, অম্ল, দধি এবং পায়স দিয়া তৃপ্তি সহকারে উদর পূর্ত্তি করিয়া সেই প্রসাদান্ন গ্রহণ করিলাম। কিছু বেশী হইল, তাহা ফেরত দিলাম। সকল ব্যঞ্জনই খুব ভাল হইয়াছিল, তন্মধ্যে শুক্তা ও কুমড়ার ঘণ্ট বিশেষ। শুনিলাম, পূর্ব্ব কালে হয়বত নগরের কোন এক দেওয়ান সাহেব ৺গোপীনাথের প্রসাদ গ্রহণ কালে শুক্তা আস্বাদন করিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এই শুক্তা পাক করিতে প্রত্যহ ॥০ আনা কি ॥৴০ আনা খরচ লাগে। অতঃপর তিনি ঐ শুক্তার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৺গোপীনাথের নামে এক খানি ছোট গ্রাম লিখিয়া দেন। এখন তাহাতে বার্ষিক দুই কি আড়াই

শত টাকা আয় হয়। তদবধি ৺গোপীনাথের ভোগে প্রতিদিন শুক্তা হওয়া নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার প্রতিদিন লেবুও হওয়া চাই। লেবুরও একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। একদা জনৈক লোক ৺ শ্রীক্ষেত্রে ভগবানের নিকট হত্যা দেয়। তাহার প্রতি আদেশ হয় যে, আমি যেখানে প্রত্যহ লেবু খাইয়া থাকি, তুই যদি সেখানে যাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিস, তাহা হইলে তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। সে ব্যক্তি বহু অনুসন্ধানে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রায় এক-শত লোক প্রত্যহ ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। সকলে এদিক্ ওদিক্ বসিয়া আহার করিতেছে। পাচকগণ পরিবেশন করিতেছে। প্রত্যহ এরূপ একটা ব্যাপার নির্ব্বাহ করা সহজ নহে। এ সময় দরজা খোলা থাকা সত্বেও আমাদিগের ভগবদ্দর্শনের সুবিধা হইল না। দরজার নিকট এবং নাটমন্দিরের ভিতরও অনেকে বসিয়া আহার করিতেছিল। সকলের আহারাদি হইয়া গেলে আমরা নাটমন্দিরে বসিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম। ভূমিকম্পে পূর্ব্ব নাটমন্দির ভূমিসাৎ হইয়া যায়, এখন নূতন নাটমন্দির তোলা হইতেছে; দেওয়াল গুলি মাত্র উঠিয়াছে, আজিও ছাদ হয় নাই। খানিক পরে বৃষ্টি আসিল। আমরা আবার বাসাঘরে গেলাম এবং ভগবৎকথা কহিতে লাগিলাম। সে সময় আবার বৈকালীর সময় হইল। বৈকালী হইয়া গেলে পুনরায় দ্বার খোলা হইল। আমরা পুনরায় ভগবদ্দর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তগিরিশিখরে আরোহণ করিলেন। খানিক পরেই আরতি আরম্ভ হইল। আমরা একাগ্রমনে তাহা দর্শন করিতে লাগিলাম। ভগবানের মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইল। এখনই আমা-দিগকে রওনা হইতে হইবে ভাবিয়া অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন যে কি আনন্দে কাটাইলাম, তাহা বর্ণনাতীত। এখন ঠাকুরকে ছাড়িয়া যাইতে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বিশেষ আর কি কহিব, যে উল্লাসে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, ঠিক সেই পরিমাণ বিষাদভারাক্রান্ত হইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলাম। বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলাম। ভগবানের মন্দিরে সে সময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলকেই ভগবান্ জ্ঞানে প্রণাম করিলাম। তৎপরে মন্দির সমীপবর্ত্তী বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী, ঘর দোর, খাল পুকুর, রাস্তা ঘাট সকলকে যথাবিহিত প্রণাম করিতে করিতে পুরী হইতে বহির্গত হইলাম।

আচমিতা নিবাসী পূর্ব্বোক্ত বন্ধুবরের সবিশেষ যত্নে আমরা পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। তাঁহার এক সহোদর ভ্রাতা ও অন্য একজন লোক সমস্ত দিন আমাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বহু উপচারে ও বহু যত্নে তিনি সকলকে আহার করান। তাঁহার আত্মীয়তা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, আমি কিম্বা আমার স্ত্রী পরান্ন গ্রহণ করি না শুনিয়া আমাদের নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। আহারান্তে রাত্রি প্রায় ১টার সময় লোকজন ও সোয়ারী দিয়া নৌকায় পাঠাইয়া দিলেন। ইহাঁরা সকলেই অতি সাধুপ্রকৃতি। তাঁহার এক ভ্রাতা অত্যন্ত সাধু পুরুষ ছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা সযত্নে তাঁহার আসন, পাদুকা ও বস্ত্রাদি রক্ষা করিতেছেন। প্রত্যহ ধূপ দীপ দ্বারা আরতি ও হরিলুট হয়। ছেলেমেয়েগণ ভক্তিভাবে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাঁহাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলাম। যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, ততক্ষণ পরমানন্দ ভোগ করিয়াছিলাম।

আমরা নৌকারোহণ করিয়াই নৌকা খুলিয়া দিলাম। অল্প দূর আসিয়াই মাঝিগণ নৌকা বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন সকালে রওনা হইয়া এক প্রহরের মধ্যেই ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়িলাম। এবার উজান যাইতে হইবে। পাল ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আমার মাঝিগণ কিন্তু ইহাতেও অপটু। প্রত্যেক বারই পাল উঠাইতে ও নামাইতে ভয়ানক হৈ চৈ লাগে এবং নৌকা ডুবিবার উপক্রম হয়। যাহা হউক, আমার চাকরটীর কৃতিত্বে এবং ভগবানের কৃপায় প্রাণটী হাতে লইয়া বুধবার দুই প্রহরের সময় ঘাটে পৌঁছিলাম।

ভোগবেতালে ৺ গোপীনাথ দর্শন করিতে হইলে ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে লাইনে কাওরাইদ্ ষ্টেশনে নামিয়া নৌকাপথে বেতালের ঘাটে যাইতে হয়। নৌকাভাড়া ২৲ টাকা ২॥০ টাকা লাগে। কাওরাইদ্ হইতে মঠখলা পর্য্যন্ত যাইতে গহনার নৌকাও পাওয়া যায়। ভাড়া প্রতিজন চারি আনা মাত্র। মঠখলা হইতে ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড সড়ক ধরিয়া ছয় মাইল গেলেই ভোগবেতালে অবস্থিত ৺গোপীনাথের মন্দির পাওয়া যায়। মঠখলায় এক

কালীবাড়ী আছে। তথাকার ভূম্যধিকারী মহাশয় সবিশেষ যত্ন করিয়া সকলেরই আতিথ্য সংকার করিয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে মঠখলা হইতে পাল্‌কী সোয়ারী ভাড়া করিয়াও যাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায় না। আশা করি, ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণ এই স্থানে ভগবান্ দর্শন করিয়া মনুষ্যজীবন সার্থক করিবেন।

সাংখ্যদর্শন।

(পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী।)

শিল্পহীন, বিজ্ঞানহীন, উৎসাহহীন, নিয়তপরপদবিদলিত, পরমুখাপেক্ষী, অলসচূড়ামণি আমরা, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ভাবিতে পারি না যে, অসাধারণ বিজ্ঞানবিৎ কণাদ মুনি ; রাজসূয়যজ্ঞকালীন যুধিষ্ঠিরের সভাস্থিত স্ফটিকে জল ও জলে স্ফটিকবিভ্রমোৎপাদক শিল্পশাস্ত্রবিশারদ, জ্যোতির্ব্বিদাচার্য্য ময়দানব ; বন্দুক, কামান প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা, নীতিশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য বিদুর প্রভৃতি ; দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতা কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম, জৈমিনি, বেদব্যাস প্রভৃতি ; বৈয়াকরণাগ্রগণ্য পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, স্ফোটায়ন, গার্গ্য প্রভৃতি ; বীরেন্দ্রকেশরী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, জামদগ্ন্য, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি ; সুপ্রসিদ্ধ কবীন্দ্রগুরু বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি এবং ভূগোল ভগোল তত্ত্বজ্ঞ, বিবিধ গণিতজ্ঞ, নানাবিধ যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট, বরাহ, মিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

নিয়ত ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত, ইংরেজী ভাবে দীক্ষিত, হাঁচিতে, কাশিতে, খাইতে, শুইতে নিরন্তর ইংরেজী ভাবানুশীলনশীল, ইংরেজীতে স্বপ্নদর্শনপরায়ণ, সংস্কৃতভাষালেশানভিজ্ঞ জনগণ মনে করেন, এ দেশে কোন দিনও কিছু ছিল না ; তবে দুই একটা আফিম বা গুলিখোরের মত লোক ছিল ; তারা ধুনি জ্বেলে, চোক্ বুজে গাছতলায় বসে থাক্‌ত আর দুটা একটা আজগুবি বলে ফেল্‌ত ; পরবর্ত্তী ভট্‌চায্যিরা তাতে দু একটা আধুনিক বিজ্ঞান, শিল্প জ্যোতিষের কথা বসিয়ে দিয়ে "সব জান্তা রহা" বল্‌ছে।

এ দিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদিও কাহাকেও সাহস করিয়া কোনও কথা বলিতে পারেন না; কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গৃহাভ্যন্তরে উপবেশন করিয়া দুই এক জন শিষ্যকেও বলিয়া থাকেন যে—আমাদের সেই ফলমূলজলবাতাহারী, সুপক্কশ্মশ্রুধারী, স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালপরিভ্রমণকারী, জটাবল্কলধারী, একান্তশিথিলচর্ম্ম, নিয়তবৃক্ষমূলাশ্রয়পরায়ণ, তপঃসম্পন্ন, ত্রিকালজ্ঞ, বহুসহস্রবর্ষব্যাপী পরমায়ু-বিশিষ্ট মহর্ষিগণ না জানিয়াছেন এবং লোককৃপাপরবশ হইয়া প্রকাশ না করিয়াছেন, এমন কোন কথাই হইতে পারে না। রেল বল, টেলিগ্রাফ্ বল, মুদ্রাযন্ত্র, ফণোগ্রাফ বল, এমন কি, এখনও ইয়ুরোপীয়গণ যাহা প্রস্তুত করিতে এবং যে সকল বিষয় কল্পনাও করিতে পারেন নাই, তাহাও সমস্তই আমাদের দেশে ছিল এবং অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত মুসলমান-গণ সেই সমস্ত গ্রন্থ অগ্নিসংযোগে দগ্ধীভূত করিয়াছে বলিয়া সংপ্রতি আমাদের এই দুর্দ্দশা।—আমরা প্রতি বিষয়েই ইয়ুরোপীয়গণের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছি।

একই হিন্দুস্থানে এরূপ মতদ্বৈধের কারণ আমাদের দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে—আমাদের মন দীর্ঘকাল যে বিষয়ের আলোচনা করে, তাহাই সুদৃঢ়রূপে অভ্যাস করিয়া ফেলে। এই জন্যই শৈশবাবধি যাহারা কেবল ইংরেজী আলোচনা করে, তাহারা স্বভাবতঃই প্রাচীন আর্য্য গৌরবে বিশ্বাস স্থাপনে সঙ্কুচিত। পক্ষান্তরে আবার আশৈশবাৎ শুভ্রকেশ স্খলিতদন্ত পর্য্যন্ত সংস্কৃতশাস্ত্রানুশীলগণও ঠিক তদ্রূপ একদেশী।

আমরা সুধু ইংরেজী বা সুধু সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণকে তাঁহাদের সুদীর্ঘ-কালের সংস্কার সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে বলি না। যথাসাধ্য প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রবন্ধমধ্যে কোন সম্প্রদায়ের রুচিবিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য পাঠকের জিজ্ঞাসার উদয় হইলেই প্রবন্ধকার আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে।

অতি সূক্ষ্ম কীটাণু হইতে আরম্ভ করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই সুখের জন্য লালায়িত এবং নিয়ত যত্নবান্। ঐ যে তরুতল-শায়ী দুরন্ত পৌষশীতেও ছিন্নকন্থামাত্রাবলম্বী, মদমত্তধনিজনবিতাড়িত, অনশন, বা অর্দ্ধাশনপরায়ণ দরিদ্র ব্যক্তি, স্বোদর পরিপূরণমাত্রেই সুখী হইবে মনে করিয়া নিয়ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহারও যেমন

সুখের চেষ্টা, সুরম্য হর্ম্মোপরি, সুকোমল দুগ্ধফেননিভশয্যাশায়ী, ক্ষীরসরনবনীতাদিচর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয়ভোজনপরায়ণ গজবাজিশকটারোহণে পরিভ্রমণশীল ধনিশিরোমণিরও তদ্রূপ।

আর ঐ যে সাধু পুরুষ নিরন্তর ধ্যানস্তিমিতলোচনে বাতাতপবৃষ্টি কুজ্ঝটিকা ও দুর্বিসহ শীতসহনপরায়ণ হইয়া সমস্ত সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর তপোবলম্বনপুরঃসর তরুতলাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারও উদ্দেশ্য সুখলাভ। তবে তাঁহার সুখের ধারণা ভিন্ন, এই মাত্র। তিনি ত্রিতাপের আত্যন্তিক বিনাশেই সুখ খুঁজিতেছেন।

কোন কোন পুরাণের মতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সনকসনন্দনাদি মানস পুত্রগণের মধ্যে কপিল একজন। তাঁহার পূর্ব্বে সুতরাং আর নরসৃষ্টি ছিল না; এই অতি প্রাচীন চিরকৌমার্য্যব্রতাবলম্বী মুনিশ্রেষ্ঠ কপিলই ত্রিতাপ ধ্বংসের উপায় বিশিষ্ট সাংখ্য দর্শনের প্রবর্ত্তক বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত।

অন্যান্য দর্শনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও অনেক প্রবল প্রমাণ আছে। উপনিষদ্ একত্ববাদে পরিপূর্ণ; একত্ব প্রতিপাদক বেদান্ত আবার উপনিষৎ-প্রমাণ সুতরাং বেদান্তের প্রাচীনত্ব অনুমিত হয়। উপনিষদের আধুনিকত্ব প্রতিপাদনকারিগণের মত সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লইলেও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেও "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি একত্ব প্রতিপাদক বাক্য সকল দেখা যায়। যদি বল, ঐ দশম মণ্ডল আধুনিক, তবে সর্ব্ববাদিসম্মত প্রাচীনতম তৃতীয় মণ্ডলস্থ অষ্টাবিংশতি বর্গের পঞ্চপঞ্চাশৎ সূক্তের প্রথম মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাবিংশ মন্ত্র পর্য্যন্ত যে "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্" মন্ত্রাংশ আছে, তাহাও একত্ব প্রতিপাদক। অতএব বেদান্ত মতও যে অতি প্রাচীন, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে বাধ্য হইতে হইবে। কেবল বেদান্তই বা বলি কেন, ন্যায় দর্শনের দ্বৈতবাদও যে শ্রুতিসম্পন্ন, তাহা প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক মণ্ডলেই স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ। বলিতে কি, মুণ্ডকোপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে "তয়োরন্যঃ পিপ্পলঃ স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইহাও ন্যায়সম্মত দ্বৈতবাদ প্রতিপাদন সম্বন্ধেই অনুকূল হইয়া থাকে।

অতএব সাংখ্য দর্শনই যে কেবল প্রাচীন, তাহা নহে; সকল দর্শনেরই মূল যখন বেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন সকল দর্শনই অতি প্রাচীন, সন্দেহ নাই, কিন্তু সাংখ্যের সর্ব্বপ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। আপাততঃ তদালোচনা অনাবশ্যক। এই পর্য্যন্ত বলিলেই

যথেষ্ট হইবে যে, মহর্ষি কপিলই সর্ব্বপ্রথমে বেদরাশির মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত দার্শনিক তত্ত্বরাশিকে অসামান্য প্রতিভাবলে সম্বদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" এই প্রকৃতিপুরুষাত্মক শ্রুতিবীজকে বিকশিত করিয়া সাংখ্য দর্শনরূপে ধরাবাসী জনগণের হিতকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। পরমারাধ্য আচার্য্য শঙ্করও সাংখ্য দর্শনের নামোল্লেখ কালে সম্মানার্থ ভূয়োভূয়ঃ "বৃদ্ধ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

যে শাস্ত্রে তত্ত্বসমূহের সংখ্যা বিশেষরূপে গণিত হইয়াছে, তাহার নাম সাংখ্য। এই শাস্ত্র মহর্ষি কপিলের নিকট হইতে তচ্ছিষ্য আসুরি মুনি প্রাপ্ত হন। পরে তচ্ছিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য এবং তৎপরে শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি মনীষিগণ কর্ত্তৃক উহা প্রকাশিত, প্রচারিত, প্রবর্ত্তিত এবং পরিব্যাপ্ত হইয়া সম্প্রতি নানা স্থানে পর্য্যালোচিত হইতেছে। জানিনা, এই আলোচনায় উহার অসাঙ্গাঙ্গ সমূহ পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ উহার উন্নতিই হইবে, বা কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তনে মহর্ষির মহাভাব অন্তর্হিত এবং ক্রমে ক্রমে স্বেচ্ছানুযায়ী অর্থসমূহ প্রচারিত হইবে।

এই প্রবন্ধ প্রারম্ভে আমাদেরও চিত্ত সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হই-তেছে যে, সাংখ্যকর্ত্তা কপিল মুনির যথার্থ অভিপ্রায় কি। বর্ত্তমান কালে যাহা সাংখ্য সূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহার ভাষ্য আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু করিয়াছেন, তাহাই মহর্ষি কপিল প্রণীত; না, তাহা অন্য কোনও গ্রন্থ, যাহা আমাদের অদৃষ্ট বশতঃ নানাবিধ শাস্ত্রবিপ্লবে ও ধর্ম্মবিপ্লবে লুপ্ত হইয়াছে?

এইরূপ সন্দেহের কারণ এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্ব্বিংশ ও পঞ্চবিংশ প্রভৃতি অধ্যায়ে ভগবদবতার কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে যে সাংখ্যযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণই ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদে পরিপূর্ণ; কিন্তু সাংখ্যসূত্রে নিরীশ্বরবাদেরই পরিপোষণ দৃষ্ট হয়। সাংখ্য-কারিকাতেও ঐরূপ বাদেরই সমর্থন দেখা যায়। ষড়্দর্শনটীকাকার বাচস্পতিমিশ্রও ঐরূপ অনীশ্বরবাদই ব্যাখ্যাচ্ছলে সমর্থন করিয়া গিয়া-ছেন। আর সেই পরমধীমান্ বাচস্পতি মিশ্র টীকা করিতে গিয়া সাংখ্য সূত্রের টীকা না করিয়া সাংখ্যকারিকার টীকা করাতে আরও সংশয়

হয় যে—ইদানীন্তন প্রচলিত সাংখ্যসূত্র যদি মহর্ষি কপিল প্রণীতই হইবে, তবে উক্ত মহোদয়ই বা সেই প্রামাণিক গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকার টীকা করিতে যাইবেন কেন?

যদিও বলা যাইতে পারে যে, কি বেদান্ত, কি ন্যায় সকল দর্শনেরই বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় যেমন ব্যাসসূত্র বা গৌতমসূত্র পরিত্যাগ করতঃ শাঙ্করভাষ্য বাৎস্যায়ন ভাষ্যাদিরই টীকা করিয়াছেন, সেইরূপ এই স্থলেও কপিল প্রণীত মূল সাংখ্য সূত্র পরিত্যাগ করিয়া তাহার ভাষ্য স্বরূপ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকার টীকা করিয়াছেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব। ইহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, সাংখ্যকারিকা সাংখ্য সূত্রের ভাষ্য নহে; যেহেতু সূত্র অপেক্ষা কারিকা অনেক লঘু। এমন কি, স্থানে স্থানে চারি পাঁচটী সূত্রের বিষয় একটী কারিকাতেই উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। মূল অপেক্ষা ভাষ্য লঘু, একথা সম্পূর্ণই উপহাসাস্পদ। বিশেষতঃ আরও সংশয়ের বিষয় এই যে, যদি বর্ত্তমান প্রচারিত সাংখ্য সূত্রই মহর্ষি কপিল প্রণীত হইত; তবে শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, উদয়নাচার্য্য, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ কোথাও ঐ সূত্র একবারও প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ না করিয়া সাংখ্যকারিকারই বা উল্লেখ করিবেন কেন? এমন কি, বাচস্পতি মিশ্রও ত সাংখ্যের টীকায় কুত্রাপি প্রমাণস্বরূপ সাংখ্য সূত্রের উল্লেখ করিলেন না।

সাংখ্যকারিকাকেও আমরা কপিল প্রণীত মনে করিতে পারি না, কারণ, উহা শ্লোকাকারে রচিত; সেই শ্লোকও আবার বৈদিক 'বৃহতী' প্রভৃতি ছন্দের পরিবর্ত্তে আধুনিক 'আর্য্যা' ছন্দে রচিত। অনেক শ্লোক করিতে গেলে অন্ততঃ পাদপূরণের জন্যও এক আধটী অক্ষর বাড়িয়া যাওয়ার খুব সম্ভব কিন্তু তাহা হইলে আর তাহা সূত্র হইল না। কারণ, সূত্র এত লঘু যে, তাহার মধ্যে একটীও অতিরিক্ত অক্ষর থাকিতে পারে না। কোনও মূল্যবান্ বাক্য যাহাতে সহজ উপায়ে নিরন্তর স্মরণ রাখা যায়, সেই জন্যই ঋষিগণ দর্শন সমূহ সূত্রাকারে প্রণয়ন করিয়াছেন। আর সকল দর্শনই যখন সূত্রাকারে রচিত, তখন সাংখ্য দর্শনও শ্লোকাকারে না হইয়া সূত্রাকারে রচিত হওয়াই খুব বেশী সম্ভব। বিশেষতঃ, সাংখ্যকারিকা যখন ঈশ্বরকৃষ্ণের রচিত বলিয়াই ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং সেই ব্যবহার যখন যুক্তিযুক্ত

বলিয়াই বোধ হইতেছে, তখন সেই সাংখ্যকারিকার প্রণেতা কপিল, ইহা বলিতে যাওয়া কতদূর সঙ্গত জানিনা। বাস্তবিক পক্ষে কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শনের লোপ হইয়াছে, ইহাই খুব সম্ভব।

প্রয়োজন ব্যতীত কেহই কোনও কাজ করে না এবং করিতে পারে না, এটী স্বতঃসিদ্ধ বাক্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা যে, জলক্রীড়া করে, কিঞ্চিৎ আনন্দ ভোগই তাহার প্রয়োজন; সুতরাং মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি কপিল বিনা প্রযোজনে বা অতি সামান্য প্রযোজনে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন অবশ্যই করেন নাই। সুতরাং এই সাংখ্য শাস্ত্র প্রণয়নের অবশ্যই বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; সেই উদ্দেশ্য কি?

অধিকাংশ মানবই যেমন চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ সকল জীবও তাহাদের চিরসহচর ত্রিবিধ দুঃখ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। আমাদের যত প্রকার দুঃখ আছে, তাহা সাংখ্যকার প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—শারীরিক ও মানসিক। বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনটী বস্তু আমাদের শরীরে যত কাল সাম্যভাবে অবস্থান করে, ততকালই আমাদের শরীর সুস্থ থাকে। ইহাদের একটীরও অল্পতা বা আধিক্য হইলেই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরধারী জনগণের পক্ষে আরোগ্য যে সুখের মূল, তাহা আর লিখিয়া বুঝাইতে হইবে না। যিনি একবারও ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তিনিই ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। জ্বরাদি সমস্ত রোগই শরীরকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় এবং অবস্থান করে বলিয়া ব্যাধিজনিত দুঃখকেই শারীরিক দুঃখ বলে।

কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণ মনে যে অপরিসীম অশান্তির উৎপাদন করে, তাহাকেই মানসিক দুঃখ বলে। মৃত শরীরে চক্ষু কর্ণাদি বর্ত্তমান থাকিলেও মন বিদ্যমান থাকে না বলিয়া কাম ক্রোধাদি সেই শরীরকে পীড়া দিতে পারে না। বহিরিন্দ্রিয় নষ্ট হইলেও মন হইতে কামাদি রিপু বিদূরিত হয় না। মনই কামাদির জনক বলিয়া রিপুর তাড়না জনিত দুঃখকেই মানসিক দুঃখ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনের অন্য নাম আত্মা; এই জন্য শারীরিক ও মানসিক দুঃখদ্বয়ের সাধারণ নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ।

ভূত বলিলে দেহধারী প্রাণীমাত্র এবং ভূমি জল প্রভৃতি পঞ্চভূতকে বুঝায় ; সুতরাং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্পাদি জঙ্গম এবং বক্ষুব ভূমি পর্ব্বতাদি স্থাবর দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আধিভৌতিক দুঃখ বলে। কোনও ভূতকে অধিকার অর্থাৎ অবলম্বন করাকে অধিভূত বলে ; তাহা হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ, তাহা আধিভৌতিক।

বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস, শনি, মঙ্গল প্রভৃতি দেবশরীর হইতে লোকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। শত সাবধান হইলেও, শতধার্ম্মিক হইলেও এই দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। নলরাজা, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধার্ম্মিকচূড়ামণিগণ এ বিষয়ে সম্যক্ নিদর্শনস্থল।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এই ত্রিবিধ দুঃখ যদি নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশরহিত হয়, তবে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা বৃথা। আর যদি নিত্য না হইয়া অনিত্য হয় অথচ বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় আমাদের শক্তিতে উহার নিবারণ অসাধ্য হয়, তবে এই ত্রিতাপ নিবারণ জন্য শাস্ত্র প্রণয়নও অনাবশ্যক।

অথবা শাস্ত্রোল্লিখিত বাক্য প্রতিপালনেও যদি দুঃখ দূর না হয়, কিম্বা ইহা ভিন্ন যদি অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উহার নিবৃত্তি সম্ভব হয়, তবে ত সাংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ন করা সম্পূর্ণই অনাবশ্যক।

প্রকৃত পক্ষে দুঃখ কখনও নিত্য পদার্থ নহে এবং আমরা উহা দূরও করিতে পারি ; আর সাংখ্য শাস্ত্র প্রবর্ত্তন ব্যতীত এই দুঃখ নিবারণের উপায়ান্তর না দেখিয়া মহর্ষি কপিল ত্রিতাপসংহারক মুক্তিপ্রদায়ক পরমানন্দপ্রদ সাংখ্য শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

আবার সংশয় হয় যে, সাংখ্য মতে কিছুরই উৎপত্তি অথবা বিনাশ নাই সুতরাং দুঃখও যখন উৎপত্তিশীল নহে, তখন তাহার বিনাশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

যদিও দুঃখের বিনাশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না বটে তথাপি উহা যখন আবির্ভূত হয়, তখন তাহা তিরোহিত হওয়া অবশ্যই সম্ভব এবং সেই তিরোভাবকে এ স্থলে দুঃখ ধ্বংস বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং সেই জন্যই সাংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ন প্রয়োজনীয়।

এই দুঃখ ধ্বংসের যদি অন্য কোনও সহজ উপায় থাকিত, তাহা

হইলে অবশ্যই এইরূপ একটী দুরধিগম্য শাস্ত্র প্রণয়নের বা তাহা অবলম্বনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, এ জগতে এমন। বুদ্ধিমান্ কে আছে যে, ঘরের কোণে মধু পাইলে দুরারোহ পর্বতশিখরে মধু অন্বেষণের জন্য আরোহণ করে? যদিও আমরা ত্রিবিধ দুঃখ নিবারণের নানারূপ অতি সহজ প্রত্যক্ষ উপায় দেখিতে পাই, যেমন শরীর অসুস্থ হইযাছে, ঔষধ সেবন করিলে উহা দূর হইতে পারে; কাম, ক্রোধাদির বিকার জন্য মনে অশান্তি আসিয়াছে—স্ত্রী, পান, ভোজন, উপলেপনাদি নানাবিধ ভোগের দ্বাবাই মানসিক দুঃখও দূর হইতে পারে। এইরূপ কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কোন্ জন্তুর নিকট কিরূপ ভাব দেখাইতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইবার জন্য নীতি শাস্ত্র অধ্যযন করিয়া তদনুসারে চলিলেই আধিভৌতিক দুঃখেরও বিনাশ হইতে পারে। যেমন—'নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং' ইত্যাদি বচন অবলম্বন করিয়া নদী, নখধারী, শৃঙ্গধারী, অস্ত্রধারী, স্ত্রীলোক এবং রাজবংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে নাই। অথবা এমন স্থানে বাস করিব, যেখানে এইরূপ কোনও ভৌতিক উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই। অতএব আধিভৌতিক দুঃখ দূরেরও ত এই সহজ উপায় দেখিতেছি।

এই উপায়ে অনেক দুঃখ দূর হইলেও দৈবনিবন্ধন গ্রহ কুপিত হইযা যে আধিদৈবিক দুঃখ উপস্থিত করে, তাহা কিরূপে দূর হইবে? উত্তরে বলা যাইতে পারে, কোনও কোনও মণি বা হীরকাদি ধারণের দ্বারা অথবা স্তব, কবচ; চণ্ডী পাঠ, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি, বৃক্ষবিশেষের মূল মাদুলিতে ধারণ প্রভৃতি দ্বারাই ত আধিদৈবিক দুঃখ উপশম হইতে পারে। যেমন চণ্ডী পাঠের ফল আছে যে, 'বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।' ** 'ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিযোজনম্।' বালকগণের গ্রহশান্তি, দারিদ্র্যাভাব, ইষ্টবিযোগাভাব প্রভৃতির উপায়ও এই সকল রহিয়াছে।

এই সকল সহজ উপায় আছে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা সকলেরই এবং সম্পূর্ণরূপে দুঃখ দূর হয় না বলিয়াই প্রত্যেক মানবের সম্পূর্ণরূপে দুঃখ দূরের জন্য সাংখ্য শাস্ত্রের প্রয়োজন।

গিরনার।

(শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মল্লিক।)

গুজরাট দেশে জুনাগড়ের অন্তর্গত গিরনার পর্ব্বত প্রভাসক্ষেত্র হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরে ও দ্বারকা পুরী হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। পুরাকালে এই পর্ব্বতের নাম রৈবতক বা রৈবতাচল ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে দেখিতে যাওয়া যায় যে, মনুতনয় শর্য্যাতির মধ্যম পুত্র আনর্ত্তের রেবত নামে এক পুত্র হয়; ঐ রেবত রাজা আনর্ত্ত দেশে (আধুনিক নাম গুজরাট) কুশস্থলী * নামে এক নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থিতি পূর্ব্বক আনর্ত্তাদি দেশ পালন করিতেন। রেবতের এক শত পুত্র জন্মে, তাহাদের মধ্যে ককুদ্মী জ্যেষ্ঠ। ইনি আনর্ত্ত দেশের অধিপতি হন। রেবতের পুত্র বলিয়া ইঁহার অপর নাম রৈবত। ককুদ্মী এক সময়ে রেবতী নাম্নী স্বীয় তনয়াকে সমভিব্যাহারে লইয়া "কে ইহার বর" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তখন গন্ধর্ব্বগণ তথায় সঙ্গীত করিতেছিল, এই হেতু তিনি ক্ষণকাল তথায় অপেক্ষা করেন; পরে অবকাশ পাইয়া আদিদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। তৎশ্রবণে ব্রহ্মা হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি যে যে ব্যক্তিকে মনঃস্থ করিয়াছ, তাহারা কাল কর্ত্তৃক তিরোহিত হইয়াছে; এখন তাহাদের পুত্র পৌত্র ও নপ্তাদির নাম বা বংশের কথাও শুনিতে পাই না। সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে। তবে যাও, দেবদেবের অংশ মহাবল বলদেব আছেন, সেই নররত্নকে আপনার কন্যারত্ন প্রদান কর।" এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রাজা ব্রহ্মার বন্দনা করিয়া নিজপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতৃগণ যক্ষভয়ে ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করায় উহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। রাজা তখন বলশালী বলদেবকে আপনার সুন্দরী কন্যা দান করিয়া তপস্যার্থ নারায়ণাশ্রমে গমন করেন। অদ্যাপিও গিরনার

---

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দ্বারকা পুরীকেই পূর্ব্বে কুশস্থলী বলিত। অপর মতে উহা দ্বারকার নিকটবর্ত্তী পুরাকালীন অপর কোন সহর ছিল।

পর্ব্বতের নিকট রেবতীকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডারা বলেন, এই স্থানে রৈবত রাজা বলদেবকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। বোধ হয়, আনর্ত্ত দেশের অধিপতি রৈবত রাজার নামানুসারে এই পর্ব্বতের নাম রৈবতক হইয়াছিল।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, এক সময়ে জনৈক তস্কর কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল; ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষার জন্য স্বীয় ধনু গাণ্ডীব আনিতে, দ্রৌপদী সহ একত্র অবস্থিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে প্রবেশ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের পূর্ব্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ হওয়ায়, অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারিবেশে বনবাসার্থ গমন করেন। সেই সময় তিনি ভারতবর্ষের অপরাপর স্থান ভ্রমণান্তর শেষে পশ্চিম ভারতের প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সমাচার পাইয়া দ্বারকা হইতে প্রভাসে অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হন; এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকার নিকটবর্ত্তী রৈবতক পর্ব্বতে বাস করিতে থাকেন। এই উপলক্ষে যদুবংশীয় স্ত্রী পুরুষ অনেকে আসিয়া এই রৈবতক পর্ব্বতে বিহার ও আনন্দ উৎসব করিয়াছিলেন। সেই সময় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করেন। সুভদ্রা যখন শৈলরাজ রৈবতকের অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ও দেবগণের পূজার পর দ্বারকাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময় অর্জ্জুন রথে করিয়া আসিয়া তাঁহাকে হরণ করেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় দ্বারকাপুরীতে সুভদ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

এই সকল দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, রৈবতক পর্ব্বত, দ্বারকার নিকটে আনর্ত্ত দেশে অবস্থিত, এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ, আনর্ত্ত দেশে বা গুজরাটে, প্রভাস হইতে দ্বারকার মধ্যে গিরনার ভিন্ন অপর কোন পর্ব্বত না থাকায় আধুনিক গিরনারকেই যে পুরাকালে রৈবতক বলিত, তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। এই পর্ব্বতে প্রজাপতি অত্রির পুত্র ভগবান অবধূত দত্তাত্রেয় কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার চরণপাদুকা ও কমণ্ডলু বিদ্যমান আছে। ইহা ভিন্ন অপরাপর অনেক মহাত্মার আসন এই গিরনারে ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়;

এখনও অন্বেষণ করিলে এখানে দুই এক জন সিদ্ধ যোগী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে পশ্চিম ভারতে ইহা হিন্দুদিগের বহুদিন হইতে পরিচিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান; বিশেষতঃ যে সকল যাত্রী এতদঞ্চলে দ্বারকা ধাম দেখিতে আসেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই গিরনার এবং প্রভাস দেখিয়া যান। অধিকন্তু ভগবানের অবতার যোগিরাজ দত্তাত্রেয়ের চরণ-পাদুকা এই গিরনারে থাকায় সাধু ও সন্ন্যাসিগণ প্রায় সকলেই ইহা দর্শন করিতে আসেন।

বৌদ্ধবিপ্লবের সময় এই স্থান বৌদ্ধদিগের অধিকৃত হয়; অদ্যাপিও জুনাগড় সহরের বাহিরে তাঁহাদের বিজয়চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। বৌদ্ধেরা, এই স্থান তীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানবাসী লোকের সমাগম হেতু, নিজেদের প্রচারকার্য্যের সুবিধার্থ এই পাহাড়ের উপর মঠ বা মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, জৈন সম্প্রদায়ও উক্ত কারণ হেতু এই পাহাড়ের উপর অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ করেন; সেই জন্য অদ্যাপিও এই স্থান জৈনদিগের তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গিরনার আসিতে হইলে বম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া (Bombay Baroda Central India) রেলের আম্‌দাবাদ ও ওয়াড্‌ওয়ান (Wadhwan) জংশনে গাড়ি বদল করিয়া জুনাগড় পোরবন্দর রেল যোগে জুনাগড় ষ্টেশনে নামিতে হয় অথবা বম্বে হইতে ষ্টীমার যোগে Veraval বা প্রভাসে আসিয়া, পুনরায় তথা হইতে শেষোক্ত রেলে চড়িয়া জুনাগড়ে নামিতে হয়। ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি ও অপরাপর সোয়ারি পাওয়া যায়, এবং যাত্রীদিগের জন্য এই স্থানের পাণ্ডাগণও প্রায়ই ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে। জুনাগড় হইতে তিন মাইল দূরে গিরনার পর্ব্বত অবস্থিত।

দক্ষিণে প্রভাস হইতে আরম্ভ করিয়া জুনাগড়ের উত্তরে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত স্থান ইংরাজরাজের অধীন জুনাগড়ের নবাব সরকারের এলাকা-ভুক্ত। জুনাগড়ে যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেকগুলি ধরমশালা আছে; ইহা ভিন্ন যাত্রীরা সুবিধা বোধ করিলে পাণ্ডাদের বাটীতেও থাকিতে পারেন। পাণ্ডারা সকলেই গুজরাটী ব্রাহ্মণ, বেশ সভ্য ভব্য এবং শিক্ষিত। গুজরাটী ভাষা এক রকম জড়ান হিন্দিমাত্র। গুজরাটীদের শিক্ষা, বাণিজ্যের বিস্তার ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতির জন্য চেষ্টা আছে; ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মহারাষ্ট্রীদের ন্যায় ইহারা কতক ভাত ও কতক রুটী

মিলাইয়া আহার করে। আজকাল জুনাগড় এতদঞ্চলের মধ্যে একটী খুব বর্দ্ধিষ্ণু সহর; এখানে প্রায় সকল দ্রব্যেরই কারবার আছে। সহরে লোকসংখ্যা যথেষ্ট, একারণ বাজার হাট দোকান পসারি, পথ ঘাট সর্ব্বদা লোকপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সহরে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য। (১) নবাব সাহেবের মহল। ইহার ভিতর দরবার ঘর, অভ্যর্থনা ঘর, নবাবের ঘর, নাচ তামাসার ঘর, জেনানা, কাছারি, দেশীয় ডাক বিভাগ, কোতোয়ালী প্রভৃতি আছে। (২) সহরের অন্য অংশে এখানকার ভূতপূর্ব্ব মৃত দেওয়ানের ছতরি; ইহা নবাব সরকার হইতে তাঁহার স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ছতরিটী আধুনিক শিল্পকার্য্যের একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন; ইহা একটী ক্ষুদ্র পুষ্পবাটিকার মধ্যে অবস্থিত। এই বাগানের অপর দিকে দুইটী উচ্চ স্তম্ভ আছে, ইহাদের মধ্যস্থিত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে সহরের অনেক স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) সহরের প্রান্তভাগে অবস্থিত পুরাতন জুনাগড় বা কেল্লা; এখন ইহার মধ্যে দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই, কেবল চতুর্দ্দিকের উচ্চ প্রাচীর বিদ্যমান আছে। (৪) সহরের বাহিরে নবাব সাহেবের উদ্যানবাটী; ইহার মধ্যে নবাবের প্রমোদাগার বা মহল আছে। এই উদ্যানের এক প্রান্তে পশুশালা আছে, এই পশুশালায় অপর জীব জানোয়ার ছাড়া ৩০।৪০টা সিংহ রক্ষিত হইয়াছে; ভারতের আর কোন স্থানের পশুশালায় এত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায় না। জুনাগড়ের অন্তর্গত জঙ্গল সকল সিংহপূর্ণ; এই সকল সিংহ সেই সকল জঙ্গল হইতে শিকারের সময় ধৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন দুই একটি হিন্দু মন্দির ও কএকটি জৈন মন্দির দেখিবার যোগ্য।

উপরোক্ত পুরাতন গড় বা কেল্লা অতিক্রম করিয়া সহরের বাহিরে আসিলে গিরনার যাইবার রাস্তা পাওয়া যায়। সহরের প্রান্ত হইতে গিরনার পাহাড়ের নীচে পর্য্যন্ত সমুদায় রাস্তা পাকা। এই কারণ ইচ্ছা থাকিলে গাড়ি করিয়া যাওয়া যায়। সহর অতিক্রম করিয়া অল্প দূরে এই রাস্তার ডান দিকে বৌদ্ধরাজ অশোকের দিগ্‌বিজয় চিহ্ন একখানি প্রকাণ্ড পাথরে পালি ভাষায় খোদিত আছে। অধুনা এই স্মৃতিচিহ্ন বজায় রাখিবার জন্য সরকার হইতে এই স্থানে একটী দালান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্থান ছাড়িয়া খানিক দূর যাইলে একটী ক্ষুদ্র নদী পাওয়া যায়।

পুলের দ্বারা নদী পার হইয়া নদীর দক্ষিণ তট দিয়া এক পোয়া পথ যাইলে অপর একটী পুল দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে গিরনারের রাস্তা ত্যাগ করিয়া এই পুল দিয়া নদীর পর পারে যাইলে রেবতীকুণ্ড, কৃষ্ণ বলরামের মন্দির ও দুই তিনটি মঠ বা আখড়া বাটী দেখিতে পাওয়া যায়। রেবতীকুণ্ড চতুর্দ্দিকে পাথর দিয়া বাঁধান, কুণ্ডের চারি দিকে দেবদেবীর মূর্ত্তি সকল প্রস্তরে খোদিত আছে। এই কুণ্ডে যাত্রীদিগকে স্নান বা আচমন করিতে হয়; কুণ্ডে নামিবার সিঁড়ি আছে। ইহারই পার্শ্বে ২।৩টী মঠ আছে, এখানে সাধু সন্ন্যাসিগণ থাকেন। নিকটেই কৃষ্ণ বলরামের মন্দির, মন্দিরটী অনেক দিনের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের ভিতর কৃষ্ণ বলরাম ও অপরাপর দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। এই স্থানে বলদেবের সহিত রেবতীর বিবাহ হয়। যাদবেরা দ্বারকা হইতে গিরনার বা রৈবতক দর্শনে আসিলে এই স্থানে অবস্থান করিতেন। এক্ষণে নদীর উভয় তটেই জলে নামিবার বাঁধা ঘাট ও ঘাটের মধ্যে মধ্যে কএকটী শিবলিঙ্গ আছে। যাত্রিগণকে এখানে নদীতে স্নান দান প্রভৃতি করিতে হয়। সময় সময় এখানে মেলা হইয়া থাকে, সে সময় বহুযাত্রীর সমাগম হয়। এই নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে অতি সামান্য জল থাকে।

এই গুলি দেখিয়া পুনরায় উক্ত পুল পার হইয়া গিরনারের রাস্তায় ফিরিয়া আসিতে হয়। এখান হইতে গিরনার প্রায় দুই মাইল। এই স্থান ত্যাগ করিয়া বরাবর এই রাস্তা দিয়া গিরনারের দিকে আসিলে পাহাড়ের নিকট এই রাস্তার বাঁ দিকে একটী প্রকাণ্ড চতুর্দ্দিকে গাঁথা ট্যাঙ্ক বা কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এই ট্যাঙ্কটী এমন স্থানে নির্ম্মিত যে, পাহাড়ের এই অঞ্চলের সমুদায় বর্ষার জল এই ট্যাঙ্কে আসিয়া জমা হয়; সে জন্য কৃষিকার্য্যে জলকষ্ট হয় না। গত দুর্ভিক্ষের পর হইতে গুজরাটের স্থানে স্থানে এইরূপ ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহাতে অনাবৃষ্টির সময় অনেক উপকার হয়। এই ট্যাঙ্ক ছাড়িয়া অল্প দূর আসিলেই গিরনার পাহাড়ের নিচেকার ফটকে পৌছান যায়; উক্ত রাস্তাও এখানে শেষ হইয়াছে। ফটকের বাহিরে রাস্তার ধারে ২।৩ খানি দোকান ও ধরমশালা আছে। এই ফটকে নবাব সরকারের পাহারা আছে, এখানে ⁄০ এক আনা হিসাবে যাত্রীদের নিকট কর

লওয়া হয়; এই আয় হইতে গিরনার উঠিবার সিঁড়ি মেরামত হইয়া থাকে। এই ফটক হইতে আরম্ভ করিয়া গিরনার পাহাড়ের উপরিস্থিত সর্ব্বশেষ স্থান—ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের চরণপাদুকা পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০০ সিঁড়ি আছে। এই সকল সিঁড়ি মেরামতের বন্দোবস্ত থাকায় প্রায় কোথাও ভাঙ্গা-চোরা দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং এরূপ আগাগোড়া সিঁড়ি ভারতের আর কোন পার্ব্বতীয় তীর্থে নাই। গিরনার আমাদের বাঙ্গালার চন্দ্রনাথ পাহাড় অপেক্ষা উচ্চ। পাহাড়টী গাছপালার দ্বারা একেবারে আচ্ছন্ন; এ কারণ অনেক গরিব লোক এই পাহাড় হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক জুনাগড় সহরে বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

নিচেকার এই ফটক হইতে সিঁড়ি উঠিতে আরম্ভ করিয়া পাহাড়ের প্রায় দশ আনা রকম চড়াই করিলে আর একটী ফটক পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় ফটকের ভিতর প্রবেশ করিলে খানিকটা সমতল স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, এই থানে জৈনদিগের ১০।১২টী মন্দির আছে। মন্দিরগুলি খুব বড়, কারুকার্য্যখচিত ও নানা রকম আসবাব আদি দ্বারা সজ্জিত; অভ্যন্তরে জৈন দেবতার ধ্যানস্থ মূর্ত্তি বিরাজিত। সকল মন্দিরেই পূজা ও ভোগরাগের বন্দোবস্ত আছে; এই হেতু অনেক গুলি জৈন এখানে বাস করেন।

এই স্থান ছাড়িয়া পুনরায় সিঁড়ি দিয়া অল্প দূর উঠিলেই গোমুখী নামক স্থান পাওয়া যায়। এখানে প্রস্তরনির্ম্মিত গোমুখ দিয়া ঝরণার জল একটী কুণ্ডে পতিত হইতেছে। কুণ্ডের দুই দিকের দালানে ও আশে পাশে অনেক গুলি শিবলিঙ্গ আছে। এখানে ২।৪ জন সাধু থাকেন। এই কুণ্ডে স্নান বা আচমন ও শিবলিঙ্গের পূজা বা দর্শন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে, পাহাড়ের শিখরে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। পাহাড়ের উপর এই স্থানে একটী হিন্দু মন্দির আছে; মন্দির মধ্যে কালী বা দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। সেবা পূজার জন্য ব্রাহ্মণ ও লোক জন এবং ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জায়গিরের বন্দোবস্ত আছে। এই স্থান দেখিয়া পাহাড়ের উপরে উপরে কিয়দ্দূর গমন করিলে এই শিখরটীর শেষ ভাগে আসিয়া পৌঁছান যায়। ইহার পর ফের ওৎরাই; এই স্থানে পূর্ব্বকালে কোন ঋষি বা মহাত্মার আস্থানা ছিল, এখনও তাঁহার আসন ও অপরাপর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পার্শ্বে

২।৩ হাত লম্বা একটী সুড়ঙ্গ আছে, উহাকে গর্ভযোনি বলে; তথায় এক জন সাধু থাকেন, তিনি যাত্রীদের নিকট দুই এক আনা ভেট না পাইলে গর্ভযোনি প্রবেশ করিতে দেন না। এই স্থান হইতে সম্মুখে আর দুইটী পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথমটীতে উঠিবার কোন রূপ রাস্তা নাই; দ্বিতীয়টীতে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের চরণপাদুকা থাকায় উঠিবার সিঁড়ি আছে।

এই স্থান হইতে প্রায় ৩০০ সিঁড়ি ওৎরাই করিবার পর, সিঁড়ি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটী দিয়া দত্তাত্রেয়ের চরণপাদুকার স্থানে উঠিতে হয়, অপরটী দিয়া ২।৩ শত সিঁড়ি নামিয়া গেলে কমণ্ডলু কুণ্ড পাওয়া যায়। কেবল মাত্র এই সিঁড়ি কয়টাই মেরামতের অভাবে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এখানে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের কমণ্ডলু থাকিত বলিয়া ইহার নাম কমণ্ডলু কুণ্ড হইয়াছে। কুণ্ডটী ৩।৪ হাত প্রশস্ত কমণ্ডলু আকারের একটী প্রস্রবণ মাত্র; ভিতর হইতে ক্রমাগত জলধারা নির্গত হইতেছে। এই কুণ্ডের নিকট সাধুদিগের থাকিবার একটী স্থান আছে; এখানে ৪।৫ জন সাধু থাকেন, ইহাঁরাই দত্তাত্রেয়ের আস্থানা, কমণ্ডলু কুণ্ড প্রভৃতি স্থানের যাত্রীদের প্রদত্ত ভেট প্রণামী গ্রহণ করেন। এই স্থান দিয়াও গিরনার হইতে নামিয়া যাওয়া যায়; কিন্তু সিঁড়ি বা রাস্তা নাই; বিশেষতঃ জঙ্গল দিয়া যাওয়া উচিত নয় বলিয়া যাত্রীরা পূর্ব্বোক্ত পথে অর্থাৎ যে সিঁড়ির রাস্তা দিয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিল, সেই পথেই পুনরায় পাহাড় হইতে নামিয়া থাকে। কমণ্ডলু কুণ্ড দেখিয়া পুনরায় ঐ ভগ্ন সিঁড়ি দিয়া, প্রধান সিঁড়ি যেখান হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তথায় ফিরিয়া আসিতে হয়। এখান হইতে সিঁড়ির অপর ভাগ দ্বারা ২৫০।৩০০ ধাপ্ চড়াই করিলে পর্ব্বতশৃঙ্গে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের আসনে পৌছান যায়। এই শৃঙ্গটী নিতান্ত খাড়া ভাবে অবস্থিত বলিয়া সিঁড়ির উপরিভাগের কএকটা ধাপ অতি সঙ্কীর্ণ ও উচ্চ; এ কারণ যাত্রীদের খুব সাবধানে উঠা আবশ্যক। শৃঙ্গের উপর মোটে ৮।১০ হাত মাত্র স্থান; তাহারই মধ্যস্থলে একখানি পাথরে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের চরণচিহ্ন খোদা বা অঙ্কিত আছে, উহাকেই চরণ পাদুকা বলে। উহার উপর ছোট একটী পাথরে নির্ম্মিত ছত্তরি আছে। এখানে একজন সাধু থাকেন, তিনি যাত্রীদের নিকট হইতে দুই চার আনা

ভেট না পাইলে, তাহাদিগকে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের চরণ স্পর্শ বা পূজা করিতে দেন না। এই চরণপাদুকার পার্শ্বেই একটী খুব বড় পিতলের ঘণ্টা টাঙ্গান আছে, ইহাকে দত্তাত্রেয়ের ঘণ্টা বলে। ভগবানের অবতার যোগিবর দত্তাত্রেয় এই স্থানে কোন সময় অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া আধুনিক সময়ে হিন্দুদিগের নিকট এই পর্ব্বতের এত মাহাত্ম্য। এই কারণে হিন্দুরা এখনও নানা স্থান হইতে এখানে আসিয়া ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের চরণ-পাদুকা স্পর্শ, পূজা ও পরিক্রম করেন এবং উক্ত ঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

একবিংশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

স্বীয় মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণের আচরণে গোবিন্দ কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুব্ধ হয়েন নাই। বরং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীরামানুজের হস্তে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করাই উক্ত মহাত্মার ঈদৃশ আচরণের উদ্দেশ্য। তিনি তদবধি কায়মনোবাক্যে যতিরাজের সেবায় নিরত হইলেন। দুই এক দিবসের মধ্যেই তিনি নূতন প্রভুর যাবতীয় প্রয়োজন বুঝিয়া লইলেন। এই ভাবজ্ঞতা নিবন্ধন তিনি বলিবার পূর্ব্বেই সকল কর্ম্ম এরূপ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিয়া রাখিতেন যে, তাহা দেখিয়া যতিরাজের অন্যান্য শিষ্যগণ চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। একদা তাঁহারা সকলে সেবাপটুতার জন্য তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ তচ্ছ্রবণে কহিলেন, "হাঁ, আমার গুণসমূহ এরূপ স্তবের যোগ্যই।" ইহাতে প্রশংসাকারিগণ তাঁহাকে অহঙ্কৃত মনে করিয়া তদ্বিষয় শ্রীরামানুজকে জ্ঞাপন করায়, তিনি গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার সদ্গুণদর্শনে ইঁহারা প্রশংসা করিতেছেন, তাহাতে কি তোমার অহঙ্কার প্রকাশ করা উচিত?" গোবিন্দ কহিলেন, "মহাত্মন্, চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া এই মোহান্ধ জীব মানবজন্ম লাভ করিয়াছে এবং তাহাতেও বহুজন্মের পর এই বর্ত্তমান জন্ম আশ্রয় করতঃ মোহান্ধতাবশতঃ বিপথ আশ্রয় করিয়া পতনোন্মুখ হইয়াছিল। আপনার

করুণাতিরেকই আমার উদ্ধারের কারণ। আমার ভিতর যাহা কিছু সদ্ভাব আছে, তাহা আপনারই, কারণ, আমি স্বভাবতঃই জড়মতি ও হীনপ্রবৃত্তি। অতএব মদীয় সদ্গুণের প্রশংসা দ্বারা আপনারই প্রশংসা হইল ; এই হেতুই আমি ওরূপ বলিয়াছি।" ইহা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন।

আর একদিবস গোবিন্দ প্রাতঃকৃত্য সমাপন না করিয়া উষাকাল হইতে মুগ্ধের ন্যায় কোন বারাঙ্গনার বহির্দ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সতীর্থগণ যতিরাজকে তদীয় এই বিসদৃশ আচরণ নিবেদন করিলেন। তিনি গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাতঃকর্ত্তব্য সমাপন না করিয়া বেশ্যাদ্বারে কেন উপবিষ্ট ছিলে ?" তিনি ইহাতে উত্তর করিলেন, "উক্ত অঙ্গনা অতি মধুরস্বরে রামায়ণ কথা গান করিতেছিল, পারায়ণ মানসে আমি তাহা শেষ পর্য্যন্ত শুনিতেছিলাম। এই জন্য এখনও প্রাতঃকৃত্য করা হয় নাই"। ইহা শুনিয়া সকলে তাঁহার সরলভাব ও স্বাভাবিকী ভক্তিতে মুগ্ধ হইলেন।

শ্রীশৈলপূর্ণভগিনী গোবিন্দজননী ইতিমধ্যে একদা শ্রীরামানুজ সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, "বৎস, গোবিন্দ-পত্নী ঋতুমতী হইয়াছে, অতএব তাহাকে সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মরক্ষা করিতে আদেশ কর। কারণ, আমার কথায় সে যাইবে না। তাহাকে আমি ইতিপূর্ব্বে এতদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলে সে কহিয়াছিল, 'যতিরাজের সেবার পর যখন আমি একান্তে বসিবার অবসর পাইব, তখন আমার ভার্য্যাকে লইয়া আসিও।' কিন্তু বৎস, আমি অদ্যাবধি তাহার অবসরকাল অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। সে কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত আছে।" শ্রীরামানুজ এতচ্ছ্রবণে গোবিন্দকে সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি অদ্য তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিও।" গোবিন্দ গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। সে রজনী তিনি পত্নীপার্শ্বে গিয়া শয়ন করিলেন ও নানাবিধ সৎকথালাপদ্বারা তাহা অতিবাহিত করিলেন। বধূমুখে রাত্রির বার্ত্তা শুনিয়া গোবিন্দজননী দ্যুতিমতী তৎসমুদয় রামানুজ সন্নিধানে গিয়া নিবেদন করিলেন। ইহাতে যতিরাজ গোবিন্দকে নিভৃতে আনয়নপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি তোমার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে কহিয়াছিলাম। তুমি কিন্তু তদ্রূপ আচরণ কর নাই, ইহার কারণ কি ?" গোবিন্দ কহিলেন, "মহাত্মন্, তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত শয়ন করিতে আপনি আদেশ করিয়াছেন।

আমি তদনুসারেই কার্য্য করিয়াছি। কারণ, তমঃ পরিত্যাগ করিলেই হৃদ্দেশ-বর্ত্তী অন্তর্যামী পুরুষের প্রকাশ হয়। সেই প্রকাশের সম্মুখে তমঃপ্রসূত কামাদির অবস্থান সম্ভাবনা কোথায়?"

শ্রীরামানুজ এতচ্ছ্রবণে নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, ও কিয়ৎকাল তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া কহিলেন, "গোবিন্দ, তোমার মনের অবস্থা যদি এইরূপ, তাহা হইলে তোমার অচিরাৎ সন্ন্যাস লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ, আশ্রমে থাকিলে আশ্রমীর ন্যায় আচরণ করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রের নিয়ম। অতএব তুমি যদি ইন্দ্রিয়সমূহের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণই বিধেয়।" গোবিন্দ ইহাতে পরমসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "আমি এখনই প্রস্তুত।" যতিরাজ কালবিলম্ব না করিয়া, গোবিন্দজননী দ্যুতিমতীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, তাঁহাকে "তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।" এই পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিলেন ও পরে দণ্ড কমণ্ডলু দান পূর্ব্বক পরমহংস-পদে উন্নীত করিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর দিব্যকান্তি, বিজ্ঞানোদ্ভাসিত বদন, প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত পদ্মপলাশসদৃশ নয়ন, শুদ্ধজ্ঞানভক্তিময় বিগ্রহ অবলোকন করিয়া যতিরাজ তাঁহাকে "মন্নাথ" এই আখ্যা প্রদান করিলেন। শ্রীরামানুজই এই নামে তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইতেন। তিনি নিরতিশয় প্রীতিবশতঃ স্বীয় নাম গোবিন্দকে অর্পণ করিলেন, কিন্তু অভিমানলেশ-পরিশূন্য, সত্ত্বমূর্ত্তি, প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় কান্তিমান্, শিশিরবিন্দুর ন্যায় নির্ম্মল, প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় মনোহর, ঈশ্বরানুরাগরঞ্জিতহৃদয়, সনকাদির ন্যায় বালকস্বভাব, প্রেমিক সন্ন্যাসী গোবিন্দ শুদ্ধদাস্যভক্তির আদর্শস্বরূপ ছিলেন, তিনি কিরূপে দাস্য পরিত্যাগ করিয়া সোঽহংভাব আশ্রয় করিবেন? তিনি কোন মতেই নিজপ্রভুর নামে অভিহিত হইতে অঙ্গীকার না করায় শ্রীরামানুজ "মন্নাথ" এই পদটিকে তামিলে ভাষান্তরিত করিয়া "এম পেরুমানার" এই পদ নিষ্পন্ন করিলেন এবং তাহার পূর্ব্বাংশ ও শেষাংশ একত্র করিয়া "এম্—আর্" বা "এমার" পদ সিদ্ধ করিলেন এবং তাহাই গোবিন্দের নাম হইল। শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে যে "এমার মঠ" নামক এক সুপ্রসিদ্ধ মঠ আছে, তাহা শ্রীরামানুজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং তিনিই গোবিন্দের নামানুসারে উহার নামকরণ করিয়াছেন।

এই সময়ে শ্রীরামানুজের শ্রীরঙ্গমস্থ মঠে সর্ব্বশুদ্ধ চতুঃসপ্ততিসংখ্যক শিষ্য

অবস্থান করিতেছিলেন, ইঁহারা সকলে কৃতবিদ্য, পরম ত্যাগী, ও পরম ভক্তিমান্। সমগ্র বেদ ও দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা ইহাঁদের কণ্ঠস্থ। ইহাঁরা সিংহাসনাধিপতি বা পীঠাধিপতি নামে অভিহিত। ইহাঁদিগেরই অনুকরণে, বোধ হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যগণকে "গোস্বামী" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আমরা, ইতিপূর্ব্বে, দাশরথি, কুরেশ, সুন্দরবাহু, শোট্টিনম্বি, সৌম্যনারায়ণ, যজ্ঞমূর্ত্তি, গোবিন্দ প্রভৃতি ইহাঁদের প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীরামানুজ ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা, শাস্ত্রালাপ প্রভৃতি দ্বারা পরম আনন্দে স্বীয় মঠে কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।*

শ্রীম—কথিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাড়ীতে আছেন। বিজয়া দশমী; ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। বেলা ৪টা হইয়াছে। ডাক্তার সরকার দেখিতে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ উপস্থিত আছেন। ডাক্তার ঠাকুরের সম্মুখে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ডাক্তার বল্‌ছেন, 'ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন; আর আমাদের সকলের আত্মা (Soul) অনন্ত উন্নতি করিবে'। একজন আর একজনের চেয়ে বড়, একথা তিনি মানিতে চাহিতেছেন না। তাই অবতার মান্‌ছেন না।

ডাক্তার। Infinite progress! তা যদি না হোলো, তা হলে পাঁচ বছর সাত বছর আর বেঁচেই বা কি হবে! গলায় দড়ি দোবো!

"অবতার আবার কি! যে মানুষ হাগে মোতে, তার পদানত হ'ব! হাঁ, তবে Reflection of God's Light (ঈশ্বরের জ্যোতি মানুষে প্রকাশ) তা মানি।

---

* দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত। For opinions, see advertisement sheets.

গিরিশ (সহাস্যে)। আপনি God's light দেখেন নি—

ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন।

কাছে একজন বন্ধু বসিয়াছিলেন, তিনি ডাক্তারকে আস্তে আস্তে কি বলিলেন।

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি)। আপনিও ত প্রতিবিম্ব বই কিছু দেখেন নাই।

গিরিশ। I see it. I see the light. কৃষ্ণ অবতার prove কোর্‌বো—তা না হলে জিব কেটে ফেল্‌বো।

(বিকার ও বিচার)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সব যা কথা হচ্ছে, এ কিছুই নয়।

"এ সব বিকারের রোগীর খেয়াল। বিকারের রোগী বলেছিল, এক জালা জল খাব, এক হাঁড়ি ভাত খাব। বদ্দি বল্লে, আচ্ছা আচ্ছা, খাবি। পথ্য পেয়ে যা বল্‌বি, তখন করা যাবে।

"যতক্ষণ কাঁচা ঘি, ততক্ষণই কলকলানি শোনা যায়। পাকা হলে আর শব্দ থাকে না।

"যার যেমন মন, ঈশ্বরকে সেইরূপ দেখে। আমি দেখেছি, বড়মানুষের বাড়ীর ছবি—Queenএর ছবি—আছে। আবার ভক্তের বাড়ী—ঠাকুরদের ছবি।

[পূর্ণ জ্ঞান।]

"লক্ষ্মণ বলেছিলেন, রাম, যিনি স্বয়ং বশিষ্ঠদেব, তাঁর আবার পুত্রশোক! রাম বল্লেন, ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে। তাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জান্‌লে সেই অবস্থা হয়। এরি নাম বিজ্ঞান।

"পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে আর একটী কাঁটা জোগাড় করে আন্‌তে হয়। এনে সেই কাঁটাটী তুল্‌তে হয়। তোলা হবার পর দুটী কাঁটাই ফেলে দেয়। জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলে জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

"পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ আছে। বিচার বন্ধ হয়ে যায়। যা বল্লুম, কাঁচা থাক্‌লেই ঘিয়ের কল্‌কলানি!

ডাক্তার। পূর্ণ জ্ঞান থাকে কই? সব ঈশ্বর! তবে তুমি পরমহংসগিরি

কচ্চ কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা কচ্চে কেন? চুপ করে থাক না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। জল স্থির থাক্‌লেও জল, তরঙ্গ হলেও জল।

[Voice of God]

"আর একটী কথা আছে। মাহুত নারায়ণের কথাই বা না শুনি কেন? গুরু শিষ্যকে বলে দিচ্ছ্‌লেন, সব নারায়ণ। পাগ্‌লা হাতী আস্‌ছিল, শিষ্য গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে সেখান থেকে সরে নাই। হাতীও নারায়ণ। মাহুত কিন্তু চেঁচিয়ে বল্‌ছিল, সব সরে যাও, সব সরে যাও। শিষ্যটী সরে নাই। হাতী তাকে আছাড় দিয়ে চলে গেল। প্রাণ যায় নাই। মুখে জল দিতে দিতে জ্ঞান হয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করা হল, কেন তুমি সরে যাও নাই, তখন সে বল্লে, কেন, গুরুদেব যে বলেছেন—সব নারায়ণ। গুরু বল্লেন, বাবা, মাহুত নারায়ণের কথা তবে শোন নি কেন? তিনিই শুদ্ধ মন শুদ্ধ বুদ্ধি হয়ে ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী।

ডাক্তার। আর একটা বলি,—তবে কেন বল, ওগো, এটা সারিয়ে দাও?

[The 'Differentiated Ego']

শ্রীরামকৃষ্ণ। যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। মনে কর, মহাসমুদ্র—অধঃ ঊর্দ্ধ পরিপূর্ণ। তার ভিতর একটী ঘট রয়েছে। ঘটের অন্তরে বাহিরে জল। কিন্তু না ভাঙ্গ্‌লে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই আমি ঘট রেখে দিয়েছেন।

ডাক্তার। তবে এই আমি টামি যা বল্‌ছ, এগুলো কি? এর ত মানে বল্‌তে হবে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেল্‌ছেন?

গিরীশ। মহাশয়, কেমন করে জান্‌লেন, চালাকি নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। এই আমি তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা—তাঁর লীলা।

"এক রাজার চার বেটা। তারা রাজার ছেলে—কিন্তু খেলা কচ্ছে—কেউ মন্ত্রী হয়েছে, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হয়ে কোটাল কোটাল খেল্‌ছে।

(ডাক্তারের প্রতি)। শোন। তোমার যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে এই সব মান্‌তে হবে। তাঁর দর্শন হলে সব সংশয় যায়।

(Sonship and the Father.)

ডাক্তার। সব সন্দেহ যায় কই!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কাছে এই পর্য্যন্ত শুনে যাও। তার পর বেশী কিছু জান্‌তে চাও, তাঁর কাছে একলা একলা বল্‌বে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন তিনি এমন করেছেন।

"ছেলে ভিখারীকে এক কুন্‌কে চাল দিতে পারে। রেলভাড়া যদি দিতে হয় ত কর্ত্তাকে জানাতে হয়।

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।

(জ্ঞানযোগ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তুমি বিচার ভালবাস। কিছু বিচার করি শোন।

"জ্ঞানীর মতে অবতার নাই। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, তুমি আমাকে অবতার অবতার বল্‌ছ, তোমাকে একটা জিনিষ দেখাই, দেখ্‌বে এস। অর্জ্জুন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। খানিক দূরে গিয়ে অর্জ্জুনকে বল্‌লেন, কি দেখ্‌তে পাচ্ছ? অর্জ্জুন বল্লেন, একটি বৃহৎ গাছ, কালজাম থোলো থোলো হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন, ও কালজাম নয়। আর একটু এগিয়ে দেখ। তখন অর্জ্জুন দেখ্‌লেন, কৃষ্ণ থোলো থোলো ফলে আছে। কৃষ্ণ বল্লেন, এখন দেখ্‌লে? আমার মতন কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে।

"কবীর দাস শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলেছিলো, তুমি গোপীদের হাততালিতে বানরনাচ নেচেছিলে।

"যত এগিয়ে যাবে, ততই ভগবানের উপাধি কম দেখ্‌তে পাবে। ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভুজা। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌লে ষড়্‌ভুজা। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌ছে দ্বিভুজ গোপাল। যত এগুচ্ছে, ততই ঐশ্বর্য্য কমে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিদর্শন কল্লে কোন উপাধি নাই।

"একটু বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সাম্‌নে একজন ভেল্‌কি দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখ্‌লে, এক জন সওয়ার আস্‌ছে। ঘোঁড়ার উপর চড়ে খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্র শস্ত্র। সভাশুদ্ধ লোক আর রাজা বিচার কচ্চে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোঁড়া ত সত্য নয়, সাজ গোজও সত্য নয়, অস্ত্রশস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখ্‌লে যে, সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি না, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যে—বিচার কর্ত্তে গেলে কিছুই টেঁকে না।

ডাক্তার। হাঁ, এতে আমার আপত্তি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে এ ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেঙ্গে গেল, তবু বুক দুড় দুড় কচ্চে।

"চোরে ক্ষেতে চুরী কত্তে এসেছে। খড়ের ছবি মানুষের আকার করে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোন মতে ঢুক্‌তে পার্‌ছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখ্‌লে,—খড়ের ছবি। এসে ওদের বল্লে,—ভয় নাই। তবু ওরা আস্‌তে চায় না—বলে, বুক দুড় দুড় করছে। তখন ভুঁয়ে ছবিটাকে শুইয়ে দিলে আর বল্‌তে লাগ্‌লো, এ কিছু নয়, এ কিছু নয়, নেতি নেতি।

ডাক্তার। এ সব বেশ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ। কেমন কথা?

ডাক্তার। বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটা Thank you দাও।

ডাক্তার। তুমি কি বুঝ্‌চো না—মনের ভাব? আর কত কষ্ট করে তোমায় এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। না গো। মূর্খের জন্য কিছু বল। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চায় নাই—বলেছিলো, রাম, তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হয়ে কি হবে? রাম বল্লেন, বিভীষণ, তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। তারা বল্‌ছে, তুমি এত রামের সেবা কল্লে, তোমার কি ঐশ্বর্য্য হলো? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

ডাক্তার। এখানে তেমন মূর্খ কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। না গো, শাঁকও আছে আবার গেঁড়িগুগ্‌লিও আছে (সকলের হাস্য)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার ঠাকুরের জন্য ঔষধ দিলেন—দুটী globule—বলিতেছেন, এই দুটী গুলি দিলাম—পুরুষ আর প্রকৃতি (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ, ওরা এক সঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, তফাত থাকৃতে পারে না। যেখানে পুরুষ, সেখানেই প্রকৃতি; যেখানে প্রকৃতি, সেখানেই পুরুষ।

আজ বিজয়া। ঠাকুর—ডাক্তারকে মিষ্টমুখ করিতে বলিলেন। ভক্তেরা মিষ্টান্ন আনিয়া দিতেছেন।

ডাক্তার (খাইতে খাইতে)। খাবার জন্য Thank you দিচ্ছি। তুমি যে অমন উপদেশ দিলে, তার জন্য নয়। সে Thank you মুখে বোল্‌বো কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তাঁতে মন রাখা। আর কি বোল্‌বো? আর একটু একটু ধ্যান করা। (ছোট নরেনকে দেখাইয়া)। দেখ দেখ, এর মন ঈশ্বরে একেবারে লীন হয়ে যায়! যে সব কথা তোমায় বল্‌ছিলাম—

ডাক্তার। এদের সব বল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যার যা পেটে সয়। ও সব কথা কি সব্বাই নিতে পারে? তোমাকে বল্লুম, সে এক। মা বাড়ীতে মাছ আনিয়েছে। সকলের পেট সমান নয়। কারুকে পোলোয়া করে দিলেন, কারুকে আবার মাছের ঝোল। পেট ভাল নয় (সকলের হাস্য)।

* * * *

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আজ বিজয়া। ভক্তেরা সকলে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পরস্পর কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুরের অত অসুখ, সব ভুলাইয়া দিয়াছেন! প্রেমালিঙ্গন ও মিষ্টমুখ অনেকক্ষণ ধরিয়া হইতে লাগিল।

* * * *

ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন, মাষ্টার ও আরও দুচারটী ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুর আনন্দে কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডাক্তারকে আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। গাছটা

কাটা শেষ হয়ে এলে যে ব্যক্তি কাটে, সে একটু সরে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ পরে আপনিই পড়ে যায়।

ছোট নরেন (সহাস্যে)। সবই principle !

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ডাক্তার অনেক বদ্‌লে গেছে, না ?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ। এখানে এলে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কি ঔষধ দিতে হবে, আদপেই সে কথা তোলে না। আমরা মনে করে দিলে তবে বলেন, হাঁ হাঁ, ঔষধ দিতে হবে।

* * * *

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা কেহ কেহ গান গাহিতেছিলেন।

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন,—"তোমরা গান গাচ্ছিলে,—তাল হয় না কেন ? কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল—এ তাই" (সকলের হাস্য)।

* * * *

ছোট নরেনের একটী আত্মীয় ছোকরা আসিয়াছেন। খুব সাজগোজ আর চোকে চস্‌মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনের প্রতি)। দেখ্, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোক্‌রা যাচ্ছিল। প্লেটওলা জামা পরা। চল্‌বার যে ঢঙ ! এক একবার প্লেটটা সাম্‌নে রেখে সেইখানটা চাদর খুলে দেয় আবার এদিক্ ওদিক্ চায়,—কেউ দেখ্‌ছে কি না। চল্‌বার সময় কাঁকালভাঙ্গা (সকলের হাস্য)। একবার দেখিস্ না।

"ময়ূর পাখা দেখায়। কিন্তু পাগুলো বড় নোঙ্‌রা (সকলের হাস্য)।

"উট বড় কুৎসিৎ, তার সব কুৎসিৎ।

ছোট নরেনের আত্মীয়। কিন্তু আচরণ ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাল বটে। তবে কাঁটা ঘাস খায়—মুখ দে রক্ত পড়ে, তবুও খাবে। সংসারী লোকে এই ছেলে মরে যাচ্ছে, আবার ছেলে ছেলে করে।

———

সংবাদ ও মন্তব্য।

বাঙ্গালোরে স্বামীজির জন্মোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালোর সহরের তিনটী বিভিন্ন স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬০০০ দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্ন ভোজন করান হয়। বাঙ্গালোর মঠে বেলা আটটা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা একটা পর্য্যন্ত প্রায় ৫০।৬০ দল সঙ্কীর্ত্তনসম্প্রদায় আসিয়া কীর্ত্তন করেন। বেলা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সুবৃহৎ হলে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় প্রথমে যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত, পরে তামিল, কানারিজ ও ইংরাজী ভাষায় স্বামীজি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কলেক্টর মিঃ সুব্বারাও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে স্বামী আত্মানন্দ এই উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দেন। সভাভঙ্গ হইলে প্রসাদ বিতরিত হয়।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২৯শে জানুয়ারি রবিবার দিবস ঢাকা জগন্নাথ কলেজ গৃহে এক সভার অধিবেশন হয়। ঢাকার তৃতীয় মুন্সেফ বাবু বরদাপ্রসাদ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে স্বামীজির সম্বন্ধে গান হইলে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক বিজ্ঞানবিৎ বি, এন, দাস মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজীতে অতি সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরে জজ্ কোর্টের উকিল বাবু কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ভাওয়াল প্রভৃতি স্বামীজির বিষয়ে কিছু কিছু বলেন। সভাপতির বক্তৃতার পর স্বামীজি সম্বন্ধে গান হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি শালকিয়া এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণপুরে শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবোপলক্ষে কীর্ত্তন,কাঙ্গালীভোজন,প্রসাদবিতরণাদি হইয়াছিল।

স্বামী সচ্চিদানন্দ কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলিসে বিগত ৩১শে ডিসেম্বরে উপস্থিত হইয়া তথাকার বেদান্তপ্রচারকার্য্যকে স্থায়ী ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এ স্থানেই ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে উপস্থিত হইয়া বেদান্ত সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এতদূর আকৃষ্ট হন যে, তাঁহারা এখানে এক বেদান্তসমিতি স্থাপন করেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীত এই সমিতিতে মধ্যে মধ্যে যাইয়া অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন। এক্ষণে স্বামী সচ্চিদানন্দ তথায় নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে বক্তৃতাদি করিবেন। প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে সর্ব্বসাধারণের জন্য কোন সাধারণ হলে এবং অবশিষ্ট রবিবার তিনটী সমিতিগৃহে বক্তৃতা হইবে। প্রতিসপ্তাহ সোমবার সমিতিগৃহে সভ্যদিগের নিকট ভগবদ্গীতা এবং প্রতি বুধবার স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত জ্ঞানযোগাদি চারিখানি যোগগ্রন্থ অধীত ও ব্যাখ্যাত হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৃহস্পতিবার সভ্যদিগকে ধ্যানশিক্ষা দেওয়া হইবে।

গত ২৯শে মাঘ শনিবার বারাণসী রাধারাণী পুস্তকালয়ের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ "কর্ম্মযোগ", শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "পুস্তকালয়ের উপকারিতা", এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ লাহিড়ী "হরিনামমাহাত্ম্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সভাস্থলে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সমাগত হইয়া সভ্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

আগামী ২৮শে ফাল্গুন বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে। তদুপলক্ষে তৎপরের রবিবার অর্থাৎ ৬ই চৈত্র উক্ত মঠে এক সাধারণ সভা আহূত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হইবে।

কনখল রামকৃষ্ণসেবাশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে, বিগত ১৫ই মাঘের উদ্বোধনে উক্ত আশ্রমের আয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। পূর্ব্বের উদ্বৃত্ত ৩৮০॥/১৫ স্থানে ৩৬৮ টাকা ১০ পাই হইবে। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ হস্তে স্থিত—৩৭১॥৶৪ পাই।

উদ্বোধনের ৬ষ্ঠ নিয়মানুসারে আগামী ১লা চৈত্রের উদ্বোধন বন্ধ রহিল। ১৫ই চৈত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এক দিবস শিষ্যবর্গের নিকট শ্রীযামুনাচার্য্যের গুণবর্ণনা করিতে করিতে যতিরাজ নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলেন। যখন কাবেরীতীরস্থ চিতাপার্শ্বে উক্ত মহাত্মার দেহ শায়িত ছিল, সেই সময় রামানুজ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দক্ষিণহস্তের তিনটী অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ। তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তৎসম্মুখে তিনটি প্রতিজ্ঞা করিলে উক্ত অঙ্গুলিত্রয় মুষ্টিবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার উক্ত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া শিষ্যবর্গকে কহিলেন, "আমি শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিব বলিয়া যামুনমুনির নিকট প্রতিশ্রুত আছি, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কিছুই করা হয় নাই। উক্ত গ্রন্থ লিখিতে হইলে বোধায়ন বৃত্তির সাহায্য লইতে হইবে। মহর্ষি বোধায়ন প্রণীত বৃত্তি এ দেশে পাওয়া দুষ্কর। আমি বহু অন্বেষণ করিয়াও কৃতকার্য্য হই নাই। শুনিয়াছি, উহা কাশ্মীরদেশান্তর্গত সারদাপীঠে বহুযত্নে রক্ষিত আছে। কুরেশের সহিত আমি অদ্যই তথায় যাত্রা করিব। হে ভগবদ্ভক্তগণ, তোমরা শ্রীবিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা কর, যেন আমরা কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি।"

এইরূপে শিষ্যগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীরামানুজ কুরেশের সহিত যাত্রা করিয়া মাসত্রয়ের পর সারদাপীঠে উপনীত হইলেন। তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও অনেক শাস্ত্রালাপ হইল। পণ্ডিতগণ তাঁহার শাস্ত্রকুশলতা, বাগ্মিতা ও জ্ঞানগম্ভীরতা অবলোকন করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাকে দুর্লভ অতিথি জ্ঞানে পরমসমাদরে সৎকৃত করিলেন। শ্রীরামানুজ বোধায়নবৃত্তির কথা উল্লেখ করিলে অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ ভাবিলেন, ইহাঁকে এই পুস্তক দেখিতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ, ইঁহার সিদ্ধান্ত মহর্ষি বোধায়নের অনুমোদিত। যদ্যপি এই মহাপুরুষ উক্ত পুস্তক দর্শন করেন,

তাহা হইলে আপনার মতকে দৃঢ়তর করিয়া অদ্বৈতবাদের মহা প্রতি-দ্বন্দ্বিস্বরূপ হইয়া উঠিবেন। এই স্থির করিয়া তাঁহারা কহিলেন, "মহাত্মন্, উক্ত পুস্তক আমাদের এখানে ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" তাহা শুনিয়া যতিরাজ নিরতিশয় ক্ষুণ্ণমনা হইলেন। ভাবিলেন, তাঁহার সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। কথিত আছে, যখন তিনি এইরূপে কাতর হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, সেই সময় সারদাদেবী স্বয়ং উক্ত পুস্তক হস্তে লইয়া যতিরাজকে অর্পণ করিলেন ও কহিলেন, "বৎস, তুমি পুস্তক লইয়া অবিলম্বে স্বদেশে প্রতিগমন কর। কারণ, ইহারা এ ব্যাপার জানিতে পারিলে, তোমার পুস্তক লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইবে।" ইহা কহিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। শ্রীরামানুজ বীণাপাণির দুর্লভ দর্শন, অনুগ্রহ ও আদেশ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে পণ্ডিতমণ্ডলির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে সারদাপীঠস্থ বুধমণ্ডলি গ্রন্থাগারসংস্কার-মানসে যাবতীয় পুস্তক ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া, তাহারা কীটদষ্ট হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের সংস্কার সাধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে গিয়া তাঁহারা বোধায়নবৃত্তি দেখিতে না পাওয়ায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে স্থির করিলেন যে, দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিতদ্বয় নিশ্চয়ই উহা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় বলবান্ পুরুষ তৎক্ষণাৎ উঁহাদের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং দিবানিশি গমন পূর্ব্বক এক মাস পরে কুরেশসনাথ রামানুজের দর্শন পাইলেন। যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, বোধায়নবৃত্তি উঁহাদের নিকট আছে, তখন দ্বিরুক্তি না করিয়া উক্ত ক্ষুদ্রচিত্ত, পণ্ডিতাভিমানী মূর্খগণ বলপূর্ব্বক পুস্তকটি লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে শ্রীরামানুজের বিষাদের আর সীমা রহিল না। গুরুর এই অবস্থা দেখিয়া কুরেশ কহিলেন, "অয়ি আশ্রিতবৎসল, আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিয়া অবধি আমি প্রতি রজনীতে আপনাকে সুনিদ্রিত দেখিয়া বৃত্তিটি পাঠ করিতাম, এরূপ করায় সমগ্র পুস্তকটি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। আমি এখনই ইহা লিখিয়া ফেলিতেছি। পাঁচ ছয় দিবসে

লিখিয়া শেষ করিয়া ফেলিব।” শ্রীরামানুজ এতচ্ছ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তিনি কুরেশকে প্রেমভরে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “বৎস, তুমি চিরজীবী হও। আজ আমার নষ্ট রত্ন উদ্ধার করিয়া তুমি আমায় চিরঋণে বদ্ধ করিলে।” পুস্তক লেখা শেষ হইলে তাঁহারা অবিলম্বে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। যতিরাজ শিষ্যবর্গকে পথের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, হে ভাগবতোত্তমগণ, তোমাদের ভক্তিবলে ও কুরেশের অসাধারণ মেধাশক্তির প্রভাবে বোধায়নবৃত্তি সংগৃহীত হইল। যে সকল কুদৃষ্টিগণ ‘তত্ত্বমসি’, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ইত্যাদি বাক্যসমূহের অর্থজ্ঞানকেই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন, কিম্বা যে সকল জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদিগণ উক্ত অর্থজ্ঞানের সহিত যজ্ঞদানতপকর্ম্মের অত্যাবশ্যকতা স্বীকার করেন, আমি অদ্য সেই সকল অদূরদর্শিগণের মত খণ্ডন করিয়া ধ্যান, উপাসনা ও ভক্তি দ্বারা মোক্ষ লাভই যে বেদ বেদান্তের অভিপ্রায়, ইহা প্রতিপাদন পূর্ব্বক শ্রীভাষ্য রচনা করিতে আরম্ভ করিব। যাহাতে এই কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়, তোমরা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে তাহাই প্রার্থনা কর। বৎস কুরেশ, তুমি আমার লেখক হও। কিন্তু যখন কোনও ভাষ্যবিষয়িনী যুক্তি তোমার সমীচীন বোধ হইবে না, তখন লিখন বন্ধ রাখিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিও। এইরূপে আমি উক্ত যুক্তিটিকে পুনঃ পর্য্যালোচনা করিবার অবকাশ পাইব, এবং তাহা যদি ভ্রমাত্মিকা বলিয়া বোধ করি, তখনই পরিবর্ত্তন করিয়া দিব।”

এইরূপে শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ হইল। সমগ্র ভাষ্য লিখন কালে কুরেশকে কেবল একবার মাত্র লিখন বন্ধ করিতে হইয়াছিল। একদা জীবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া যতিভূপতি কহিলেন, “জীব স্বরূপতঃ নিত্য ও জ্ঞাতা”। এতচ্ছ্রবণে কুরেশের লেখনী স্থির হইল। যদিও গুরু তাঁহাকে লিখিতে বার বার আদেশ করিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার অনুমতি প্রতিপালন করিলেন না। ইহাতে রামানুজ কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “কুরেশ, যদি তুমি এরূপ আচরণ কর, তাহা হইলে শ্রীভাষ্য তুমিই লেখ।” কিন্তু এরূপ কহিয়া পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, “জীব যদি স্বরূপতঃ নিত্য ও জ্ঞাতা হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বতন্ত্র ও দেহাভিমানবিশিষ্ট বলিতে হানি কি? কিন্তু যখন শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ‘মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ’ তখন

জীব পরতন্ত্র ভিন্ন কখনও স্বতন্ত্র নহেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের অধীন বলিয়া, ঈশ্বরকে অংশী বা শেষী ও তাঁহাকে অংশ বা শেষ বলাই বিধেয়।” এইরূপ স্থির করিয়া তিনি জীবস্বরূপকে বিষ্ণুশেষত্বসংযুক্ত ও জ্ঞাতৃত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করিলে কুরেশ পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে শ্রীভাষ্যরচনা পরিসমাপ্ত হইল।

এই মহৎ কর্ম্ম সমাপন করিয়া যতিরাজ ‘বেদান্তদীপন’, ‘বেদান্তসার’, ‘বেদার্থসংগ্রহঃ’, ও ‘গীতাভাষাম্’ নামক চারিখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করিয়া তিনি যামুনমুনির দ্বিতীয় অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা স্বীয় শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইয়া, তৎসমুদয়কে ‘দ্রাবিড় বেদ’ এই আখ্যা প্রদান ও বেদের সহিত সমান আসনে সমাসীন করাইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে মহাত্মার প্রথম অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি স্বীয় মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শ্রীভাষ্য প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া যতিরাজ চতুঃসপ্ততিসিংহাসনাধিপতি ও অন্যান্য অসংখ্য শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ চোলমণ্ডলে গমন পূর্ব্বক, তত্রত্য রাজধানী কাঞ্চিপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীবরদরাজের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক কুম্ভকোনম্ যাত্রা করিলেন। তত্রত্য বুধমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্র বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয়মতে আনয়ন করতঃ রামানুজ পাণ্ড্য দেশের রাজধানী মদুরানগরীতে উপনীত হইলেন। এই নগর দ্রাবিড় কবিগণের দুর্গস্বরূপ। দ্রাবিড় প্রবন্ধমালা ব্যাখ্যা করিয়া, তিনি সেই বুধগণকে, স্বমতে আনয়ন করিলেন। তথা হইতে শঠরিপুর জন্মভূমি কুরুকাপুরী দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি তত্রত্য দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক শ্রীশঠারিবিগ্রহ দর্শন পূর্ব্বক আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং সেই সাত্বতপ্রধানের স্তব করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। তথায় কয়েক দিবস থাকিয়া তিনি কুরঙ্গনগরীতে গমন করিলেন। তন্নগরীস্থ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কথিত আছে, শ্রীরামানুজের অতুলনীয় লোকসংগ্রহ ও লোকরক্ষণক্ষমতা সন্দর্শন

করিয়া শ্রীবিষ্ণু নিরতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং সেই লীলাময় হরি লীলাপরতন্ত্র হইয়া যতিরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও গুরুদত্ত 'বৈষ্ণবনম্বি' এই নাম স্বীকার পূর্ব্বক আপনাকে কৃতকৃত্যের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন।

তথা হইতে তিনি কেরল বা মালাবার দেশে গমন করিলেন ও তত্রত্য রাজধানী তিরু অনন্তপুরম্ বা ট্রিভ্যাণ্ড্রম্ যাইয়া অনন্তশয়ন পদ্মনাভ স্বামীকে সন্দর্শন করিয়া ভক্তি-পরিপ্লুত হইয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি ক্রমে দ্বারাবতী, মথুরা, বৃন্দাবন, শালগ্রাম, সাকেত, বদরিকাশ্রম, নৈমিষ, পুষ্কর প্রভৃতি সন্দর্শন পূর্ব্বক কাশ্মীরস্থ সারদা পীঠে উপনীত হইলেন। কথিত আছে, সারদা দেবী তাঁহার নিকট "কপ্যাসং পুণ্ডরীকাক্ষং" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণপূর্ব্বক নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে "ভাষ্যকার" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা রামানুজের সহিত বিবাদ করিতে ছাড়েন নাই। এমন কি, তাঁহার প্রাণনাশ করিবার অভিলাষে অভিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হইয়া গেল। তদ্দ্বারা অভিচারকর্ত্তারাই প্রাণ হারাইতে বসিলেন। তাহাতে কাশ্মীর ভূপতি শ্রীরামানুজের পাদমূলে গমন-পূর্ব্বক কৃপাভিক্ষা করিলে তিনি সকলকে সুস্থ করিলেন। রাজা ও পণ্ডিতগণ অচিরাৎ তাঁহার শিষ্য হইলেন। এখানে শ্রীরামানুজ ভগবানের হয়গ্রীব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। সারদাদেবী কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যতিরাজ অতঃপর ৺কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া ও অনেক দার্শনিক পণ্ডিতকে স্বীয়মতে আনয়ন করিয়া তিনি অবশেষে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কতিপয় দিবস পরে শ্রীপুরুষোত্তমে উপনীত হইয়া কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রাম করিলেন। আপনার মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি তথায় এক মঠ প্রস্তুত করাইয়া স্বীয় শিষ্য গোবিন্দের নামানুসারে তাহাকে 'এমার্ মঠ' এই নামে অভিহিত করিলেন। তত্রত্য পণ্ডিতেরা তাঁহার সহিত বাদে পরাস্ত হইবার ভয়ে, তিনি চাহিলেও তাঁহার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীরামানুজ তদ্দৃষ্টে তথায় স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বড়ই আগ্রহবান্ হইলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চকগণকে পাঞ্চ-রাত্রাগমানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা স্মার্ত্তমত পরিত্যাগ করিয়া উক্ত নূতন মত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়

তিনি রাজার নিকট বিচার আকাঙ্ক্ষা করিলেন। ইহাতে অর্চ্চকগণ ভীত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমের শরণাগত হইলেন। কথিত আছে, সেই রজনীতে নিদ্রাবস্থায় রামানুজ শতযোজনদূরস্থ কূর্ম্মক্ষেত্রে জগন্নাথ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন।

জাগ্রত হইয়া দেখেন, তিনি ভিন্নদেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য শিষ্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার নিকট নাই। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, তিনি কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছেন! ইহা দেবতার মায়া স্থির করিয়া তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক শ্রীকূর্ম্মদেবের মন্দিরে গমন করিলেন ও গললগ্নীকৃতবাস হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সেই অবতার মূর্ত্তির পূজা করিলেন; ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া, অর্চ্চকগণ দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যগণের অপেক্ষায় কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। রামানুজ স্বীকৃত হইলেন। কয়েক-দিবস পরে তিনি শিষ্যগণের সহিত পুনঃ সম্মিলিত হইয়া সিংহাচলে গমন করিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া গারুড়পর্ব্বতস্থিত অহোবল মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া শোলিঙ্গাঙ্গে আগমন পূর্ব্বক শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিলেন। তথা হইতে ক্রমে বেঙ্কটাচল বা তিরুপতিতে উপনীত হইলেন। সেই সময় তত্রত্য বিগ্রহ লইয়া শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। শ্রীরামানুজ অমানুষী শক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন, উহা শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারেন না, ইহাতে বৈষ্ণব ও শৈব উভয় সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট হইল। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সশিষ্য রামানুজ কাঞ্চিপুরে পুনরাগমন পূর্ব্বক শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিলেন। তথা হইতে মধুরান্তক দর্শন করতঃ নাথমুনির জন্মভূমি বীরনারায়ণপুরে আগমন করিলেন। তিনি সেই মহামুনির মহৎ যোগাভ্যাসস্থলকে নমস্কার করিয়া, পরিশেষে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীকে সন্দর্শন পূর্ব্বক আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ ও কৃতকৃত্য মনে করিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন।

ক্রমশঃ।

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যে কেদার ও বদরী বিশালের শ্রীচরণ প্রান্তে প্রতি বৎসর কত শত দেশের রাজা, মহারাজ, ধনী ও নির্ধন ব্যক্তি আপন আপন অভীষ্ট দ্রব্যাদি অকাতরে সমর্পণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, সেই "সাত রাজার ধনের" স্বামী মোহান্তগণ বড় কম ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ নহেন। মোহান্তজীর গলায় স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিতাধারে স্বসাম্প্রদায়িক চিহ্ন শিবলিঙ্গ লম্বমান এবং সাধারণ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ন্যায় দিব্য বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। ঐহিক সুখের প্রভাবে যেন তিনি অভিভূত এবং পার্থিব ঐশ্বর্য্যকেই যেন তিনি সার ভাবিয়াছেন। একে মোহান্তগণ দেবসেবায় নিযুক্ত ও সাধুসম্প্রদায়ভুক্ত তাহাতে আবার তাঁহারা বিপুল সম্পত্তির অধিস্বামী; সুতরাং তাঁহাদের পদগৌরবও অসাধারণ। যে সুদূর দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে সামান্য একটী পার্থিব ভোগ্য পদার্থের দর্শনলাভও ঘটে না, সেই স্থানে বসিয়া ৺কেদার ও বদরীনারায়ণের মোহান্তগণ অনায়াসে বিবিধ দেবভোগ্য পদার্থ সমুদয় উপভোগ করিতেছেন। বিবিধ মণি, মাণিক্য, সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত দ্রব্যাদির চাকচিক্যে মোহান্তজীর চক্ষু যেন ঝলসিয়া রহিয়াছে। মোহান্তজীর ক্ষণিকপ্রভাশালী পার্থিব ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার মনে হইল, বিচিত্রবিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতি দেবী যে অনন্ত সুষমাময় রত্নরাজিতে আপনার প্রিয় লীলানিকেতন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার বিমল স্বর্গীয় জ্যোতিতে দিগন্ত আলোকিত, সেই বিমল জ্যোতির যেন তথায় প্রবেশ নিষিদ্ধ! প্রকৃতিদেবীর সে চারু মনোহর রূপের ছটা যেন মোহান্তজীর ভোগবিলাসপূর্ণ গৃহদ্বার হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছে!

হিমালয়ে মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি দেবীর চিরপ্রকাশ। এখানে আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বয়ং উমারূপে গিরিরাজ-নন্দিনী হইয়া অনন্তরত্নপ্রভব পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে জগৎ আলো করিয়া বসিয়া আছেন। অচিরে অদূরেই কৈলাসে, জগৎপিতা সদাশিবের অর্দ্ধাঙ্গী হইয়া কোটী-স্থির-সৌদামিনী-জিনি-রূপে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে দীপ্তিমান্ করিয়াছেন। জগদম্বার পিত্রালয় ও

শ্বশুরালয় দুইই এখানে; যেমন মার পিত্রালয়, তেমনি মার শ্বশুরালয়। চিরসৌন্দর্য্যময় হিমালয় ও হরপার্ব্বতীর চিরবিলাসনিকেতন কৈলাস, দুইই এক প্রকৃতির মহান্ অতুল বিচিত্র বিভব! মা আমাদের সমান আদরে আদরিণী সর্ব্বত্র; পিত্রালয়ে মা মেনাঙ্ক-শায়িনী গিরিরাজনন্দিনী উমা, কৈলাসে মা শিবসোহাগিনী মহারাজরাজেশ্বরী। মা জগদম্বা আপনার অসীম গৌরবে গৌরবান্বিতা হইযা যে স্থানকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া রাখিযাছেন, অনন্তবিশ্বপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহামাযা যে স্থানে জননী-ক্রোড়ে লালিতা পালিতা এবং পরম পুরুষ সদাশিবের সহিত নিত্যালিঙ্গিতা; অনন্তভাবময়ী পুরুষ প্রকৃতির মহা সম্মিলনে যে স্থান অনন্ত ভাব, সৌন্দর্য্য, শোভা ও পবিত্রতায় পূর্ণ; যথায় পুরুষ প্রকৃতির চূড়ান্ত লীলাভূমি; যাহা দেখিয়া ভোলানাথ শিব সদা মুগ্ধ ও কৈলাসবাসী; যাহার দর্শনে মুনি ঋষিগণ সমাধিস্থ হইতেন; যাহার প্রশান্ত ও পবিত্র ক্রোড়ে * মা ভগবতী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় যাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃতই যে স্থানকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" করিয়া রাখিয়াছেন; যে পরম ধামের প্রত্যেক অণু পরমাণুটী পর্য্যন্ত জগদম্বার আশৈশবানুষ্ঠিত নব নব লীলারসাস্বাদন করিয়া চিন্ময় রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং যে স্থান জগদম্বার অনন্ত মহিমায উচ্ছ্বসিত; মা, তোমার চিরবিলাস-ভূমি সেই মহা পবিত্র দেবদুর্ল্লভ স্থানে তোমারই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ মোহান্তজী সামান্য স্থূল বিষয়ের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। মা, তোমার মহীয়সী মহিমানভিজ্ঞ মোহান্তজীর লোলুপ চঞ্চল দৃষ্টি তোমার চিরশান্তিপ্রদ অনন্তরূপে আকৃষ্ট না হইয়া সমাগত যাত্রিগণের প্রতি মুহুর্মুহুঃ নিপতিত হইতেছে! মা, ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মায়া !!!

যে ওখিমঠে পঁহুছিয়া আমার এত কথা মনে হইল, যে স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া স্বতঃই আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সেই বিস্ময়-জনক বিচিত্র স্থানে পঁহুছিলে এবং সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিলে দর্শক মাত্রেই আমার দশা প্রাপ্ত হইবেন। এই স্থানের মহত্ত্ব খ্যাপন করিবার ইচ্ছায় আমি এত কথা লিখিলাম বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, যেন কিছুই

* দক্ষালয় কনখল।

বলা হইল না। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পবিত্র স্থানের কথা স্মরণ করিয়া আমি যাহা অনুভব করিতেছি, ভাষায় যেন তাহার কিছুই প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ওখিমঠ হইতে হিমালয়ের যে অপার চমৎকার দৃশ্য সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যেন অতি নিকটেই অনন্ত বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর আপন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় সদা বিরাজমান আছেন। এই ওখিমঠ যেন সেই বিশ্বরাজধানীর একটী প্রধান দ্বার।

যাহা হউক, মোহান্তজীর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া আমরা দুইজনেই একবাসায় ফিরিলাম। মোহান্তজীর সহিত আমাদের এমন কোন আবশ্যকীয় কথা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি কেবল আদিতারাম বাবুকে ঘন ঘন গাড়োয়ালের ডেপুটী কালেক্টার সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীনগরের ন্যায় ওখিমঠে পঁহুছিয়াও এক বিষয়ে আমাকে অতিশয় হতাশ হইতে হইল। আমি উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিতে পাইব মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আর যাহা দেখিব বলিয়া একবার মনেও করি নাই, তাহাই দেখিতেছি। উত্তরাখণ্ডে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে, না জানি কত শত সংসারবিরক্ত সাধু মহাপুরুষকেই এখানে সাধন ভজনে মগ্ন দেখিতে পাইব, সন্ন্যাসীর মঠগুলিতে না জানি কত শত মহাপুরুষকে সদাসর্ব্বদা পরমাত্মধ্যানে, বেদান্তচর্চ্চায় এবং জনসমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত দেখিতে পাইব। কিন্তু উত্তরাখণ্ডের দুইটী প্রধান মঠেই যাহা দেখিলাম, তাহাতে যথার্থই আমাকে অতিশয় মর্ম্মাহত হইতে হইল। যাহা ভাবিয়াছিলাম, এই দুই মঠে তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আর যাহা ভাবিতেও পারি নাই, অর্থাৎ গিরিরাজ হিমালয় যে এত সুন্দর ও মহান্, ইহা যে অপার সৌন্দর্য্যরাশির এক বিরাট্ ঘনীভূত মূর্ত্তি এবং ইহার দর্শনে যে মনুষ্যহৃদয় এতদূর উন্নত ও পবিত্র হইতে পারে, তাহাই দেখিলাম। প্রকৃতির একমাত্র অপার বিচিত্র লীলানিকেতন হিমালয় দর্শন করিয়া আমার আক্ষেপ দূর হইল এবং আমি আশাতীত আনন্দ অনুভব করিলাম। হিমাদ্রির দর্শনে আমার যে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তিব্বতভ্রমণের দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াও ৪।৫ বৎসরের মধ্যে আমার সে মোহ ভাঙ্গে নাই।

যে হিমালয়ান্তর্গত পবিত্র তপোভূম বদরিকাশ্রমে ভগবান্ স্বয়ং নর-নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর অমানুষিক তপস্যার মগ্ন ছিলেন (যে জন্য বদরিকাশ্রম মাহাত্ম্য অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে,) জগন্মাতা গৌরী যথায় ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া জগৎপিতা মহাদেবের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে ভগবান্ যথায় তপশ্চর্য্যার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, মহামুনি বেদব্যাস স্বীয় শিষ্যবর্গের সহিত যথায় বেদপাঠে সদা রত থাকিতেন ; আবহমানকাল যে স্থান কেবল তপস্যা ও ভগবদারাধনার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ; যে স্থানকে ভগবান্ সর্ব্বতোভাবেই তপস্যার অনুকূল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যথায় বহুতর মঠ ও মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া যাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার কেন্দ্রস্থল করিয়া গিয়াছেন ; সর্ব্বশাস্ত্রেই যাহার স্বর্গীয় মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং যাহা আত্মচিন্তাপরায়ণ তপঃক্লিষ্ট আর্য্যঋষিগণের একমাত্র আশ্রম, সেই হিমালয়ের মঠ মন্দির গুলিকে উপযুক্ত একজন নেতার অভাবে দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইতে দেখিলে কে না মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিবে ? যে মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এই সকল মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, কি পরিতাপের বিষয় যে, তাহার কোন অনুষ্ঠানই আর দেখিতে পাওয়া যায় না ! উত্তরাখণ্ডের মঠগুলিতে সাধু-সন্ন্যাসী বা লোকসমাজের হিতসাধনোদ্দেশ্যে কেহই কিছু করিতে পারিল না। মঠাধিষ্ঠাতা মোহান্তগণ কেবল মোটামুটী বিগ্রহ-সেবার একটা ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত এবং প্রতিবৎসর যাত্রার সময় কত চড়াও (অর্থাৎ দেবসেবায় অর্পিত দ্রব্যাদি) হইবে, যাত্রায় কত লোক আসিবে এবং কোন দেশের রাজা রাজওরারা যাত্রায় আসিবেন কিনা, এই ভাবনা-তেই তাঁহারা অবশিষ্ট ছয় মাস কাল অতিবাহিত করেন। আর নানাদেশীয় ভক্ত যাত্রিগণের অর্পিত বহুমূল্য দ্রব্যাদি সপরিজন পরম সুখে উপভোগ করেন। দেবসেবায় নিযুক্ত আছেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে সকল প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যই সুলভ হইয়াছে। যে পার্ব্বত্য প্রদেশে সামান্য এক টুকরা গুড় দেখাইয়া অনেককে প্রলুব্ধ করা যায়, সেই স্থানেই এই মোহান্ত-গণের হাতে কত মেওয়া মিছ্রীর ছড়াছড়ী হয় !

এই সকল সন্ন্যাসীর মঠ ও মন্দিরের অধিস্বামিগণের নিকট আমরা স্বদেশের ও স্বসমাজের যে পরিমাণে হিতাকাঙ্ক্ষা করিতে পারি, তাহা

প্রকৃত পক্ষেই আর কাহারও নিকট করিতে পারি না। একজন বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী গৃহস্থ এবং একজন কৌপীনকরোয়াধারী সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, ঐশ্বর্য্যবান্ গৃহস্থ ব্যক্তি তাঁহার ঐশ্বর্য্য দিয়া লোকোপকার করিবেন, কিন্তু নিঃস্ব সন্ন্যাসী তাঁহার প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া লোকোপকার করিতে সদা প্রস্তুত থাকিবেন। আমি পুরাকালীন আদর্শ-চরিত্র গৃহস্থ ও সন্ন্যাসিগণের অলৌকিক আত্মত্যাগের কথার অবতারণা না করিয়া আজকালকার কথাই বলিতেছি। একজন ধনাঢ্য গৃহস্থ যতই উদার হউন না কেন, জনসাধারণের হিতসাধনোদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাত্র ত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রাণের মমতা এককালে বিসর্জ্জন দেওয়া বড় সহজ কথা নহে, তাঁহার পক্ষে প্রাণপ্রিয় পুত্র কলত্রাদির স্নেহমমতার বন্ধন ছিন্ন করা বড় স্বাভাবিক নহে। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী, যাঁহাকে মায়ার সম্বন্ধ পাতাইয়া বহুচেষ্টা করিয়াও কেহ সংসারে রাখিতে পারে না, যাঁহার আপনার বলিতে কেহ নাই অথচ বিশ্ববাসিমাত্রেই যাঁহার পরমাত্মীয়, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের বিনিময়ে লোক-সমাজের হিতসাধন করা তাঁহার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। সেইজন্যই বলিতেছি যে, এই সকল মঠের ঐশ্বর্য্যশালী মোহান্তগণ আপন আপন শিষ্যবর্গসহ "ধনে প্রাণে" যেমন লোকোপকার করিতে পারেন, সেরূপ আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু কি গভীর পরিতাপের বিষয় যে, যাঁহাদের ধন ও প্রাণ উভয়ই "বহুজনহিতায়" "বহুজনসুখায়" ন্যস্ত হওয়া উচিত, তাঁহারা কেবল মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ক্ষণিক সুখ ও সম্ভোগের-জন্যই উহা ব্যয় করিতেছেন !!!

ওখিমঠের মোহান্তজী প্রতিবৎসর কেবল বাবা কেদারনাথের মন্দির খুলিয়াই নীচে চলিয়া আইসেন। অবশিষ্ট সকল কার্য্য তিনি তাঁহার ভৃত্য ও অনুচরবর্গের দ্বারাই সমাধা করেন। এককালীন ছয়মাস কেদারে থাকা বড় সহজ কথা নহে। কেদারে অসহ্য শীত ও বহুবিধ অসুবিধার জন্যই মোহান্তজী তথায় থাকিতে পারেন না। বাবা কেদারনাথের প্রকৃত পূজারীপদবাচ্য হইয়াও মোহান্তজী বাবার সেবা করিতে পারেন না। বাবার সমুদয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী কিন্তু তিনি। যাঁহারা ছয়মাস কাল অনবরত সেই মর্ম্মভেদী অসহ্যশীতে প্রত্যহ স্নানাহ্নিক করিয়া বাবার সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের দৈন্যদশা দেখিলে আবার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এত কষ্ট

করিয়াও তাঁহাদিগকে মোহান্তজীর নিকট যৎসামান্য সাহায্য সামগ্রী পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ইহাও অতিশয় অদ্ভুত ও বিসদৃশ ব্যাপার বটে!

সে যাহা হউক, আদিত্যরাম বাবুর সহিত ওখিমঠে একরাত্রি পরমানন্দেই অতিবাহিত হইল। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে আদিত্যরাম বাবু ওখিমঠ হইতে ৺বদরীনারায়ণাভিমুখে যাত্রা করিতে মনঃস্থ করিলেন। তাঁহারই প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, ৺কেদারের পথে চোপ্তাচটীতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামক আর একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় বহুশাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাকে অতি সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়া আদিত্যরাম বাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমিও চোপ্তাচটীতে পঁহুছিয়া উক্ত সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, মনে করিলাম। একটু বেলা হইলেই আদিত্যরাম বাবু ওখিমঠ হইতে বিদায় হইলেন। আমার শীতবস্ত্রের নিতান্ত অভাব দেখিয়া তিনি আমাকে একখানি কম্বল কিনিবার জন্য দুইটী মাত্র টাকা দিয়া গেলেন। দুইটী টাকা লইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, দুইটী টাকার বিনিময়ে কে আমাকে এক্ষণে একখানি কম্বল দেয়? বস্ত্রের মধ্যে তখন আমার কেবল একটা আলখাল্লা মাত্র ছিল। কারণ, শ্রীনগরে প্রাপ্ত কম্বলখানি আমি গুপ্তকাশীর সেই সাধুকে পূর্ব্বেই দিয়া আসিয়াছিলাম। ৺বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ক্রমশঃই শীতবস্ত্রের অভাব বোধ হয় না কিন্তু ৺কেদার ও বদরীনারায়ণের অসহ্যশীতের জন্যই সকলের শীতবস্ত্রের আবশ্যক হয়। আমি তখনও ৺কেদার বদরীতে পঁহুছিতে পারি নাই সুতরাং আমার একখানা কম্বলের যে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন না। টাকা দুইটীতে তো শীত ভাঙ্গে না অথচ এক মোহান্তজী ভিন্ন ওখিমঠের অধিবাসী মাত্রকেই আমার এতই দরিদ্র বলিয়া বোধ হইল যে, তাঁহাদের কাছে আমি কোন প্রকার সাহায্যপ্রার্থী হইতে ইচ্ছা করিলাম না। তাহাদেরই সন্তান সন্ততিগণ চিরহিমানীর অসহ্য-শীতনিবারণোপযোগী বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। তাহার উপর শুনিলাম যে, দুই টাকায় একখানি পাহাড়ী কম্বল হইবে না, আরও কিছু চাই।

এই সকল কারণে আমি তখন ভাবিলাম যে, মোহান্তজীর দুইটাকা গদীভেট করিয়া তাঁহারই নিকট একখানি কম্বল চাহিয়া লওয়া শ্রেয়ঃ। আমি অবিলম্বেই মোহান্তজীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেই টাকা

ও মোহরপূর্ণ থালে টাকা দুইটী ফেলিয়া দিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমি যখন মোহান্তজীর কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তখন তিনি যেন ঈষৎ নিমীলিতনেত্রে কি চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু রজতখণ্ডের চমৎকার মধুর শব্দের এমনি মোহিনীশক্তি যে, সেই শব্দেই মোহান্তজীর চমক্ ভাঙ্গিয়া গেল। মোহান্তজী আমার দিকে যেন একটু উৎফুল্লনেত্রে তাকাইলেন। সামান্য দুইটী টাকা দেওয়াতে তিনি আজ আমার প্রতি যে একটু প্রসন্ন ভাব দেখাইলেন, পূর্ব্ব দিবস রিক্তহস্তে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহা দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক, তাহার পর তিনি আমার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এবং আমার অবস্থা ও বেশভূষা দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝিলেন যে, আমার নিকট আর এক কপর্দ্দকও নাই। তাহার পর আমি কেবল ভাবিতে লাগিলাম যে, টাকা দুইটী তো আমার হাতছাড়া হইয়াছে, এক্ষণে একখানি কম্বল পাইলে হয়। কিছুক্ষণ পরেই যখন মোহান্তজী বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যসিন্ধুতে আমার বিন্দুস্বরূপ দুইটী টাকা নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তখন তিনি অগত্যা তাহার ভাণ্ডার হইতে আমাকে একখানি কম্বল বাহির করিয়া দিলেন। কম্বলখানি বেশ পুরু এবং সেই পাহাড়েই প্রস্তুত। আমি কম্বলখানি লইয়া বাহিরে আসিলে আমাকে দেখিয়া মোহান্তজীর অনুচর ও গ্রামবাসিগণ যেন অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল। তাহারা সকলেই আমাকে একবাক্যে বলিতে লাগিল যে, "বাবা, তুমি বাহাদুর যে, আমাদের মোহান্তজীর নিকট একখানা প্রায় ৩৲ টাকা মূল্যের কম্বল আদায় করিলে।" কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, "পূর্ব্বেই দুইটা টাকা গদীভেট না করিলে তো আর কম্বলখানি বাহির হইত না"। মোহান্তজীর উদারতার পরিচয় ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে?

আমি সেই দিনই ওখিমঠ হইতে গুপ্তকাশীতে ফিরিয়া আসিলাম। গুপ্তকাশী হইতে যে পথে গিয়াছিলাম, সেই পথেই ফিরিয়া আসিলাম। ওখিমঠ হইতেও ৺কেদারনাথে যাইবার পথ রহিয়াছে, কিন্তু ৺কেদারনাথ দর্শন করিয়া সকলকেই ওখিমঠ হইয়া ৺বদরীনারায়ণে যাইতে হয় এবং গুপ্তকাশী হইয়াই ৺কেদারনাথে যাইতে হয় সুতরাং আমাকেও পুনরায় আর একবার ওখিমঠে আসিতে হইবে অথচ গুপ্তকাশী হইয়া না

গেলে ৺কেদারনাথে যাইবার পথের অনেকটা স্থান আমার দেখা হয় না ; এই ভাবিয়া আমি পুনরায় গুপ্তকাশীতেই আসিলাম। আর একবার সেই উদারস্বভাব ভক্ত সাধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া আমি বিশেষরূপে আনন্দিত হইলাম। গুপ্তকাশীতে পঁহুছিয়াই আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দেখা হইতেই তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই, প্রীতি ও স্নেহগদ্গদকণ্ঠে "প্রসাদ পাও, প্রসাদ পাও," বলিয়া তিনি আমাকে কত আদর করিয়াই কাছে বসাইলেন এবং আমাকে পুনঃ পুনঃ সেই রাত্রি গুপ্তকাশীতে অবস্থিতি করিতে বলিলেন।

এইখানে আমার সহিত আমার পূর্ব্বপরিচিত আর এক জন সাধুর সাক্ষাৎ হইল। ইহাঁকে বহুপূর্ব্বে আমি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কাশীপুরস্থ মা সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে দেখিয়াছিলাম। সাধুটী উদাসী * অর্থাৎ গুরু নানকের সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই সময়ে প্রায় একমাস কাল তাঁহার সহিত বর্দ্ধমানে গিয়া আমি ছিলাম। সাধু লোকালয় ত্যাগ করিয়া অতিশয় নিভৃত স্থানে একাকী থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি কোন সাধুর জমাৎ বা যেখানে লোকসমাগমের সম্ভাবনা আছে, এমন স্থানে গিয়া আসন করিতেন না। বর্দ্ধমানে অবস্থানকালীন আমি তাঁহার নির্জ্জনসেবার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার মধুর কথাবার্ত্তায় এবং আচার ব্যবহারে তাঁহাকে একজন প্রকৃত সাধু বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল। যাহা হউক, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমি তাঁহার দর্শন পাইয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। গুপ্তকাশীতে একরাত্রি অবস্থিতি করিয়া তৎপরদিন প্রাতঃকালে আমরা দুইজনে ৺কেদার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমার সহযাত্রী মহাপুরুষেরও শীতনিবারণোপযোগী বস্ত্রের অতিশয় অভাব দেখিলাম। তাঁহার মাথায় সামান্য একটা কাপড়ের পাগড়ী, গায়ে একটা ছেঁড়া পিরান্ এবং নিতান্তই জ্যালজেলে ছেঁড়া একখানা কম্বল মাত্র ছিল। তাঁহার আর কিছুই ছিল না। পয়সা কড়ি সম্বন্ধে তো দুইজনেই সমান। এদিকে আমরা যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, শীতের প্রাবল্য ততই অধিক বোধ হইতে লাগিল। আমার গায়ে একটা কম্বলের

* পঞ্জাব প্রদেশে "উদাসী ও নির্ম্মলা" সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের বিশেষ প্রাধান্য। খালসা শিখ সম্প্রদায় ভুক্ত সাধুগণ নিৰ্ম্মলা নামে অভিহিত হন। গুরু নানক হইতে গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্য্যন্ত সকলকেই ইঁহারা আচার্য্য বলিয়া মান্য করেন।

আলখাল্লা ছিল। তাঁহার কিন্তু ঊর্ণ-বস্ত্রের মধ্যে সেই একখানি ছেঁড়া কম্বল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না সুতরাং আমার ওখিমঠ হইতে আনীত কম্বলখানি তাঁহাকে দিয়া আমি তাঁহার ছেঁড়া কম্বলখানি লইলাম। আমার ভাল কম্বলখানি তাঁহাকে দেওয়ায় তাঁহার শীতবস্ত্রের অভাব কতক দূর হইল। এই যে সাধুর নিকট আমি একখানি ছেঁড়া কম্বল লইলাম, এই কম্বল ও আলখাল্লা আর আমার হস্তান্তরিত হয় নাই। এই দুই বস্ত্র লইয়াই আমি প্রথম বৎসর বরাবর তিব্বতে গিয়াছিলাম।

গুপ্তকাশী হইতে আমরা দুইজন একসঙ্গেই যাত্রা করিলাম বটে, কিন্তু পথে আমরা সম্পূর্ণরূপে ছাড়াছাড়ী হইয়া পড়িতাম। আমি অগ্রসর হইয়া যদি কোন স্থানবিশেষের দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া কোথাও অধিকক্ষণ বিশ্রাম করিতাম, তাহা হইলেই তাঁহার সহিত পুনরায় আমার পথে দেখা হইত। রাত্রিতে আমরা প্রায়ই এক চটীতে থাকিতাম।

গুপ্তকাশী হইতে কয়েক ক্রোশ উপরে গিয়া ফাটাচটীতে পঁহুছিলাম ; এই চটী অন্যান্য অনেক চটী অপেক্ষা বড় এবং এখানে পাকা ঘর বাড়ী আছে। ফাটাচটীর স্বামীর সহিত পুনরায় এইখানে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে ভিক্ষা করাইলেন এবং আমার সঙ্গী উদাসী মহাপুরুষকেও তাঁহার উপযুক্ত ফলাহার দিলেন ; তিনি একজন ফলাহারী সাধু ছিলেন। ফাটাচটীতে অতি উত্তম এক প্রকার মধু খাইলাম। তাহা দেখিতে অতি উত্তম দানাদার গাওয়া ঘৃতের মত। উহার সুঘ্রাণের কথা কি কহিব, হিমালয়ের চিরপ্রস্ফুটিত অসংখ্য কুসুমরাজির সাগন্ধ উহাতে যেন একত্র উপলব্ধি হয়। যদিচ হিমালয়ের মধু প্রসিদ্ধ এবং আমি অনেক প্রকার পাহাড়ী মধু খাইয়াছি কিন্তু ফাটাচটীর সুস্বাদু ও সাগন্ধবিশিষ্ট মধুর তুল্য গুণ-সম্পন্ন মধু আর কোথাও খাই নাই। এই স্থানের মধু অতি উত্তম হইবার কথাই বটে ; কারণ, ৺কেদারনাথের নিম্নে গৌরীকুণ্ড হইতে গুপ্তকাশী ও ত্রিযুগী-নারায়ণ প্রভৃতি স্থানে যেন চিরবসন্ত বিরাজ করিতেছে। এই সকল স্থান চিরপল্লবায়িত ঘন বন লতা বিতানে সমাচ্ছাদিত এবং বিচিত্র বর্ণ-বিশিষ্ট ফলপুষ্পে সুশোভিত সুতরাং এরূপ স্থানেই উত্তম মধু হওয়া স্বাভাবিক।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোচন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে
সন ১৩১১ সালের ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে আহূত
সভায় স্বামী সারদানন্দের
বক্তৃতা।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দেবভাব সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন; এমন কি, অনেকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নির্ভরের কারণ অনুসন্ধান করিলে তাঁহার অমানুষ যোগবিভূতি সকলই উহার মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন তুমি তাঁহাকে মান? এ প্রশ্নের উত্তরে বক্তা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুদূরের ঘটনা-বলিও ভাগিরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসিয়া দেখিতে পাইতেন; যে—স্পর্শ করিয়া কঠিন কঠিন শারীরিক ব্যাধিসমূহ কখন কখন আরাম করিয়াছেন; যে—দেবতাদের সহিতও তাঁহার সর্বদা বাক্যালাপ হইত এবং তাঁহার বাক্য এতদূর অমোঘ ছিল যে, মুখপদ্ম হইতে কোন অসম্ভব কথা বাহির হইলেও বহিঃপ্রকৃতির ঘটনাবলিও ঠিক সেইভাবে পরিবর্ত্তিত এবং নিয়মিত হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাজদ্বারে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও তাঁহার কৃপাকণা ও আশীর্ব্বাদ লাভে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষিত এবং বিশেষ সম্মানিত পর্য্যন্ত হইয়াছিল অথবা কেবলমাত্র-রক্তকুসুমোৎপাদি বৃক্ষে শ্বেত কুসুমেরও আবির্ভাব হইয়াছিল ইত্যাদি।

অথবা বলেন যে, তিনি মনের কথা বুঝিতে পারিতেন; যে—তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রত্যেক মানবশরীরের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া তাহার মনের চিন্তা, গঠন এবং প্রবৃত্তি সমূহ পর্য্যন্তও দেখিতে পাইত; যে—তাঁহার কোমল করস্পর্শ মাত্রেই চঞ্চলচিত্ত ভক্তের চক্ষে ইষ্টমূর্ত্ত্যাদির আবির্ভাব হইত অথবা গভীর ধ্যান এবং অধিকারিবিশেষে নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বার পর্য্যন্ত উন্মুক্ত হইত। বিরল কেহ কেহ আবার বলেন যে, কেন তাঁহাকে মানি, তাহা আমিই জানি না; কি এক অদ্ভুত জ্ঞান এবং প্রেমের সম্পূর্ণ আদর্শ যে তাঁহাতে দেখিয়াছি, তাহা জীবিতপরিচিত মনুষ্যকুলের ত কথাই নাই, বেদপুরাণাদিগ্রন্থনিবদ্ধ জগৎ-পূজ্য আদর্শসমূহও তাঁহার

পার্শ্বে আমার চক্ষে হীনজ্যোতিঃ হইয়া যায়; এটা আমার মনের ভ্রম কি না তাহা বলিতে অক্ষম কিন্তু আমার চক্ষু সেই উজ্জ্বল প্রভায় ঝলসিয়া গিয়াছে এবং মন সে প্রেমে চিরকালের মত মগ্ন হইয়াছে, ফিরাইবার চেষ্টা করিলেও ফিরে না, বুঝাইলেও বুঝে না; জ্ঞান তর্ক যুক্তি যেন কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, ডাকিলেও সাড়া দেয় না বা সহায়তা করে না; এই টুকু মাত্র আমি বলিতে সক্ষম—

"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে;
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি —তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত
জপ তপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব দিয়াছি তাড়ায়ে,
আছে মাত্র জানাজানি আশ,
তাও প্রভু কর পার।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শেষোক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে অপর মনুষ্য-সাধারণ স্থূল বাহিক-বিভূতি অথবা সূক্ষ্ম মানসিক-বিভূতির জন্যই তাঁহাতে ভক্তি বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া থাকে। স্থূলদৃষ্টি মানব মনে করে যে, তাঁহাকে মানিলে তাহারও রোগাদি আরোগ্য হইবে, তাহারও সঙ্কট বিপদাদির সময়ে বাহিক ঘটনাসমূহ তাহার অনুকূলে নিয়মিত হইবে। স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও তাহার মনের ভিতর যে এই স্বার্থপরতার স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না।

দ্বিতীয়শ্রেণীমধ্যগত কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মদৃষ্টি মানবও তাঁহার কৃপায় দূরদর্শনাদি বিভূতিলাভ করিবে, তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়া গোলোকাদি স্থানে বাস করিবে অথবা আরও কিঞ্চিৎ সমুন্নতদৃষ্টি হইলে সমাধিস্থ হইয়া জন্ম জরাদি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে, এই জন্যই তাঁহাকে মানিয়া থাকে। স্বকীয় প্রয়োজন সিদ্ধিই যে এই বিশ্বাসেরও মূলে বর্ত্তমান, ইহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ দৈববিভূতিনিচয়ের ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেও অথবা নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি প্রয়োজন রূপ সকাম ভক্তিও

যে তাঁহাতে অর্পিত হইয়া অশেষ মঙ্গলের কারণ হয়, এ বিষয়ে সন্দিহান না হইলেও তত্তদ্বিষয় আলোচনা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; তাঁহার মনুষ্যভাবের চিত্র কথঞ্চিৎ অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করাই অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য।

সকাম ভক্তি—নিজের কোনরূপ অভাব পূরণের জন্য ভক্তি, ভক্তকে সত্য দৃষ্টির উচ্চ সোপানে উঠিতে দেয় না। স্বার্থপরতা সর্ব্বকালে ভয়ই প্রসব করিয়া থাকে এবং ঐ ভয়ই আবার মানবকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বল-তর করিয়া ফেলে। স্বার্থলাভ আবার মানবমনে অহংকার এবং আলস্য বৃদ্ধি করিয়া তাহার চক্ষু আবৃত করে এবং তজ্জন্যই সে যথার্থ সত্য দর্শনে সমর্থ হয় না। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর ভিতর যাহাতে ঐ দোষ প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ধ্যানাদির অভ্যাসে দূরদর্শনাদি কোনরূপ মানসিক শক্তির নূতন বিকাশ হইয়াছে জানিলেই পাছে ঐ ভক্তের মনে অহংকার প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে ভগবান্ লাভরূপ উদ্দেশ্যহারা করে, সে জন্য তিনি তাহাকে কিছুকাল ধ্যানাদি করিতে নিষেধ করিতেন, ইহা বহুবার প্রত্যক্ষ করি-য়াছি; ঐ প্রকার বিভূতিসম্পন্ন হওয়াই যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়, ইহাও বার বার বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু দুর্ব্বল মানব নিজের লাভ লোকসান্ না খতাইয়া কিছু করিতে বা কাহাকেও মানিতে অগ্রসর হয় না এবং ত্যাগের জলন্ত মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন হইতে ত্যাগ শিক্ষা না করিয়া নিজের ভোগসিদ্ধির জন্যই ঐ মহৎজীবন আশ্রয় করিয়া থাকে। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার অলৌকিক তপস্যা, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্যা-নুরাগ, তাঁহার বালকের ন্যায় সরলতা এবং নির্ভর, এ সকল যেন তাহাদিগের ভোগসিদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এইরূপ মনে করে। আমাদের মনুষ্যত্বের অভাবই ঐ প্রকার হইবার কারণ এবং সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মনুষ্যভাবের আলোচনাই আমাদের অশেষ কল্যাণকর।

ভক্তি যৎকিঞ্চিৎও যথার্থ অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তকে উপাস্যের অনুরূপ করিয়া তুলে। সর্ব্বজাতির সর্ব্বধর্ম্মগ্রন্থেই একথা প্রসিদ্ধ। ক্রুশারূঢ় ঈশার মূর্ত্তিতে সমাধিস্থমন ভক্তের হস্তপদ হইতে রুধিরনির্গমন, শ্রীমতীর বিরহদুঃখানুভবনিমগ্নমন শ্রীচৈতন্যের বিষম গাত্রদাহ এবং কখন বা মৃতবৎ অবস্থাদি, ধ্যানস্তিমিত বুদ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে বৌদ্ধ ভক্তের বহুকালব্যাপী নিশ্চেষ্টাবস্থান প্রভৃতি ঘটনাই ইহার নিদর্শন। প্রত্যক্ষও দেখিয়াছি, মনুষ্য-

বিশেষে প্রযুক্ত ভালবাসা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে মানুষকে ভালবাসিতের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছে; তাহার বাহ্যিক হাব ভাব চাল চলনাদি তাহার মানসিক চিন্তাপ্রণালীও সমূলে পরিবর্ত্তিত হইয়া তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিও তদ্রূপ যদি আমাদের জীবনকে দিন দিন তাঁহার জীবনের কথঞ্চিৎও অনুরূপ না করিয়া তুলে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ভক্তি এবং ভালবাসা তত্তন্নামের যোগ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে,—"তবে কি আমরা সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হইতে সক্ষম? একের সম্পূর্ণরূপে অপরের ন্যায় হওয়া জগতে কখনও কি দেখা গিয়াছে?" উত্তরে আমরা বলি, সম্পূর্ণ একরূপ না হইলেও এক ছাঁচে গঠিত পদার্থনিচয়ের ন্যায় নিশ্চিত হইতে পারে। ধর্ম্মজগতে প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ সদৃশ। তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরাও সেই সেই ছাঁচে গঠিত হইয়া অদ্যাবধি সেই সকল বিভিন্ন ছাঁচের রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মানুষ অল্পশক্তি; ঐ সকল ছাঁচের কোন একটার মত হইতে তাহার আজীবন চেষ্টাও কুলায় না। ভাগ্যক্রমে কেহ কখন কোন একটি ছাঁচের যথার্থ অনুরূপ হইলে আমরা তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি। সিদ্ধ মানবের চাল চলন ভাষা চিন্তা প্রভৃতি শারীরিক এবং মানসিক সকল বৃত্তিই সেই ছাঁচপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের সদৃশ হইয়া থাকে। সেই মহাপুরুষের জীবনে যে মহাশক্তির প্রথম অভ্যুদয় দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হইয়াছিল, তাহার দেহমন সেই শক্তির কথঞ্চিৎ ধারণ, সংরক্ষণ এবং সঞ্চারের পূর্ণাবয়ব যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষপ্রণোদিত ধর্ম্মশক্তিনিচয়ের সংরক্ষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি আবহমান কাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

ধর্ম্মজগতে যে সকল মহাপুরুষ অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ছাঁচের জীবন দেখাইয়া যান, তাঁহাদিগকেই জগৎ অদ্যাবধি ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। অবতার ধর্ম্মজগতে নূতন মত, নূতন পথ আবিষ্কার করেন; স্পর্শমাত্রেই অপরে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করেন। তাঁহার দৃষ্টি কখনও অনিত্য সংসারে কামকাঞ্চনের কোলাহলের দিকে আকৃষ্ট হয় না। তাঁহার জীবন পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অপরকে পথ দেখাইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিজের ভোগ সাধন বা মুক্তিলাভও তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হয় না। কিন্তু অপরের দুঃখে সহানু-

ভূতি, অপরের উপর গভীর প্রেমই তাঁহাদিগকে কার্য্যে প্রেরণা করিয়া অপরের দুঃখ নিবারণের পথ আবিষ্করণের হেতু হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেবকান্তি যতদিন না দেখিয়াছিলাম, ততদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতারখ্যাত মহাপুরুষ-গণের জীবনবেদ পাঠ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলাম। তাঁহাদের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী দলপুষ্টির জন্য শিষ্যপরম্পরারচিত প্ররোচনাবাক্য বলিয়া মনে হইত; অবতার সভ্যজগতের বিশ্বাসবহি-র্ভূত কিম্ভূতকিমাকার কাল্পনিক প্রাণিবিশেষ বলিয়া অনুমিত হইত। অথবা ঈশ্বরের অবতার হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও সেই সকল অবতার মূর্ত্তিতে যে আমাদেরই ন্যায় মনুষ্যভাবসকল বর্ত্তমান, বিশ্বাস হইত না। তাঁহাদের শরীরে যে আমাদের মত রোগাদি হইতে পারে, তাঁহাদের মনে যে আমাদেরই মত হর্ষশোকাদি বিদ্যমান, তাঁহাদিগের ভিতরে যে আমাদেরই ন্যায় প্রবৃত্তিনিচয়ের দেবাসুরসংগ্রাম চলিতে পারে, তাহা ধারণা হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র স্পর্শেই সে বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছে। অবতারশরীরে দেব এবং মানুষভাবের অদ্ভুত সম্মি-লনের কথা আমরা সকলেই পড়িয়াছি বা শুনিয়াছি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবার পূর্ব্বে কোন মানবে যে বালকত্ব এবং কঠোর মনুষ্যত্বের একত্র সামঞ্জস্যে অবস্থান হইতে পারে, একথা ভাবি নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন, তাঁহার পঞ্চবর্ষীয় শিশুর ন্যায় বালকস্বভাবই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল। অজ্ঞান বালক সকলেরই প্রেমের আস্পদ এবং সকলেই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতঃ ত্রস্ত হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে দেখিলে লোকের মনে সেইসকল ভাবের স্বভাবতঃ স্ফূর্ত্তি হইয়া তাহা-দিগকে মোহিত ও আকৃষ্ট করিত। কথাটি কিছুসত্য হইলেও আমাদের ধারণা—পরমহংসদেবের শুদ্ধ বালকভাবে যে জনসাধারণ আকৃষ্ট হইত, তাহা নহে; কিন্তু হর্ষ ও প্রীতির সহিত দর্শকের মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় দেখিয়া মনে হয়, কুসুমকোমল বালকপরিচ্ছদে আবৃত ভিতরের বজ্রকঠোর মনুষ্যত্বই ঐ আকর্ষণের কারণ। ভারতের যশস্বী কবি অযোধ্যাধিপতি শ্রীরাম-চন্দ্রের লোকোত্তর চরিত্র বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরানাং চেতাংসি কোহনুভবিতুমর্হতি॥"

সেই কথা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধেও প্রতিপদে বলিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালক ভাব এক অতি অভিনব পদার্থ। অসীম সরলতা, অপার বিশ্বাস, অশেষ সত্যানুরাগ সে বালকত্বের মূলে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকিলেও বিষয়বুদ্ধি মানব তাহাতে কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা এবং বিষয়বুদ্ধি-রাহিত্যেরই পরিচয় পাইত। সকল লোকের কথাতেই তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস, বিশেষতঃ, ধর্ম্মলিঙ্গধারীদের কথায়। দেশের এবং নিজ গ্রামের প্রচলিত ভাব সকলও এই বালকত্ব পরিস্ফুট করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। শস্যভারশ্যামলাঙ্গ হইয়া হরিৎসমুদ্রপ্রতীকাশ অথবা তদভাবে ধূসর মৃত্তিকাসমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত বিস্তীর্ণ বহুযোজনব্যাপী প্রান্তর; তন্মধ্যে বংশ বট খর্জ্জুর আম্র অশ্বথাদি বৃক্ষাচ্ছাদিত কৃষককুলের মৃত্তিকানির্ম্মিত সুপরিচ্ছন্ন দীপপুঞ্জের ন্যায় শোভমান পর্ণকুটীররাজি; সুনীলপত্রাচ্ছাদিত বৃহৎতালবৃক্ষ-রাজিমগুলিত ভ্রমর-মুখরিত পদ্মসমাচ্ছন্ন হালদারপুকুরাদিনামাখ্যাত বৃহৎ সরোবরনিচয়; বুড়োশিবাদিনামা প্রথিতযশদেবাধিষ্ঠিত ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগৃহ; অদূরে পুরাতন গড় মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন স্তূপরাজি; প্রান্তে ও পার্শ্বে অস্থিসমাকুল বহুপ্রাচীন শ্মশান, তৃণাচ্ছাদিত গোচর, নিবিড় আম্রকানন, বক্রসঞ্চরণশীল ভূতির খাল খ্যাত ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী এবং সমগ্র গ্রামের অর্দ্ধেকেরও অধিক বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান বর্দ্ধমান হইতে পুরীধামে যাইবার যাত্রিসমাকুল সুদীর্ঘ রাজপথ—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর।

শ্রীচৈতন্য এবং তচ্ছিষ্যগণ প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মই এখানে প্রবল। কৃষাণ প্রজাকুল তাহাদের পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে অথবা দিনান্তে কার্য্যাবসানে তাঁহাদেরই রচিত পদাবলি গানে আনন্দে বিভোর হইয়া শ্রমাপনোদন করে। সরল পদ্যময় বিশ্বাসই এ ধর্ম্মের মূলে; এবং জীবনসংগ্রামের কঠোর তরঙ্গসমূহ হইতে সুদূরে বর্ত্তমান এই গ্রামের ন্যায় বালকের হৃদয়ও ঐরূপ বিশ্বাস এবং ধর্ম্মের বিশেষ অনুকূলভূমি। বালক রামকৃষ্ণের বালকত্ব কিন্তু এখানেও অদ্ভুত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তাহার বিচিত্র কার্য্য সকলে না হইলেও, উদ্দেশ্যের গভীরতা এবং একতানতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইত। "রাম নামে মানব নির্ম্মল হয়" কথকমুখে একথা শুনিয়া কখন বা এবালক দুঃখিতচিত্তে জল্পনা করিত যে, তবে কথক ঠাকুরেরও অদ্যাবধি শৌচের আবশ্যক হয় কেন। কখন বা একবার মাত্র যাত্রাদি শুনিয়া তাহার সকল অঙ্গ আয়ত্ত করিয়া বয়স্যসমূহসঙ্গে

আম্রকাননমধ্যে উহার পুনরভিনয় হইত। গ্রামান্তরগন্তুকাম পথিক বালকের সে অদ্ভুত অভিনয় ও সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গন্তব্য পথে যাইতে ভুলিয়া যাইত। প্রতিমাগঠন, দেবচিত্রাদিলিখন, অপরের হাবভাব অনুকরণ, সঙ্গীত সংকীর্ত্তন রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আয়ত্তীকরণ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গভীর অনুভবে এ বালকের বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। তাঁহার শ্রীমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, কৃষ্ণনীরদাবৃত গগনে উড্ডীন ধবল বলাকারাজি দেখিয়াই তিনি প্রথম সমাধিস্থ হন; তাঁহার বয়স তখন ৬।৭ বৎসর মাত্র ছিল। যখন যে ভাব হৃদয়ে আসিত, সেই ভাবে তন্ময় হওয়াই এ বালকমনের বিশেষ লক্ষণ ছিল। প্রতিবেশীরা এখনও এক বণিকের গৃহপ্রাঙ্গন নির্দ্দেশ করিয়া গল্প করে, কিরূপে একদিন ঐ স্থানে হরপার্ব্বতীসংবাদের অভিনয় কালে অভিনেতা সহসা পীড়িত হইয়া অপারক হইলে রামকৃষ্ণকে সকলে অনুরোধ করিয়া শিব সাজাইয়া অভিনয় করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি ঐ সাজে সজ্জিত হইয়া এমনই ঐ ভাবে মগ্ন হইয়াছিলেন যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা মাত্র ছিল না। এই সকল ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যায় যে, বালক হইলেও বালকের চঞ্চলচিত্তত্ব তাঁহাতে আশ্রয় করে নাই। দর্শন বা শ্রবণ দ্বারা কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেই তাহার ছবি মনে এরূপ সুদৃঢ় অঙ্কিত হইত যে, ঐ প্রেরণায় উহার সম্পূর্ণ আয়ত্তীকরণ এবং অভিনব রূপে পুনঃপ্রকাশ না করিয়া স্থির থাকা এ বালকের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

গ্রন্থাদি না পড়িলেও বাহ্যজগতের সংঘর্ষে এ বালকের ইন্দ্রিয়নিচয় স্বল্পকালেই সমুচিত প্রস্ফুটিত হয়। যাহা সত্য, প্রমাণ-প্রয়োগদ্বারা তাহা বুঝিয়া লইব, যাহা শিখিব, তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিব এবং অসত্য না হইলে জগতের কোন বস্তুই ঘৃণার চক্ষে দেখিব না, ইহাই এ বালকমনের মূল মন্ত্র ছিল। যৌবনের প্রথম উদ্গম—অদ্ভুতমেধাসম্পন্ন বালক রামকৃষ্ণ শিক্ষার জন্য টোলে প্রেরিত হইলেন কিন্তু বালকত্বের সাঙ্গ হইল না। সে ভাবিল, এ কঠোর অধ্যয়ন, রাত্রিজাগরণ, টীকাকারের চর্ব্বিতচর্ব্বণ প্রভৃতি কিসের জন্য? ইহাতে কি বস্তু লাভ হইবে? মন ঐ প্রকার অধ্যবসায়ের পূর্ণ ফল টোলের আচার্য্যকে দেখাইয়া বলিল, তুমিও ঐরূপ সরল শব্দনিচয়ের কুটিল অর্থকরণে সুপটু হইবে; তুমিও উহাঁর ন্যায় ধনী ব্যক্তির তোষামোদাদিতে বিদায়াদি সংগ্রহ করিয়া কোনরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে; তুমিও ঐ রূপ শাস্ত্রনিবদ্ধ সত্য

সকল পাঠ করিবে এবং করাইবে, কিন্তু চন্দনভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় তাহাদিগের অনুভব জীবনে করিতে পারিবে না। বিচারবুদ্ধি বলিল, এ চালকলা বাঁধা বিদ্যায় প্রয়োজন নাই। যাহাতে মানবজীবনের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ সত্য অনুভব করিতে পার, সেই পরা-বিদ্যার সন্ধান কর। রামকৃষ্ণ পাঠ ছাড়িলেন এবং আনন্দপ্রতিমা দেবীমূর্ত্তির পূজা-কার্য্যে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু এখানেও শান্তি কোথায়? মন বলিল, সত্যই কি ইনি আনন্দঘনমূর্ত্তি জগজ্জননী অথবা পাষাণপ্রতিমা মাত্র? সত্যই কি ইনি ভক্তিসমাদৃত পত্র-পুষ্প-ফল-মূলাদি গ্রহণ করেন? সত্যই কি মানব ইহাঁর কৃপাকটাক্ষলাভে সর্ব্বপ্রকারবন্ধনমুক্ত হইয়া দিব্য দর্শন লাভ করে? অথবা মানবমনের বহুকালসঞ্চিত কুসংস্কাররাজি কল্পনাসহায়ে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া ছায়াময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং আপনাকেই আব-হমানকাল ধরিয়া প্রতারণা করিয়া আসিতেছে? প্রাণ এ সন্দেহ নির-সনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং তীব্র বৈরাগ্যের অঙ্কুর বালকমনে ধীরে ধীরে উদগত হইল। বিবাহ হইল, কিন্তু ঐ প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া সাংসারিক সুখভোগ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। নিত্য নানা উপায়ে মন ঐ প্রশ্ন সমাধানে নিযুক্ত রহিল এবং বিবাহ, সংসার, বিষয়বুদ্ধি, উপার্জ্জন, ভোগ-সুখ, এবং অত্যাবশ্যকীয় আহার বিহারাদি পর্য্যন্ত নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। সুদূর কামারপুকুরে যে বালকত্ব বিষয়-বুদ্ধির পরিহাসের বিষয় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বালকত্বই দক্ষিণেশ্বর দেবমন্দিরে নিতান্ত প্রস্ফুটিত হইয়া সেই বিষয়বুদ্ধির আরও অধিক উপেক্ষনীয় বাতুলত্ব বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু এ বাতুলতায় উদ্দেশ্যহীনতা বা অসম্বদ্ধতা কোথায়? ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিব, স্পর্শ করিব, পূর্ণভাবে আস্বাদন করিব, ইহাই কি ইহার বিশেষ লক্ষণ নহে? যে লৌহময়ী ধারণা, অপরাজিত অধ্যবসায় এবং উদ্দেশ্যের ঋজুতা ও একতানতা কামারপুকুরে বালক রামকৃষ্ণের বালকত্বে অভিনব শ্রী প্রদান করিয়াছিল, তাহাই এখন বাতুল রামকৃষ্ণের বাতুলত্বকে এক অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার করিয়া তুলিল।

দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রবল মানসঝটিকা বহিতে লাগিল। সে প্রাকৃতিক ভীষণ সংগ্রামে অবিশ্বাস সন্দেহ প্রভৃতির তুমুল তরঙ্গাঘাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনতরীর অস্তিত্বও সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিল। কিন্তু সে বীরহৃদয় আসন্নমৃত্যুসম্মুখেও

কম্পিত হইল না, গন্তব্যপথ ছাড়িল না। ভগবদনুরাগ ও বিশ্বাস সহায়ে ধীর স্থিরভাবে নিজ পথে অগ্রসর হইল। সংসারের কামকাঞ্চনময় কোলাহল—লোকে যাহাকে ভালমন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্যাদি বলে—সে সকল কতদূরে পড়িয়া রহিল, ভাবের প্রবল তরঙ্গ উজান পথে ঊর্দ্ধে ছুটিতে লাগিল। সে প্রবল তপস্যা, সে অনন্ত ভাবরাশির গভীর উচ্ছ্বাসে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবলিষ্ঠ দেহ ও মন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নূতন আকার নূতন শ্রী ধারণ করিল। মহাসত্য, মহাভাব, মহাশক্তি ধারণ ও সঞ্চারের সম্পূর্ণাবয়ব যন্ত্র গঠিত হইল।

হে মানব! শ্রীরামকৃষ্ণের এ অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? তোমার স্থূল দৃষ্টিতে পরিমাণ ও সংখ্যাধিক্য লইয়াই পদার্থের গুরুত্ব বা লঘুত্ব গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে সূক্ষ্ম শক্তি স্বার্থগন্ধ পর্য্যন্ত বিদূরিত করিয়া অহংকারকে সমূলে উৎপাটিত করে, যাহার বলে ইচ্ছা করিলেও কিঞ্চিন্মাত্র স্বার্থচেষ্টা শরীর মনের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে, সে শক্তিপরিচয় তুমি কোথায়ই বা পাইবে? জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ধাতুস্পর্শমাত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের হস্ত যে আড়ষ্ট হইয়া তদ্ধাতু গ্রহণে অসমর্থ হইত; পত্র পুষ্প প্রভৃতি অপরের তুচ্ছ বস্তুও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহার বিনানুমতিতে গ্রহণ করিয়া নিত্যাভ্যস্ত পথ দিয়া আসিতে আসিতে যে তিনি পথ হারাইয়া বিপরীতে গমন করিতেন; গ্রন্থিপ্রদান করিলে সে গ্রন্থি যতক্ষণ না উন্মুক্ত করিতেন, ততক্ষণ যে তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ থাকিত, বহু চেষ্টাতেও বহির্গত হইত না; সুকোমল রমণীস্পর্শে তাঁহার যে কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়সঙ্কোচাদি হইত, এ সকল শারীরিক বিকার যে পবিত্রতম মানসিক ভাবনিচয়ের বাহ্য অভিব্যক্তি, আজন্ম স্বার্থদৃষ্টিপটু তোমার চক্ষু তাহাদের কোথায় দর্শন পাইবে? তোমার দূরপ্রসারী কল্পনাও কি এ শুদ্ধতম ভাবরাজ্যে প্রবেশাধিকার পায়? ভাবের ঘরে চুরি করিতেই আমরা আজীবন শিখিয়াছি। যথার্থ গোপন করিয়া কোনরূপে ফাঁকি দিয়া বড়লোক হইতে পারিলে বা নাম কিনিতে পারিলে আমাদের মধ্যে কয়জন পশ্চাৎপদ হয়? তাহার পর সাহস। একবার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া দশবার আঘাত করা অথবা অগ্নিউদ্গারকারী তোপ সম্মুখে ধাবিত হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন, এ সাহস করিতে না পারিলেও শুনিয়া তোমার প্রীতির উদ্দীপন হয় কিন্তু যে সাহসে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব পৃথিবী ও স্বর্গের ভোগসুখ এবং নিজের শরীর ও মন পর্য্যন্ত জগতের অপরিচিত অজ্ঞাত অননুলব্ধ ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন,

সে সাহসের কিঞ্চিৎ ছায়া মাত্রও তুমি কি অনুভবে সমর্থ? যদি পার, তবে হে বীর, তুমি আমার এবং সকলের পূজনীয় মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ করিয়াছ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি তুচ্ছ কথা সকল বা অতি ক্ষুদ্রকার্য্য সমূহও কি গভীর ভাবে পূর্ণ থাকিত, তাহা স্বয়ং না বুঝাইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না। সমাধিভঙ্গের পরেই অনেক সময়ে যে তিনি নিত্যপরিচিত বস্তু বা ব্যক্তি-সমূহের নামোল্লেখ ও স্পর্শ করিতেন অথবা কোন খাদ্যদ্রব্যবিশেষের উল্লেখ করিয়া ভক্ষণ পানাদি করিবেন বলিতেন, তাহার গূঢ় রহস্য একদিন আমাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"সাধারণ মানবের মন গুহ্য লিঙ্গ এবং নাভি সমাশ্রিত সূক্ষ্ম স্নায়ুচক্রেই বিচরণ করে। কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে ঐ মন কখনও কখনও হৃদয়সমাশ্রিত চক্রে উঠিয়া জ্যোতিঃ বা জ্যোতির্ম্ময় রূপাদির দর্শনে অল্প আনন্দানুভব করে। নিষ্ঠার একতানতা বিশেষ অভ্যস্ত হইলে কণ্ঠসমাশ্রিত চক্রে উহা উঠিয়া থাকে এবং তখন যে বস্তুতে সম্পন্ননিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার কথা ছাড়া অপর কোন বিষয়ের আলোচনা তাহার পক্ষে অসম্ভবপ্রায় হয়। এখানে উঠিলেও সে মন নিম্নাবস্থিত চক্রসমূহে পুনর্গমন করিয়া ঐ নিষ্ঠা কখন কখন ভুলিয়াও যাইতে পারে। কিন্তু যদি কখনও কোন ভাবে প্রবল একনিষ্ঠা সহায়ে কণ্ঠের ঊর্দ্ধদেশস্থ ভ্রূমধ্যাবস্থিত চক্রে তাহার গমন হয়, তখন সে সমাধিস্থ হইয়া যে আনন্দ অনুভব করে, তাহার নিকট নিম্ন চক্রাদির বিষয়ানন্দ উপভোগ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়; এখান হইতে আর তাহার পতনাশঙ্কা থাকে না। এখান হইতেই কিঞ্চিন্মাত্র আবরণে আবৃত পরমাত্মার জ্যোতিঃ তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হয়। পরমাত্মা হইতে ঈষন্মাত্র ভেদ রক্ষিত হইলেও এখানে উঠিলেই অদ্বৈত জ্ঞানের বিশেষ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই চক্র ভেদ করিতে পারিলেই ভেদাভেদ সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানে অবস্থান হয়। আমার মন তোদের শিক্ষার জন্য কণ্ঠাশ্রিত চক্র পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে, এখানেও ইহাকে কোনরূপে জোর করিয়া রাখিতে হয়। ৬ মাস কাল ধরিয়া পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞানে অবস্থান করাতে ইহার গতি স্বভাবতই সেই দিকে প্রবাহিত রহিয়াছে, এটা করিব ওটা খাইব একে দেখিব ওখানে যাইব ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাতে নিবদ্ধ না রাখিলে উহাকে নামান বড় কঠিন হইয়া পড়ে এবং না নামিলে কথাবার্ত্তা, চলাফেরা খাওয়া ও শরীর রক্ষা ইত্যাদি সকলই অসম্ভব। সেই জন্যই সমাধিতে উঠিবার সময়ই আমি কোন না কোন একটা ক্ষুদ্র বাসনা, যথা তামাক খাব

বা ওখানে যাব ইত্যাদি করিয়া রাখি, তত্রাপি অনেক সময়ে ঐ বাসনা বার বার উল্লেখ করায় তবে মন এইটুকু নামিয়া আইসে"।

পঞ্চদশীকার একস্থানে বলিয়াছেন, সমাধিলাভের পূর্ব্বে মানব যে অবস্থায় যে ভাবে থাকে, সমাধিলাভের পরে সমধিকশক্তিসম্পন্ন হইয়াও নিজের সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে তাহার অভিরুচি হয় না। কেন না, ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত আর সকল বস্তু বা অবস্থাই তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রবল ধর্ম্মানুরাগ প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন যে ভাবে চালিত হইত, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যসমূহে পাওয়া যাইত, তাহার দুই চারিটী উল্লেখ করা এখানে অযুক্তিকর হইবে না।

শরীর বস্ত্র বিছানা প্রভৃতি অতি পরিষ্কার রাখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। যে জিনিষটি যেখানে রাখা উচিত, সে জিনিষটি ঠিক সেইখানে নিজে রাখিতে এবং অপরকেও রাখিতে শিখাইতে ভাল বাসিতেন, কেহ অন্যরূপ করিলে বিরক্ত হইতেন। কোনস্থানে যাইতে হইলে গামছা বেটুয়া প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যাদি ঠিক ঠিক লওয়া হইয়াছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিতেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার কালেও কোন জিনিষ লইয়া আসিতে ভুল না হয়, সে জন্য সঙ্গী শিষ্যকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। যে সময়ে যে কাজ করিব বলিতেন, তাহা ঠিক সেই সময়ে করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। যাহার হস্ত হইতে যে জিনিষ লইব বলিয়াছেন, মিথ্যাকথন হইবার ভয়ে সে ভিন্ন অপর কাহারও হস্ত হইতে ঐ বস্তু কখনও গ্রহণ করিতেন না। তাহাতে যদি দীর্ঘকাল অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তাহাও স্বীকার করিতেন। ছিন্নবস্ত্র, ছত্র বা পাদুকাদি কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিলে সমর্থ হইলে নূতন ক্রয় করিতে উপদেশ করিতেন এবং অসমর্থ হইলে কখন কখন নিজেও ক্রয় করাইয়া দিতেন। বলিতেন, ওরূপবস্তু ব্যবহারে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া ও হতশ্রী হয়। অভিমান অহংকার সূচক বাক্য তাঁহার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হওয়া এককালে অসম্ভব ছিল। নিজের ভাব বা মত বলিতে হইলে নিজ শরীর নির্দ্দেশ করিয়া "এখানকার ভাব," "এখানকার মত" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। শিষ্যবর্গের হাত পা চোখ মুখ প্রভৃতি শারীরিক সকল অঙ্গের গঠন, তাহাদের চাল চলন আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি কার্য্যকলাপও তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তিনিচয়ের গতি, কোন্ প্রবৃত্তিরই বা

আধিক্য ইত্যাদি এরূপ স্থির করিতে পারিতেন যে, তাহার ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। আমাদের বোধ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ দুঃখাদি জীবনানুভবের সহিত তাঁহার যে প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল, তাহাই উহার কারণ। সহানুভূতি ও ভালবাসা বা প্রেম দুইটী বিভিন্নবস্তু হইলেও শেষোক্তের বাহ্যিক লক্ষণ প্রথমটীর সহিত বিশেষ বিভিন্ন নহে। সেইজন্য সহানুভূতিকে প্রেম বলিয়া ভাবা বিশেষ বিচিত্র নহে। প্রত্যেক বস্তু ভাবিবার কালে উহাতে তন্ময় হওয়া তাঁহার মনের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। ঐ গুণ থাকাতেই তিনি প্রত্যেক শিষ্যের মনের অবস্থা ঠিক ঠিক ধরিতে পারিতেন এবং ঐ চিত্তের উন্নতির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাও ঠিক ঠিক বিধান করিতে পারিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বালকত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, শৈশবকাল হইতে তিনি তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কতদূর সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ শিক্ষাই যে পরে মনুষ্যচরিত্রপঠনে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিষ্যবর্গও যাহাতে সকল স্থানে সকল বিষয়ে ঐরূপে ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার করিতে শিখে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেক কার্য্যই বিচার-বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে নিত্য উপদেশ করিতেন। বিচার-বুদ্ধিই বস্তুর গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া মনকে যথার্থ ত্যাগের দিকে অগ্রসর করিবে, এ কথা বার বার বলিতে শুনিয়াছি। বুদ্ধিহীনের অথবা একদেশী বুদ্ধিমানের আদর তাঁহার নিকট কখনই ছিল না। সকলেই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছে যে, "ভগবদ্ভক্ত হইবি বলিয়া বোকা হইবি কেন" অথবা "একঘেয়ে হস্‌নি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়, এখানে ঝোলেও খাব, ঝালেও খাব, অম্বলেও খাব, এই ভাব"। একদেশী বুদ্ধিকেই তিনি একঘেয়ে বুদ্ধি বা একঘেয়ে ভাব বলিতেন। "তুইতো বড় একঘেয়ে"—ভগবদ্ভাবের বিশেষ কোনটীতে কোন শিষ্য আনন্দানুভব না করিতে পারিলে এইটিই তাঁহার বিশেষ তিরস্কারবাক্য ছিল। ঐ তিরস্কার বাক্য এরূপ ভাবে বলিতেন যে, উহার প্রয়োগে শিষ্যকে লজ্জায় মাটী হইয়া যাইতে হইত। ঐ উদার সার্ব্বজনীন ভাবের প্রেরণাতেই যে তিনি সকল ধর্ম্মমতের সর্ব্ব প্রকার ভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া "যত মত তত পথ" এই সত্য নিরূপণে

সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ফুল ফুটিল, দেশদেশান্তরের মধুপকুল মধুলোভে উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ছুটিতে লাগিল। ফুল্লকমলও রবিকরস্পর্শে নিজ হৃদয় সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া সকলকেই সমভাবে পরিতৃপ্ত করিতে কৃপণতার লেশ মাত্রও করিল না। পাশ্চাত্যশিক্ষাসংস্পর্শমাত্রহীন ভারতপ্রচলিত কুসংস্কারখ্যাত ধর্ম্মভাবে গঠিত-জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্ম্মমধু আজ জগৎকে দান করিলেন, তাহার অমৃত আস্বাদ জগৎ পূর্ব্বে আর কখনও কি পাইয়াছে? যে মহান্ ধর্ম্মশক্তি তিনি সঞ্চিত করিয়া শিষ্যবর্গে সঞ্চারিত করিয়াছেন, যাহার প্রবল উচ্ছ্বাসে বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানালোকেও লোকে ধর্ম্মকে জ্বলন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে এবং সর্ব্ব ধর্ম্মমতের অন্তরে এক অপরিবর্ত্তনীয় জীবন্ত সনাতনধর্ম্ম স্রোত প্রবাহিত দেখিতেছে—সে শক্তির অভিনয় জগৎ পূর্ব্বে আর কখনও কি অনুভব করিয়াছে? পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বায়ু সঞ্চারণের ন্যায় সত্য হইতে সত্যান্তরে সঞ্চরণ করিয়া মনুষ্যজীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপরিবর্ত্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে গমন করিতেছে এবং একদিন না একদিন সেই অনন্ত অপার অবাঙ্মনসগোচর সত্যের নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া পূর্ণকাম হইবে—এ অভয়বাণী মনুষ্যলোকে পূর্ব্বে আর কখনও কি উচ্চারিত হইয়াছে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভারতের এবং ঈশা মহম্মদ প্রভৃতি ভারতভিন্ন দেশের ধর্ম্মাচার্য্যেরা ধর্ম্মজগতে যে একদেশীভাব বিদূরণ করিতে সমর্থ হন নাই, নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-বালক নিজ জীবনে সম্পূর্ণরূপে সেই ভাব বিনষ্ট করিয়া বিপরীত ধর্ম্মমত সমূহের প্রকৃত সমন্বয়রূপ অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইল—এ চিত্র আর কখনও কেহ কি দেখিয়াছে? হে মানব, ধর্ম্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উচ্চাসন যে কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহার নির্ণয়ে যদি সক্ষম হইয়া থাক ত তবে বল, আমরা এ বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, নির্জ্জীব ভারত তাঁহার পদস্পর্শে সমধিক পবিত্রিত জাগ্রত এবং জগতের গৌরব ও আশার স্থল অধিকার করিয়াছে—তাঁহার মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করায় নরও দেবকুলের পূজ্য হইয়াছে এবং যে শক্তির উদ্বোধন তাঁহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র লীলাভিনয়ের কেবল আরম্ভমাত্রই শ্রীবিবেকানন্দে জগৎ অনুভব করিয়াছে।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ।

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং
দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং
সংশয়রক্ষোবিনাশমহাস্ত্রং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥

অদ্বয়ব্রহ্মসমাহিতচিত্তং
প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
কর্ম্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

(১)

রাগিণী মালকোষ—তাল যৎ।

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরা'পর,
নির্ম্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল
বিভোর বাল সন্ন্যাসী ॥
রবিকরকর্ষিত, কুজ্ঝটিকা ঘন
আবরে দিনকর-কান্তি,
মায়াবলম্বন, কায়া প্রকটন,
লীলা আবরণ ভ্রান্তি ;
গুরুপদ ধারণ, আত্ম সমর্পণ,
মহাহ্রদে নদ মহা সম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান,

দুরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী
জন-মন-মার্জ্জিত শান্তি প্রদান ;
সশিষ্য গুরুপদ হৃদে সাধে ধরি
গায় আকিঞ্চন গান,
কৃপা-কণা-অভিলাষী ॥

(২)

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল একতালা।

কে রে এ নরেন্দ্রবর বীরেশ্বরদেহধারী।
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যাবিনাশকারী ॥
তমাচ্ছন্ন বসুমতী, হেরি কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান-জ্যোতি, কে এনেছে সহকারী॥
রহি পরহিতে রত, শিখাবে কি মহাব্রত,
এসেছ আশ্রিত ব্রত, জন-মন-তাপহারী ॥
গুরুপদে বলিদান, জীবন-যৌবন-মান
হয়েছ কি অধিষ্ঠান, সাজিতে দীন-ভিখারী ॥

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

"পড়িয়ে ভবসাগরে ডোবে মা তনুর তরী"
গানের সুরের মত সুর।

(ঐ) স্তিমিতচিৎসিন্ধু ভেদি উঠিছে কি জ্যোতি ঘন।
(মায়া) খণ্ডিত অখণ্ড বারি বুঝে লীলা কেবা হেন ॥
কোটি সূর্য্য গলাইয়া ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন ॥
দেখ উজ্জ্বল বালক বেশে
অখণ্ড ঘর প্রবেশে
প্রেম ঘন বাহুপাশে
কাহারে (নরেশে) করে ধারণ ॥
(বলে) চাহ বীর আঁখি মেলি
রাখ ধ্যান চল চলি
ধরণী ডুবালে বুঝি
অবিদ্যা কাম কাঞ্চন ॥

সুধীর ধীর পরশে
যোগী চাহে সহরষে
কণ্টকিত তনু মন
নীরব ভাসে নয়ন॥
তারা জ্বলি ছায়াপথে
পশে ধরা আচম্বিতে
পুণ্যভূমে উদে বুঝি
পুন নর নারায়ণ॥

স্বামী সারদানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বেলুড় মঠে এবং তাহার শাখাস্বরূপ মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর, ভাবদা, কনখল, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের আশ্রমে এবং পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা রামকৃষ্ণমিশনে ও বরিশাল জিলার অন্তর্গত নরোত্তমপুর রামকৃষ্ণাশ্রমে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ২৮শে ফাল্গুন পূজা, পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, প্রসাদ বিতরণাদি হইয়াছিল।

ঢাকায় এতদুপলক্ষে Vakil's institution গৃহে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে ঢাকার তৃতীয় মুন্সেফ শ্রীবরদাপ্রসাদ রায় 'ধর্ম্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্থান' সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। কলেজিয়েট স্কুলের হেড্পণ্ডিত শ্রীচন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলেন। জজকোর্টের উকিল শ্রীআনন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাবদা অনাথাশ্রমের আপার প্রাইমারি বিদ্যালয়টী এক্ষণে Industrial M. E. Schoolএ পরিণত হইল। আশ্রমের শিক্ষক ও ছাত্রগণ মিলিয়া সরস্বতী পূজার দিবস অতি ভক্তিসহকারে মার আরাধনা করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের মহারাজের বাঞ্ছাটিয়া প্রদর্শনীতে অনাথাশ্রমের একটী বালক পূর্ব্ব বৎসরের আশ্রম নির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য ৫৲ টাকা পারিতোষিক পাইয়াছে! এবারেও আশ্রমে নির্ম্মিত ৭০।৮০ টাকা মূল্যের চেয়ার, টিপয়, ডেস্ক, দোয়াতদান, খড়ম, ৩ রকম গামছা

ও দোশ্‌তী এবং একপ্রকার জামার ছিট প্রদর্শিত হইয়াছিল। এবার আশ্রম ৪০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছে। ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ার ও দুই রকম কাষ্ঠের Folding camp এমন সুন্দর হইয়াছিল যে, প্রদর্শনী খুলিবামাত্র উহা দেখিবার জন্য লোক ঝুঁকিয়া পড়ে এবং বহরমপুর হইতে ঐরূপ ৩।৪ ডজন চেয়ারের অর্ডার আসিয়াছে।

বিগত ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসবোপলক্ষে এক সভা আহুত হয়। তাহাতে অনুমান পাঁচ ছয় শত ভদ্রব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। বেলা একটা হইতে আহিরিটোলা ঘাট হইতে হোরমিলার কোম্পানির ষ্টিমার যাতায়াত করিয়াছিল। বেলুড় মঠের প্রশস্ত ময়দানে সামিয়ানা টাঙ্গানো হয় ও তন্মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের Oilpainting অতি সুন্দররূপে পুষ্পলতাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছিল। বেলা দুইটার সময় সভা আরম্ভ হয়। প্রথমে বাবু নীরদবরণ ঘোষ গিরীশ বাবু রচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম সম্বন্ধে একটী গান এবং সঙ্গীতাচার্য্য বাবু রামলাল দত্ত শ্যামাবিষয়ক কয়েকটী সঙ্গীত করেন। তৎপরে স্বামী সত্যকাম স্বামী বিবেকানন্দের 'My Master' গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ এবং বাবু বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্বামীজি বিরচিত 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতা হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি করেন। ইহার পর সিষ্টার নিবেদিতার বক্তৃতা হইবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, শ্রীম—এবং শ্রীগিরীশ চন্দ্র ঘোষের যথাক্রমে 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা' 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যস্নেহ' নামক তিনটী বক্তৃতা হয়। নানাকারণে ইঁহারা কেহই নিজ নিজ বক্তৃতা পাঠ করিতে না পারায় বাবু বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি, স্বামী যোগবিনোদ এবং বাবু শচীন্দ্রকুমার বসু বি, এ, যথাক্রমে এই তিনটী বক্তৃতা পাঠ করেন। পরে রামলাল দত্ত মহাশয়ের কয়েকটী সঙ্গীত হয়। সভাপতি স্বামী সারদানন্দ অতঃপর 'শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোচন' নামক তাঁহার বক্তৃতাটী পাঠ করিলে প্রায় ৫ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়। অতঃপর প্রসাদ বিতরিত হয়। সভাস্থলে স্বামী বিবেকানন্দ কর্ত্তৃক সূত্রাকারে নিবদ্ধ 'হিন্দুধর্ম্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামক প্রবন্ধ এবং স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোচন' প্রবন্ধটী বিতরিত হয়। স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। শ্রীম—মহাশয়ের বক্তৃতা নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু গিরীশ চন্দ্র ঘোষ ও বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সান্যাল মহাশয়দ্বয়ের বক্তৃতা আগামী ১লা বৈশাখের উদ্বোধনে মুদ্রিত হইবে।

পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ।*

(শ্রীগিরীশ চন্দ্র ঘোষ।)

প্রবন্ধ লিখিবার ভার যখন আমার উপর অর্পিত হইল, তখন ভাবিলাম, অতি সহজ কার্য্যই অর্পিত হইয়াছে, কিন্তু এখন কার্য্যে দেখি যে, এ প্রবন্ধ লেখা অতি কঠিন। সহজ ভাবিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে, আমি তাঁহার অপার স্নেহ উপলব্ধি করিয়াছি, প্রত্যেক শিষ্যের নিকট সেই অপার স্নেহের কথা শুনিয়াছি, অনেক সময়ে মুগ্ধচিত্তে সেই সকল পরস্পর আলোচনা করিয়াছি। যে কোনও শিষ্য তাঁহার প্রতি পরম-হংসদেবের স্নেহের ব্যবহার যখন বর্ণনা করিতেন অমনি প্রতিঘাতে হৃদয়ে শত প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইত, শত স্রোত বহিত, শিষ্যের কথায় যত না হোক, মুখ-ভাব-ভঙ্গীতে এবং তাঁহার সহিত আমার অন্তরের সমতায় তৎকালে তাহা যেন সম্যক্ অনুভূত হইত। একটী কথা যাহা শিষ্য বলিতেন, একটী কার্য্য যাহা বর্ণনা করিতেন, সেরূপ স্নেহময় কথা আমিও শুনিয়াছি, আমিও সেরূপ স্নেহময় কার্য্যের শত শত দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। শিষ্যকে অধিক বলিতে হইত না। একটী কথা বলিয়া শিষ্য ভাবিত, যেন কত বলিয়াছে, আমিও ভাবিতাম যেন কত শুনিলাম।

আমি যে কথা বলিতে চাহিতেছি, আমি তাহা সম্পূর্ণ বলিতে পারিলাম কি না তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু শ্রোতৃবর্গকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় কতক যেন আমার মনোভাব বুঝাইতে পারিব। আমার জিজ্ঞাস্য, তাঁহার প্রতি তিনি তাঁহার মাতৃ-স্নেহ কিরূপ অনুভব করিয়াছেন? তাঁহার প্রতি তাঁহার মাতৃ-স্নেহ কিরূপ বর্ণনা করুন। আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি গুটিকত কথামাত্র বলিতে পারিব; এই মাত্র বলিব, "আহা, মার স্নেহ—মার স্নেহ!" মাতার প্রতি কার্য্যে, প্রতি দৃষ্টিতে, প্রতি ব্যবহারে যাহা আমার অনুভূত হইয়াছে, তাহা কথায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত।

---

* পরমহংসদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে আহূত সভায় এই বক্তৃতা পঠিত হয়।

একটা কথা আছে, পুত্রসন্তান হইলে, পিতৃ-ঋণ শোধ যায়। তাহার অর্থ আমি এই বুঝি যে, পিতৃ-স্নেহ আমাদের পুত্র না হইলে আমরা কোন-রূপে বুঝিতে পারি না। মাতৃ-স্নেহ বোঝা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যদি মাতৃ-স্নেহ বোঝা কখনও সম্ভব হয়, পরমহংসদেবের স্নেহ বুঝিবার কোনও উপায় নাই। আমরা মায়িক অবস্থায় অবস্থিত, পিতৃমাতৃস্নেহ মায়িক স্নেহ বলিলে বলা যায়—অনেক স্থলেই মায়িক-স্নেহ। সন্তানের ঐহিক-সুখই তাঁহাদের কামনা, সন্তানের সাংসারিক উন্নতি তাঁহারা দেখিতে চান। এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পারত্রিক উন্নতির আশায় যদি পুত্র সংসার,-কার্য্যে মনোনিবেশ না করে, তাহা পিতামাতার বিরক্তির কারণ হয়। সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন হইলেও যদি বিবাহ করিতে না চায়, তাহাতে পিতা মাতা অসন্তুষ্ট হন; উপদেশও দিয়া থাকেন যে, পারত্রিক উন্নতির সময় আছে; সংসারধর্ম্ম শেষ করিয়া তার পর পারত্রিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। পুত্র তাঁহাদের এই উপদেশ না শুনিলে, যদিচ স্পষ্টমুখে বলিতে পারেন না যে, পুত্র কুপথগামী হইয়াছে, কিন্তু সে পুত্র যে কার্য্যের বাহির, এ কথা বলিয়া বন্ধুবান্ধবগণের নিকট আক্ষেপ করেন। পিতামাতার স্নেহে কখনও স্বার্থ লক্ষিত হয়। পিতাকে গুণবান্ সন্তানের পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। যতদিন পুত্রের অসহায় বালক অবস্থা, ততদিন পিতামাতা নিঃস্বার্থ। কিন্তু অনেক পিতামাতাই আশা করেন যে, পুত্র হইতে তাঁহাদের বৃদ্ধকালের বিশেষ কার্য্য হইবে। নির্গুণ সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ অধিক। গুণবান্ সন্তানের গুণই কখন কখন মাতার স্নেহের ত্রুটির কারণ হয়। পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ অতিউচ্চ স্নেহ, কিন্তু একেবারে স্বার্থস্পর্শ নাই, একথা বলা যায় না।

পিতামাতার স্নেহের আভাস কতক পাওয়া যায়, কিন্তু পরমহংসদেবের স্নেহ—এ নিঃস্বার্থ স্নেহ কিরূপে অনুভব করিব এবং কি কথায় বা বর্ণনা করিব! স্বার্থশূন্য অর্থাৎ মায়ামুক্ত অবস্থা ব্যতীত, অমায়িক কার্য্য বোঝা যায় না। তাঁহার ন্যায় যদি মায়াশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতাম এবং আমার শিষ্য থাকিত, শিষ্যের প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহ বুঝিবার কতক শক্তি হইত, কিন্তু বর্ণনা করিবার শক্তি হইত কি না জানিনা। অপরাপর শিষ্যের নিকট তাঁহার স্নেহের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনার অবস্থা মিলাইয়া কতক বুঝিয়াছি সত্য, কিন্তু অন্যের অন্তরের কথা বর্ণনা করা যায় না। আমি আপনার অন্তরের কথা, আমি নিজে বুঝি কিনা সন্দেহ, অন্যের অন্তরের কথা দুর্ব্বোধ্য। অতএব

এ প্রবন্ধে আমার আপনার কথা, পরমহংসদেবের স্নেহ আমার কিরূপ অনুভূত হইয়াছে, তাহাই বর্ণনা করিব, তদ্ব্যতীত আমি নিরুপায়! আপনার কথা বলিব, শ্রোতৃবর্গ অবস্থা বুঝিয়া অনুকম্পায় মার্জ্জনা করিবেন।

আর এক কথা, পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিষ্ট, শান্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহার স্বগণের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা নির্ম্মল বালক বয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পিতা মাতা ভুলিয়া, প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রতি প্রভুর স্নেহ বর্ণনায় তাঁহার প্রকৃত স্নেহ হয়তো বুঝান যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জন্মিবারই কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ অহেতুকদয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের একটী নাম পতিতপাবন, মানবদেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি। পতিতপাবন রামকৃষ্ণ আমায় স্নেহ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমার প্রতি স্নেহের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা চঞ্চল প্রকৃতির থাকিতে পারেন; কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কাহারও কখনও বা পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজাপথে চলিতে জানিতাম না। পরমহংসদেবের স্নেহের বিকাশ আমাতে যেরূপ পাইয়াছে, সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই। প্রবন্ধ শ্রবণে কতক আভাস পাইবেন।

যে সময় পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন, তখন আমি দ্বিদ্বন্দ্বে বিকলিত। পূর্ব্বের শিক্ষা দীক্ষা, বাল্যকাল হইতে অভিভাবকশূন্য হইয়া যৌবন-সুলভ চপলতা সমস্তই আমায় ঈশ্বর-পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে জড়বাদ প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা একপ্রকার মূর্খতা ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিচয়, সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া ঈশ্বর নাই—এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম এবং এ পাত ও পাত বিজ্ঞান উল্‌টাইয়া স্থির করা হইল যে, ধর্ম্ম কেবল সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়; দুষ্কর্ম্ম ধরা পড়িলেই দুষ্কর্ম্ম, গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য্য; কৌশলে স্বার্থ সাধন করাই পাণ্ডিত্য।

কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ পাণ্ডিত্য বহু দিন চলে না; দুর্দ্দিন

অতি কঠিন শিক্ষক, সেই কঠিন শিক্ষকের তাড়নায় শিখিলাম যে, কুকার্য্য গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই, ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। শিখিলাম বটে, কিন্তু কার্য্যজনিত ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, নিরাশব্যঞ্জক পরিণাম মানস-পটে উদয় হইতেছে. শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু শাস্তি এড়াইবার কোনও উপায় দেখিতেছি না। বন্ধুবান্ধব-হীন, চতুর্দ্দিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে এবং আমারই কার্য্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে! উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাকো, এ অকূলে কূল দাও। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "কেহ কেহ আর্ত্ত হইয়া আমাকে ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই।" দেখিলাম, গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য; সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশা-সূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ান্ধকার দূর করিল, বিপৎ-সাগরে কূল পাইলাম।

কিন্তু এতদিন সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছি, ঈশ্বর নাই, অনেক তর্ক করিয়াছি, তাহার সংস্কার কোথায় যাইবে? কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিচার করিতে লাগিলাম, দেখিলাম, এই কারণ হইতে এই কার্য্য উপস্থিত হইয়া, আমাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছে। সন্দেহ হয় কিন্তু একেবারে ঈশ্বর নাই, তাহা আর জোর করিয়া বলিতে সাহস হয় না। অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল। ঘটনা-স্রোতে কখনো বিশ্বাস আসে, কখনো সন্দেহ আসে, এ বিষয়ে যাঁহাদের সহিত আলোচনা করি, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, গুরু-উপদেশ ব্যতীত কিছুই হইবে না। কিন্তু মানুষকে গুরু বলিতে তর্কবুদ্ধি সম্মত হইল না, বিশেষতঃ গুরুকে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরু-র্দেবো মহেশ্বরঃ" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়, এ প্রণাম মানুষকে কিরূপে করিব? এতো চাতুরী! কিন্তু সন্দেহের বিষম তাড়না—হৃদয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত, সে অবস্থা বর্ণনাতীত; সহসা চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া জনশূন্য অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যেরূপ অবস্থা হয়, আমার তাৎকালিক অবস্থার সহিত সে অবস্থার কতক তুলনা হইতে পারে। চিন্তার তাড়নায় কখনো কখনো শ্বাস রোধ হইয়া যায়। দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি মুহুর্মুহুঃ জ্বলিয়া উঠে ও হৃদয়ান্ধকার আরও গাঢ় করিয়া তোলে! এই সময়ে পরমহংস-দেব আমায় দর্শন দেন।

আমি আমাদের পল্লীর চৌমাথায় একজন ভদ্রলোকের রকে বসিয়া আছি, এমন সময় পরমহংসদেব তাঁহার দুই একটী ভক্ত সমভিব্যাহারে পূর্বদিকের রাস্তা হইতে ৺বলরাম বসুর বাড়ী যাইবার জন্য আসিতেছেন। ইতিপূর্বে ষ্টার থিয়েটারে তিনি আমার "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। নারায়ণ নামে একজন ভক্ত আমাকে দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া যেন কি বলিল, উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে নমস্কার করিলেন, আমারই সম্মুখ দিয়া ৺বলরাম বাবুর বাটী চলিলেন। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, কি যেন টানিতেছে, আমি সে টানে স্থির হইতে পারিতেছি না! সে যে কি অবস্থা, আমি বলিতে পারি না। কোনও আত্মীয়ের নিকট যাইবার ইচ্ছা যেরূপ তাহা নয়, এ এক নূতন রকম, এ টান আমার পূর্ব্বে কখনো হয় নাই। আমি যাইব কি না যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় তাঁহার একজন ভক্ত, তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আমাকে বলরাম বাবুর বাটী যাইতে আহ্বান করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বলরাম বাবুর বৈঠকখানায় পরমহংসদেব বসিলেন, আমিও বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, গুরু কি?" তিনি বলিলেন, "তোমার গুরু হইয়া গিয়াছে, গুরু কি জানো—যেন ঘটক, মিলাইয়া দেয়, ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত ঈশ্বরের সহিত মিলাইয়া দেয়।" তাঁহার কথা কতদূর বুঝিলাম তাহা জানি না, কিন্তু পরমশান্তি হইল। নানা কথা হইতে লাগিল, যেন কে আপনার লোক কথা কহিতেছে। অল্পপূর্ব্বে আলাপ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কথায় প্রকাশ হইতে লাগিল, যেন বহুদিনের আলাপ। তিনি আর একদিন তাঁহাকে থিয়েটার দেখাইতে অনুরোধ করিলেন, আমিও স্বীকৃত হইলাম। স্থির হইল, "প্রহ্লাদচরিত্র" দেখিতে যাইবেন।

"প্রহ্লাদচরিত্রের" দিন তিনি থিয়েটারে আসিলেন। তাঁহাকে কিরূপ দেখিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। সে দিন কথায় কথায় তিনি আমায় বলিলেন যে, "তোমার মনে আড় আছে।" আমি ভাবিলাম, আছেই তো। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আড় কিসে যায়?" তিনি উত্তর করিলেন,—"বিশ্বাস করো।"

তাহার পর ৺রামদত্তের বাড়ীতে তিনি আসিবেন, একটু চীরকূট পত্রে সংবাদ পাই। সংবাদ পাইবামাত্র পূর্ব্বে যেরূপ আকৃষ্ট হইয়া-

ছিলাম বলিয়াছি, সেইরূপ আকৃষ্ট হইলাম। রামবাবুর বাড়ী গিয়া পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার কি হইবে?" তিনি বলিলেন, "খুব হইবে।" আমার মনের আড়, প্রভু বলিলেন, থাকিবে না। আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

এই কএকদিন দর্শন লাভে, আমার মনে মনে উদয় হইল, এ ব্যক্তি কে? আমার সম্পূর্ণ পরিচয় ইনি কি পান নাই? বোধ হয়। নচেৎ এরূপ আপনার ভাবিয়া কথাবার্ত্তা কেন কন! কথায় মনে হয় পরম আত্মীয়, ইনি কে? আমার মনে সাহস জন্মিয়াছে যে, ইনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানেন না। আমি ইহাকে আত্মপরিচয় দিলে, ইনি আমাকে ঘৃণা করিবেন না ববং আত্ম-পরিচয় দিলে আমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ইহাঁর চরণে আশ্রয় লইব, ইনি শান্তিদাতা নিশ্চয়।

দক্ষিণেশ্বর গেলাম। প্রভু বসিয়া আছেন, ভবনাথ নামে একজন শিষ্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, আমি গিয়া প্রণাম করিবামাত্র, যেন কে পরমাত্মীয় গিয়াছি, তিনি বলিলেন—"এই তোমার কথা আমি বলিতেছিলাম, সত্যি, জিজ্ঞাসা করো।" একটী উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি যেমন বাপের কাছে আবদার করে, সেইরূপ আবদার করিয়া বলিলাম, "আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, আপনি আমার কিছু করিয়া দেন।" এ কথায় বোধ হইল যেন তিনি পরম সন্তুষ্ট হইলেন, ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে হাসি দেখিয়া আমার মনে হইল, আমার মনে আর মলা নাই, আমি নির্ম্মল হইয়াছি। আসিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়, আপনাকে দর্শন করিয়া গেলাম, আবার কি যে কার্য্য করিতেছি, তাহাই করিব?" তিনি বলিলেন, "করো।" আমার মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত, যেন নূতন জীবন পাইয়াছি, পূর্ব্বের সে ব্যক্তি আমি নাই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই, ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াস-সাধ্য, এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন-যামিনী যায়, শয়নে স্বপনেও এই ভাব, পরম সাহস, পরমাত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাভয় মৃত্যুভয় তাহাও দূর হইয়াছে।

আমি তো এইরূপ ভাবি, এদিকে পরমহংসদেবের নিকট হইতে যে ব্যক্তি আসেন, তাঁহারই মুখে শুনি যে, প্রভু আমার কথা কতই বলিয়া-

ছেন। যদি কেহ আমার নিন্দা করে, (খুঁজিয়া নিন্দা করিতে হয় না) তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন. "না, জান না, ওর খুব বিশ্বাস।"

মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে আমাকে খাওয়াইবার জন্য খাবার লইয়া আসেন; প্রসাদ না হইলে আমার খাইতে রুচি হইবে না, সেই জন্য মুখে ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন; আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে, আমায় বলিলেন, "পায়েস খাও।" আমি খাইতে বসিয়াছি, তিনি বলিলেন,—"তোমায় খাওয়াইয়া দি।" আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাম। তিনি কোমল হস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন, মা যেমন চেঁচে পুঁছে খাওয়াইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচেপুছে খাওয়াইয়া দিলেন, আমি যে বুড়ো ধাড়ি তাহা আমার মনে রহিল না। আমি মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন, এই মনে হইল। যখন মনে হয়, যে অনেক অস্পর্শীয় ওষ্ঠে আমার ওষ্ঠ স্পৃষ্ট হইয়াছে, সেই ওষ্ঠে তিনি নির্ম্মল হস্তে পায়েস দিয়াছেন, তখন যেন আত্মহারা হইয়া ভাবি, এ ঘটনা কি সত্য হইয়াছিল না স্বপ্নে দেখিয়াছি! একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি দেবদৃষ্টিতে আমাকে উলঙ্গ বালক দেখিয়াছিলেন। সত্যই আমি তাঁহার নিকট গিয়া যেন নগ্ন বালকের ন্যায় হইতাম। যে সকল দ্রব্য আমার রুচিকর, তিনি কিরূপে জানিতেন, তাহা আমি জানি না, সেই সকল দ্রব্য আমাকে সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইতেন, স্বহস্তে আমাকে জল ঢালিয়া দিতেন। আমি বর্ণনা করিতেছি মাত্র, কিন্তু আমি তাঁহার স্নেহ প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি না জানি না। বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ অনুভব হইতেছে না, সম্পূর্ণ অনুভব হইলে যাহা বলিতেছি বলিতে পারিতাম না, কচিৎ কখনো সে ভাব উদয় হইলে জড় হইয়া যাই।

তাঁহাকে পরম আত্মীয় জানিয়াছি, কিন্তু সংস্কার-বন্ধন অতি দুশ্ছেদ্য। একদিন থিয়েটারে মত্ততা বশতঃ কতই অকথ্য কথনে তাঁহাকে গালি দিলাম। তাঁহার ভক্তেরা কুপিত হইয়া আমাকে শাস্তি দিতে উদ্যত, তিনি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন; আমারও তত কবিতার মুখ চলিতেছে, আমি তাঁহাকে জেদ করিয়া ধরিয়াছি—"তুমি আমার ছেলে হও।"

তিনি বলেন,—"কেন, তোর গুরু হবো ইষ্ট হবো।" আমি বলি,—"না, তুমি ছেলে হও!" তিনি বলেন—"আমার বাপ অতি নির্ম্মল ছিলেন, আমি তোর ছেলে কেন হইব।" আমার মুখের তোড় যত দূর চলে চলিল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া গেলেন।

আমার মনে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আদুরে গোপাল বয়াটে ছেলে যেরূপ বাপকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও পরমহংসদেবের আদরে বয়াটে ছেলের মত কার্য্য করিয়া নির্ভয়ে রহিলাম। অনেকে অনেক বলিতে লাগিল, কার্য্য ভাল হয় নাই ক্রমে বুঝিলাম, কিন্তু তত্রাচ পরমহংসদেবের স্নেহের উপর আমার এত নির্ভর, তাহার স্নেহ এত অসীম যে, তিনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন, এ আশঙ্কা একবারও জন্মিল না। দক্ষিণেশ্বরে অনেকেই তাঁহাকে বলিতে লাগিল যে, "ওরূপ অসৎ ব্যক্তির নিকট আপনি যান!" কেবল একমাত্র ৺রামচন্দ্র দত্তই বলিয়াছিলেন—"মহাশয়, ও আপনাকে পূজা করিয়াছে; কালীয় নাগ ভগবানকে বলিয়াছিল যে, আপনি আমাকে বিষ দিয়াছেন, আমি কোথা হইতে সুধা আপনাকে দিব! গিরীশ ঘোষকেও যাহা দিয়াছেন, সে তাহাই দিয়া আপনাকে পূজা করিয়াছে।" পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—"শোনো শোনো, রামের কথা শোনো।" আবার অনেকেই আমার নিন্দা করিতে লাগিল। প্রভু বলিলেন,—"গাড়ী আনো, আমি গিরীশ ঘোষের বাড়ী যাইব।"

স্নেহময় পরমপিতা আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যজ্য পুত্র করে, সে অপরাধ আমার পরমপিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী আসিলেন, দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু দিন দিন অন্তর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি স্নেহময় সম্পূর্ণ ধারণা রহিল, কিন্তু নিজ কার্য্যের আলোচনায় আপনি লজ্জিত হইতে লাগিলাম, ভক্তেরা কত প্রকারে তাঁহার পূজা করে ভাবিতে লাগিলাম, আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। ইহার কিছু দিন পরে ভক্তচূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় প্রভু উপস্থিত হইলেন, আমিও তথায় উপস্থিত। চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছি, তিনি ভাবাবেশে বলিলেন,—"গিরীশঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্‌নে, তোকে দেখে লোক অবাক্ হয়ে যাবে।" আমি আশ্বস্ত হইলাম।

একদিন পদসেবা করিতে দিয়াছেন, আমি বেজার, ভাবিতেছি, কি

আপদ্, কে বসে এখন পায়ে হাত বুলোয়!" সে কথা যখন মনে হয়, আমার প্রাণ বিকল হয়ে উঠে, কেবল তাঁহার অসীম স্নেহ স্মরণ করিয়া শান্ত হই।

পীড়িত অবস্থায় আমি দেখিতে যাইতাম না। কেহ যদি বলিত, অমুক দেখিতে আসে না, তিনি অমনি বলিতেন, "আহা, সে আমার যন্ত্রণা দেখিতে পারে না।"

তাঁহার শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য্য কৌশল, [illegible] আমার প্রকৃতিগত এই যে, যে কার্য্য কেহ নিবারণ করিবে, সেই কার্য্য আগে করিব। পরমহংসদেব এক দিনের নিমিত্ত আমার কোনও কার্য্য করিতে নিষেধ করেন নাই; সেই নিষেধ না করাই আমার পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে। অতি ঘৃণিত কার্য্য মনে উদয় হইলে আমার পুরুষ প্রকৃতিকে প্রণাম আসে, সে স্থলে পরমহংসদেব উদয়! কোথাও কোন [illegible] আলোচনা হইলে পরমহংসদেবের কথায় [illegible] ভাবানুকে মনে পড়ে। তিনি মিথ্যা কথা কহিতে সকলকে নিষেধ করিতেন; আমি বলিলাম—"মহাশয়, আমি তো মিথ্যা কথা কই, কিরূপে সত্যবাদী হইব?" তিনি বলিলেন—"তুমি ভাবিও না, তুমি আমার মত সত্য-[illegible] পার।" মিথ্যা কথা মনে উদয় হইলে, পরমহংসদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাই, আর মিথ্যা বাহির হইতে চাহে না। সাংসারিক [illegible] চক্ষুলজ্জায় দু'একটা এদিক ওদিক কথা কহিতে হয়, কিন্তু আমি যে মিথ্যা বলিতেছি, তাহা জানান দিবার বিশেষ চেষ্টা থাকে। পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী, সে অধিকার তাঁহার স্নেহের! এ স্নেহ অতি আশ্চর্য্য! তাঁহার কৃপায় যদি আমার কোনও গুণ বর্ত্তিয়া থাকে, লোকের কাছে সে গুণ-গৌরব যেন আমার তিনি কেবল আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তের মধ্যে যদি কেহ বলিত—"আমি পাপী,"—তিনি শাসন করিতেন, বলিতেন—"ও কি, পাপ কিসের? আমি কীট—আমি কীট বলিতে বলিতে কীট হইয়া যায়, আমি মুক্ত—আমি মুক্ত—এ অভিমান রাখিলে মুক্ত হইয়া যায়। সর্ব্বদা মুক্ত অভিমান রাখো, পাপ স্পর্শ করিবে না।"

এতক্ষণ আমার অন্তরের কথা বলিতেছিলাম। বলিয়াছি, অন্যের অন্তরের কথা কি জানিব, কিন্তু দেখিয়াছি, কোনও ভক্তের ছিন্ন বস্ত্র দেখিলে

তাঁহার চক্ষে জল আসিত, পায়ে জুতা না থাকিলে তিনি ব্যাকুল হইতেন, যখন রোগের দারুণ যন্ত্রণা তিনি ভোগ করিতেছেন, যদি কোনও ভক্তের সে সময় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকায় আহারের বিলম্ব হইত, তিনি তাহাকে আহার না করাইয়া নিরস্ত হইতেন না। কাহারও অসুখ হইলে তিনি অস্থির। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে ঐহিক, পারমার্থিক পিতা জানিতেন। তিনিও মা-ঠাকুরাণীকে বলিতেন যে, লোকে পুত্রের কামনা করে; সকল পুত্র সুপুত্র হয় না কিন্তু তোমায় আমি কতগুলি পুত্র দিয়া যাইতেছি, সকলেই সুসন্তান। তিনি শিষ্যকে পুত্রবৎ দেখিতেন। পুত্রবৎ—এ কথায় ঠিক প্রকাশ হইল না, অন্য কথার অভাবে পুত্রবৎ বলিতেছি. সম্পূর্ণ ঐহিক-পারত্রিকের দায়িত্ব গ্রহণ যিনি করেন, তিনি কে? তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ? তিনি যে মুক্ত অভিমান রাখিতে বলিতেন, এই সম্বন্ধ বিচার করিলেই, এ মুক্ত অভিমান আপনিই আসে। মৃত্তিকার দেহে যেন আর আত্মা আবদ্ধ থাকে না, চিত্তের মালিন্য দূর হয়। কাম-ক্রোধাদি দুর্দ্দমনীয় রিপু অন্তর্হিত হয়, কোনও সাধন-ভজনের প্রয়োজন থাকে না, কেবল তাঁহার বিমল স্নেহের উপলব্ধিই মুক্তি! উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব—উপলব্ধিই মানবজীবনের চরম অবস্থা! এই অকিঞ্চনের সেই স্থায়ী উপলব্ধি হউক, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব।*

(শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ স্যান্যাল।)

আমরা সকলে যাঁর নামে আকৃষ্ট হয়ে আজ এখানে একত্র সমবেত হয়েছি, সেই ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবকে আমার অল্প বুদ্ধিতে যে টুকু বুঝ্‌তে সক্ষম হয়েছি, তার কিঞ্চিৎ আপনাদের বল্‌ব। উদ্দেশ্য—ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনের দ্বারা নিজেদের বাক্য মন নির্ম্মল ও পবিত্র করা। ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তন সম্বন্ধে যেমন বলেছেন,—

---

* পরমহংসদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৬ই চৈত্র বেলুড় মঠে আহূত সভায় এই বক্তৃতা পঠিত হয়।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।"

অথবা মহাপুরুষচরিত আলোচনা করে নিজ নিজ জীবন সেই ভাবে পরিচালিত কর্তে শিক্ষা কর্লে কৃতার্থ হব, এই জন্য।

পরমহংসদেবের নিকট যাবার আগে আমার মনের যে অবস্থা ছিল, তার কিঞ্চিৎ আভাস এখানে না দিলে তাঁর কাছে গিয়ে যে শান্তি ও আনন্দ লাভ করেছি, সেটা বুঝা বড় কঠিন হবে ; এজন্য প্রথমে সে বিষয় কিছু বল্লে বোধ হয় মন্দ হবে না। হিঁদুর ছেলে—ছেলেবেলা হতেই ধর্ম্মের উপর একটা টান ছিল। ধর্ম্মব্যবসায়ী লোক পেলেই তার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও বাদানুবাদ করা যেত, কিন্তু প্রাণের পিপাসা কারও দ্বারা মিট্‌ত না। বরং যতই অনুসন্ধান কর্‌তাম, ততই চারিদিকে গোল ও প্রতারণা দেখ্‌তাম। মনের সন্দেহ মিটাবার ও একটু শান্তি পাবার জন্য ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতিতে পারদর্শী ব্যক্তিদের এবং শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাচার্য্যদের সঙ্গে মিশ্‌তে লাগ্‌লাম, দেখ্‌লাম, ইহাঁরা সকলেই এক রকম উপদেশ আমাদের করেন আর নিজেরা আর এক রকমে চলেন। এখনকার নবীন সমাজ সকলেও ঢোক্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম, দেখ্‌লাম, সেখানেও এইভাব। এইরূপ চেষ্টায় দিনের পর দিন যেতে লাগ্‌লো কিন্তু প্রাণ যা চায় তার কিছুমাত্রও কোন যায়গায় পেলেম না। মনে অশান্তির স্রোত ক্রমেই বৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো ও ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বত্রই জুয়াচুরি ফাঁকি—এই ধারণা প্রবল হয়ে উঠ্‌লো। সুবিধা পেয়ে পাজি মনও চুপে চুপে কাণে কাণে বল্‌তে লাগ্‌লো, কেন মিছে কল্পনা নিয়ে ঘুরে মরিস্? ধর্ম্ম কর্ম্ম মাগি ও বোকা ভোলাবার জন্য ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, এত দেখেও একথা বুঝ্‌লিনে আর যদি ভগবান্ বলে কেউ থাকেন তো তাঁকে ধরা কি মানুষের কাজ? আদার ব্যাপারি জাহাজের খবরে কাজ কি বাবা? খা দা মজা কর্ আর নিজের ও পরের শান্তির জন্যে 'চুরি করো না' 'পরদার করো না' ইত্যাদি নীতিকথাগুলো অন্ততঃ বাহ্যিক মেনে চল্। এমন সময় একদিন আমার একটী পরমাত্মীয় বেদান্তবিৎ ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে অনেক বাদানুবাদ হলো। তিনি সস্নেহে বল্লেন, "বাপু, আমরা ধর্ম্মাচার্য্য নহি, আমাদের ধর্ম্মজীবনও নাই, আমরা ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র। অন্যান্য ব্যবসাদারের মত দুই

চারটে বাঁধা গৎ লোককে শুনিয়ে দু পয়সা করে খাই, এই জেন। তোমার মতন আমারও একদিন গেছে, তখন আমিও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে অনেক ঘেঁটেছি, অনেক ঘুরেছি; এই কলকেতা হতে আরম্ভ করে কুরুক্ষেত্র পর্য্যন্ত নানা স্থানে খুঁজে বেড়িয়েছি। আমারও ভাগ্যে কোথাও একজন প্রকৃত সাধু মহাপুরুষের দর্শন ঘটে নি। বোধ হয় সময় না হলে হাজার খুঁজ্‌লেও কারুর ভাগ্যেই তাহা হয় না আবার ঠিক ঠিক সময় হলে ঘরে বসেই তাঁদের পাদপদ্মের দর্শন পাওয়া যায়। এর ভিতর এমনি একটা কিছু নিয়ম আছে কিনা ঠিক বল্‌তে পারিনি তবে আমার এমনি বোধ হয়; কেন না আমিও যখন তোমার মতন প্রায় নাস্তিক হয়ে সংসারে একেবারে ডুব্‌তে বস্‌ছিলাম, সেই সময়ে এই কল্‌কেতারই পাশে দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির কালিবাড়ীতে এক মহাপুরুষের পুণ্য দর্শন পেলাম। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাঁকে তো অবতারতুল্য লোক বলে ধারণা হয়েছে। যদি ধর্ম্ম জান্‌তে চাও বা লাভ কর্‌তে চাও তো সেই মহাপুরুষের কাছে যাও, সিদ্ধমনোরথ হবে।"

তাঁর কথাগুলি শুন্‌লাম বটে কিন্তু পূর্ব্বে অনেক যায়গায় ধাক্কা খাওয়াতে সহসা দক্ষিণেশ্বরে যেতে রুচি হলো না, ভাব্‌লুম, নেড়া আর কবার বেলতলায় যায়? আবার কোন্ জোচ্চোরের পাল্লায় পড়্‌বো, ভাব্‌লাম, আগে বেশ করে খোঁজ নিই, তার পর যাব। খোঁজ নিয়ে মনে হলো, এখানে কিছু থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে, কেন না, যারা তাঁর কাছে গিয়েছিলো, তারা সকলেই ঐরূপ একভাবের কথাই বল্‌তে লাগ্‌লো, তখন ভাব্‌লাম, কবার নিজের চক্ষে না দেখ্‌লে কিছু হচ্ছে না। এইরূপ ভেবে চিন্তে একদিন পরমহংসদেবের এক প্রিয় সন্তানের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর দর্শনে গেলাম। কিন্তু সে পবিত্র মূর্ত্তি দেখে জীবন যে এতদূর পরিবর্ত্তিত হবে, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

দেখ্‌লাম এক অদ্ভুত মানুষ—বয়স্ক হলেও বালকের মত স্বভাব—রাঙ্গা টুকটুকে ঠোঁট ও ভাবে ঢুলঢুলে দুটী চোখ, মুখমণ্ডলে অপরূপ জ্যোতি, যেন আনন্দঘনমূর্ত্তি—সে অদ্ভুত ছবি দেখে সহসা গীতার পরম পুরুষের বর্ণনা মনে উদয় হলো,——

"কবিং পুরাণমনুশাসিতারঃ অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥"

ভাব্‌লাম, ইনি কি সেই পুরুষ অথবা সেই পুরুষের নিরন্তর চিন্তায় আত্মহারা হয়ে ইনি এইরূপ আনন্দসাগরে ভাস্‌ছেন ডুব্‌ছেন আবার মাঝে মাঝে উঠ্‌ছেন আর খেলা কর্‌ছেন? মানুষ হয়েও এ কি অমানুষ ভাব, জগতের মধ্যে থেকেও একি জগৎছাড়া ভাব! জন্মাবধি নিজের বংশ-মর্য্যাদা, নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, নিজের যাহা কিছু সব বড় দেখ্‌তেই শিখেছিলাম, অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত এ পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রণাম করেছি কিনা মনে পড়ে না কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ ও ভাব দেখে অহঙ্কার শতধা চূর্ণ হয়ে গেল—প্রাণ মন মোহিত হয়ে তাঁকে আপনার হতেও আপনার বলে বোধ হলো—বিচারবুদ্ধি কোথায় ছুটে পালাল। পতঙ্গ যেমন রূপ দেখে পাগল হয়ে আগুনে ঝাঁপ দেয়, আমার মনেরও সেই দশা ঘট্‌ল আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের গর্ব্বিত মস্তক তাঁর আলোকময় চরণে নত হয়ে পড়্‌ল। কি কর্‌ছি তা জান্‌বার আগেই প্রণাম করে ফেল্‌লাম এবং প্রভুও অতি আদরের সহিত আমাকে তাঁর সম্মুখে বস্‌তে বল্‌লেন।

আমি বস্‌লাম। সেই দিব্যমূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, ইনি আমাকে এত আদর কর্‌ছেন কেন? আমি নাস্তিক—সংশয়াত্মা। ইঁহার পবিত্র প্রেমের কিসে যোগ্য হলাম অথবা প্রাণের ব্যাকুলতায় যে এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি কোথাও আশ্রয় পাই নাই, তা কি ইনি বুঝ্‌তে পেরেছেন? তা বুঝে কি এত দয়া কর্‌ছেন অথবা প্রেমস্বরূপ ভগবান্‌কে ভেবে ভেবে ইনিও তাই হয়েছেন? শুনেছি, প্রেমই ভগবানের স্বরূপ; এই প্রেমের ভরেই অনন্ত জগতের সৃজন-পালন ও সংহার হয়, এই প্রেমের রজ্জুতে বদ্ধ হয়ে জীব ও গ্রহনক্ষত্রাদি সব নিজ নিজ পথে চলে থাকে, কেউ কারও সহিত দ্বন্দ্ব না করে কেবল পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে। তাই বুঝি জগৎকে প্রেম শেখাবার জন্য ভগবান্ তাঁর বিশ্বপ্রেম ঘনীভূত করে এই দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছেন! নামটিও কি ঠিক ইঁহার অনুরূপ হয়েছে! পরমহংসশব্দে "সোহং পরমঃ" আমিই সেই পরমাত্মা ইহাই বুঝায়। জগতের কোন ঘটনাটি যখন বিনা কারণে হয় না, তখন এ জ্যোতির্ম্ময় প্রেমঘন মূর্ত্তি প্রকাশের বিশেষ কারণ নিশ্চয় আছে—আমার মত পথহারা মানবকে সন্দেহসাগর হতে উদ্ধার করে ধর্ম্মের উজ্জ্বল পথ ও

আদর্শ দেখানই কি ইঁহার আবির্ভাবের কারণ? এইরূপ নানা চিন্তা মনে উদয় হতে লাগ্‌ল এবং সে শ্রীমুখের কথা যতই শুন্‌তে লাগ্‌লাম, ততই তাঁর দিকে আকৃষ্ট ও মোহিত হয়ে পড়্‌লাম। কোথা দিয়া সে দিনটা চলে গেল, তা টেরও পেলাম না। দিনান্তে তাঁরই ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে তাঁর সুমধুর কথা ও অপূর্ব্ব আদর যত্নের বিষয় ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ী ফির্‌লাম। বিদায় কালে পুনরায় তাঁর নিকট আস্‌বার জন্যে তিনি যে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন, তা মনে করে প্রাণে অপার আনন্দ হতে লাগ্‌ল।

পূর্ব্বেই বলেছি, প্রথম দর্শনেই আমার তাঁকে বড়ই আপনার বলে বোধ হয়েছিল—যেন তাঁর সঙ্গে কতদিনের পুরাতন সম্বন্ধ! সে ধারণা দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌ল; একটু অবকাশ পেলেই তাঁর কাছে ছুটে ছুটে যেতে লাগ্‌লাম, কিন্তু যতই তাঁর সহিত পরিচয় হতে লাগল, ততই তাঁকে আরও নূতন বলে মনে হতে লাগ্‌ল এবং আমার প্রতিও তাঁর আদর যত্ন নিত্যই নূতন আকার ধারণ কর্‌তে লাগ্‌লো। পরকে আপনার করে নিতে এমন আর কেউ জান্‌ত না—আপনার ভেবে তাঁর জীবনের কত কথাই না আমাকে বল্‌তেন, আমিও সে ভালবাসার আকর্ষণে যত কিছু প্রাণের কথা সব তাঁকে বলে ফেল্‌তাম, একটুও সঙ্কোচ হত না। জান্‌বার, বোঝ্‌বার আগেই দেখ্‌লাম, তাঁর প্রেমফাঁদে ধরা পড়েছি। এ বিষয়ে আমারই বা দোষ কি? তাঁর সে অপরূপ ভাব, সে পুরুষত্বের কঠোর বীর্য্যের সঙ্গে স্ত্রীসুলভ কোমলতার একাধারে মিলন, সে দৃঢ়তা ও লালিত্য, গাম্ভীর্য্য ও চাপল্যের একত্র অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য প্রকাশ দেখে কেহ যে স্থির থাকৃতে পারত, ইহা আমার বোধ হয় না। আমার জীবনে ভালবাসার ঘরে বিধাতা শূন্য লিখেন নাই। সংসারে বাপ মা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধুবর্গ প্রভৃতির ভালবাসা আজন্ম পেয়েছি কিন্তু এমন স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসা আর কোথাও পাই নাই। প্রভুর ভালবাসার কাছে আর সকলের ভালবাসা তুচ্ছ হয়ে যায়, ঠাঁই পায় না। এ ভালবাসা কেউ দেখেনি, শুনেনি, অনির্ব্বচনীয় মূকাস্বাদনবৎ। গেলে যেন প্রভু আকাশের চাঁদ হাতে পেতেন—এমনি ভাবে আদর, কথাবার্ত্তা, খাওয়ান, রঙ্গরস করতেন। বাইবেলে পড়েছিলাম যে, God is Love, Love is God; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভালবাসা পেয়ে

সে কথার মানে এখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম। বোধ হয় যিনিই তাঁর কাছে গেছেন, তিনিই তাঁর এই বিশুদ্ধ ভালবাসাতে মোহিত হয়ে বাঁধা পড়েছেন।

আমার স্মরণ আছে, তাঁর উপদেশ শোন্‌বার জন্য যত না হোক্, তাঁর কাছে থাক্‌বো তাঁকে দেখ্‌বো, এই জন্যই আমি তাঁর কাছে যেতুম। তাঁর কাছে থাকি বা না থাকি, মাঝে মাঝে তাঁর উপদেশ শুন্‌তে পেলেই হল—একথা কেউ বল্‌লে মনে হতো যে, এ সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিচ্ছে। আমার মনে হতো, উপদেশ যত দিন্ বা না দিন্, ইনি হাঁস্থন্ খেলুন, আমি প্রাণ ভরে দেখি। মনে হতো, কথা এ কান দিয়ে শুন্‌বো, ও কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে কিন্তু এ আনন্দ-ঘন-রূপ দর্শনে হৃদয়ে দাগ পড়ে যাবে, তার আর যাবার যো নাই। এ মনোহর বালকের ন্যায় নৃত্য মন কখনই ভুল্‌তে পার্‌বে না। আর অবাক্ হয়ে দেখ্‌তাম তাঁর অমানুষত্যাগ—ত্যাগ ত্যাগ ভেবে মন থেকে কামকাঞ্চন এমনি ত্যাগ হয়ে গিয়েছিল যে, টাকা কড়ি স্পর্শ করা দূরে থাকুক্, পিতল কাঁসার গাড়ু ঘটি অবধি ছুঁতে পার্‌তেন না—ধর্‌লে হাত বেঁকে যেতো। এমন কি, ঘুমন্ত অবস্থায়ও ধাতু স্পর্শ করালে অমনি হাত আড়ষ্ট হয়ে যেতো।

আর দেখ্‌তাম—তাঁর সত্যনিষ্ঠা। জগতে এরূপ সত্যপালন দেখার কথা দূরে থাক্, কেউ কখনও শুনেছে কি না জানি না। রামায়ণে পড়েছিলাম, পিতৃসত্যপালনে শ্রীরামচন্দ্র বনে যান—কথাটা কত আশ্চর্য্য মনে হতো। চক্ষে যাহা দেখ্‌লাম, তাহা পূর্ব্বের পড়া ছাপিয়ে গেল। কত দিন দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাত খেতে খেতে খাব না বল্‌বামাত্র বহু চেষ্টাতেও আর হাত মুখে উঠে না, কাঠ মেরে গেল; কাজেই খাওয়া সাঙ্গ কর্‌তে হলো, তার পর খানিক বাদে খিদেয় অস্থির। এমন অবিশ্রান্ত কর্ম্ম কর্‌তেও কাহাকেও দেখি নাই—সকাল হতে রাত দশটা অবধি লোকের সঙ্গে কথা উপদেশ রঙ্গরস কীর্ত্তন নৃত্য ভাব ইত্যাদি, যাতে সমাগত লোকের কল্যাণ হয়। এক এক দিন খেতে পর্য্যন্ত সময় হতো না, তাড়াতাড়ি পাঁচ মিনিটে খেয়েই আবার কথা গান ইত্যাদি আরম্ভ হতো, বিশ্রামের লেশ মাত্র ছিল না। বল দেখি, এমন কর্ম্মবীর কেউ দেখেছ কি?

তাঁর সমাধি আবার এক অদ্ভুত ব্যাপার—ভগবৎকথাপ্রসঙ্গে মুহুর্মুহুঃ আত্মহারা হয়ে যেতেন, বাহ্য জগৎ থেকে সমস্ত মন গুটিয়ে যেন ভিতরে ঢুকে যেত—বাহ্যজ্ঞান কিছুমাত্র থাকৃত না—শরীর চিত্রপুত্তলিকার মত স্থির হয়ে থাকৃত, তার কোন কার্য্যই থাকৃত না, এমন কি, অনেক সময়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস নাড়ীর গতি ও হৃদয়ের আঘাতও বন্ধ হয়ে যেত। কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ তন্ময় হলেই ঐরূপ গভীর সমাধির লক্ষণ দেখা দিত। ঐরূপ সমাধি অবস্থায় একদিন একটা জ্বলন্ত গুলের উপর পড়ে যান্—চামড়া পুড়ে গুলের খানিকটা শরীরের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল, তবুও টের পান নাই। শেষে ডাক্তার ডাকিয়ে সেটা বার করে ঔষধ দিতে হয়েছিল। সে পোড়া দাগ্‌টা তাঁর পিটের ডান্‌দিকে বরাবর ছিল।

যাঁকে দেখ্‌লেই মন আপনা হতে গলে যেত, আর যাঁর কৃপায় কত পাষণ্ডকে ভক্তিমান্ হতে দেখেছি, তাঁতে যে ভক্তি কতদূর বা কি ভাবে খেল্‌তো, সে সম্বন্ধে আমি আর কি বল্‌তে পারি? তবে বৈষ্ণব শাস্ত্রে অশ্রু, কম্প, পুলক ইত্যাদি ভক্তির যে সব মহাভাবের লক্ষণ পড়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবেতে সেই সব লক্ষণ প্রতিনিয়তই দেখা যেত। আমি অজ্ঞানী, জ্ঞানের ধার ধারি না, তখন আত্মারাম ভগবান্ রামকৃষ্ণের জ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্রও পরিমাণ কেমন করে কর্‌বো? অবশ্য আমার মতন চার কড়ার জ্ঞান তাঁর ছিল না। দেখেছি, তিনি জ্ঞানবলে সকলকে আপনার অঙ্গ বলে বোধ কর্ত্তেন এবং সকলের ভিতরেই সেই একের প্রকাশ দেখ্‌তেন। কত মূর্খ, পণ্ডিত, সাধু, অসাধু তাঁর পাদস্পর্শে তাঁর কৃপাকণা পেয়ে ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে গেল—দেখ্‌লাম। ইহাতেই বুঝে লও।

একদিন সাহস করে প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম্, "মহাশয়, তপস্যা বা সাধনটা কি? এবং আপনিই তপস্যা ও সাধন কেনই বা এত কর্‌লেন?" হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্লেন—"কোন উদ্দেশ্য বা অভীষ্টবিশেষ লাভ কর্‌বার জন্যে মনের যে একান্ত চেষ্টা, তাকেই তপস্যা বা সাধন বলে। এতে শরীর বা ভোগবিলাসের দিকে মোটে নজর থাকে না। যেমন একজন ছিপ্ ফেলে মাছ ধর্‌ছে, ফাতনায় মাছ লেগেছে, কিন্তু এ দিকে ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি হচ্ছে আবার একজন লোক কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছে, কিছুতেই তার মন নেই; যখন মাছটা গাঁথা হলো, তখন ছাতাটা খুলে মাথায় দিলে আর লোককেও জবাব দিলে। তপস্যা সাধন বিনা ব্রহ্ম-

বস্তু লাভ হয় না। সামান্য টাকা আন্‌বার বিদ্যার একটা পাস কর্‌তে গেলে কত চেষ্টা তপস্যা চাই—দিন রাত পড়্‌তে হয়, খাওয়া দাওয়ায় ভ্রূক্ষেপ থাকে না, তবে হয়। তা ব্রহ্মবিদ্যা বা ঈশ্বর লাভ কর্‌তে হলে কতগুণ বেশী চেষ্টার দরকার! ইহাতেই বোঝ।

"তপস্যাই হচ্ছে সকল বলের মূল—'বলং বলং তপোবলং।' এমন যে ভগবান্—শাস্ত্রে বলে, তিনিও সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্‌বার জন্য অনাদি কাল হতে নারায়ণ ঋষি হয়ে তপস্যা কর্‌ছেন—তা আমাদের কথা আর কি। আমার ওপর দিয়ে বারবছরব্যাপী একটা তপস্যার যেন ঝড় বয়ে গেছে—শীত বর্ষা তাত সব গায়ের উপর দিয়ে গেছে, ঢেলা জমীতে এক যায়-গায় বসে থাকতুম, হুঁস থাক্‌তো না, চখের পলক পড়্‌তো না, বিভোর হয়ে থাক্‌তাম, পীঠে রুল পিটে একটু চৈতন্য করে খাওয়াত, আবার খেতে খেতেই অঘোর। কখনও কখনও তাঁকে পেয়ে খুব হাঁসি; আবার কখন বা অদর্শনে খুব কান্না—শুনেছি লোক দাঁড়িয়ে যেত তামাসা দেখ্‌বার জন্যে। আবার কখনও বা সংজ্ঞাহীন হয়ে কাট মেরে যেতুম্। ধ্যান কর্ত্তুম, জড় জিনিষ মনে করে মাথায় পাখী এসে বসতো শুনেছি; জগৎ টগৎ এসব কিছুই খেয়াল ছিল না। প্রথমে তিনি উপাস্য, আমি উপা-সক এইভাবে ধ্যান কর্‌তুম। তার পর সব একরস হয়ে গেল। আমিই তিনি তিনিই আমি, এইভাব এসে গেল।

"শাস্ত্রে বলে, এই ভাবে চব্বিশদিন থাক্‌লে শরীর ছেড়ে যায় কিন্তু ওই যে মেরে মেরে মাঝে মাঝে খাওয়াত, তাই শরীরটা রয়ে গেল। প্রায় ছয়মাস পরে ও ভাবটা চলে গেল। তার পর সাধ হল—মা তোকে নানাভাবে উপাসনা কর্‌বো। শুন্‌লাম, হনুমানের ঠিক ঠিক দাস্যভাব ছিল, তাই তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে পেয়েছিলেন; আমিও শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাব বলে কিছুদিন ঐভাবে রইলাম—সীতারাম দেখ্‌লাম। গোপীভাবে ভাবনা করে রাধাশ্যাম পেলাম, বালকভাবে মা মা করে জগন্মাতা আদ্যাশক্তি মা কালীকে দেখ্‌লাম। শান্তভাবে ধ্যান করে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়ে গেল—তিন-দিনে ব্রহ্মদর্শন হলো। আমার গুরু 'ন্যাংটা' তাই দেখে বলেছিল 'এ কি দৈবীমায়া, তিনদিনে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হলো—আমি যা চল্লিশ বৎসর সাধনের ফলে লাভ করেছি।' তার পর আল্লার ধ্যান করে তাঁকে পেলাম, যীশুকেও দেখ্‌লাম। ইস্তক গোকর্ম হতে আরম্ভ করে ৬৪খানা তন্ত্রের সাধন সব করেছি।

আমি বল্‌লাম, "মহাশয়, এসব তো শুন্‌লাম, কিন্তু এতটা আড়ম্বর কেন, এত ভাবে সাধন কর্‌বার কি দরকার ছিল?" অমনি বালকের ন্যায় ছল ছল চক্ষে বল্‌লেন—"ওরে সব তোদের জন্যই করেছি, নইলে আমার দরকার কিছুই নাই"—বল্‌তে বল্‌তে সমাধিস্থ হলেন। সমাধি ভঙ্গ হলে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে গদ গদ ভাবে বল্‌লেন—"জীব, আমি তোমাদের জন্য এতটা করলুম, তোমরা আমার জন্য এক পাই কর।" তার পর চৈতন্য হয়ে হাঁস্‌তে হাঁসতে বল্‌লেন—"ওরে সকলকেই কি আর রাঁধ্‌তে হয়, গিন্নি তো রেঁধে রেখেছে, বাড়া ভাত, বিশ্বাস কর্‌, খা, আর আনন্দ কর্‌।" মনে মনে ভাব্‌লাম, শাস্ত্রে ভগবানের একটি নাম "অহেতুকদয়াসিন্ধু" পড়েছি, এ যে প্রত্যক্ষ তাই দেখ্‌ছি—নইলে দেহ ধরে কেনই বা এত কষ্ট সহ্য কর্‌বেন।

আবার গম্ভীর ভাবে প্রভু বল্‌লেন—"দেখ্‌, লোকশিক্ষার জন্যও এ সব সাধন করা দরকার। আমি ষোল টাং করেছি, তোরা না হয় এক টাং কর"। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"মহাশয়, ভগবদ্বিষয় বল্‌তে বল্‌তে বা শুন্‌তে শুন্‌তে ঐ যে কি একরকম কাঠ মেরে যান, কিন্তু মুখ আনন্দে ভরা, হাঁসি ধরেনা, গায়েও জ্যোতি বেরোয়—ও ভাবটার নাম কি আর ও অবস্থায় আপনি কি অনুভব করেন?" এবার হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্‌লেন—"দেখ্‌, ওর নাম সমাধি, ওটা ধ্যানের চরম অবস্থা। ষোল আনা মনের এক আনা ভাগ মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তোদের সঙ্গে হাসিখুসি কথাবার্ত্তা কই; কিন্তু বাকী পনের আনা মন মার কাছে, তাঁর অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ধ্যানে থাকে। তাঁর বিষয় বল্‌তে বল্‌তে বা শুন্‌তে শুন্‌তে সব মনটা যেই একেবারে সেই অখণ্ডে যায়, অমনি ঐ ভাব-সমাধিটা হয়।

"সমাধি কি জানিস্‌? তাঁতে সম্যক্‌রূপে অধিগমন। আমার তখন কেমন বোধ হয় জানিস্‌? যেন সমুদ্রের পাড়ে এক গামলা জলে একটা মাছকে আটক করে রেখেছে, দৈবাৎ গামলা ভেঙ্গে গেলে মাছ যেমন আবার অগাধ সমুদ্রে পড়ে আনন্দে খেলিয়ে বেড়ায়, তেমনি সমাধি অবস্থায় আমার মনরূপ মাছ এই দেহরূপ গামলা হতে লাফিয়ে সেই অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে যায়। তাই শরীরের ঐরূপ ভাব হয়, অর্থাৎ দেহের বোধ থাকে না ও আত্মা সহস্রারে পরমাত্মাতে মিলে গিয়ে অপার আনন্দানুভব করে। তাইতে মুখে ঈশ্বরীয় আনন্দ ও শরীরে

জ্যোতি বিকাশ হয়। এ আমিই তখন 'শিবঃ কেবলোঽহং' হয়ে যায়।"

যাঁকে দর্শন মাত্রেই আনন্দে বিভোর হযে আত্মহারা হ'তাম সেই ভগবান্ রামকৃষ্ণের শক্তির বিষয় বর্ণন কর্‌তে যাওয়া আমার পক্ষে পাগ্‌লামী মাত্র। তবে তাঁকে দর্শন কর্‌তে গিয়ে প্রতিনিয়ত যে সকল শক্তির বিকাশ অনুভব কর্‌তাম, তারই দুচারটি কথা বল্‌ব। সপ্তাহ বা পক্ষাবধি ভেবে ভেবে যে সকল যুক্তি, তর্ক বা সংশয়গুলি মনে করে রাখ্‌তাম, গিয়ে দেখি যে প্রভু হয়ত কোন একটি ছেলের সঙ্গে সেই সেই যুক্তি তর্ক ও সংশযগুলি তুলে তার মীমাংসা করছেন। কোন ভক্ত একটি থালে গুটীকতক মিষ্টান্ন রেখে তার মধ্যে চারটি প্রভুর জন্য নিবেদন করে রেখেছেন এবং বাকি গুলি অপরের জন্য রেখেছেন; প্রভু নিজ গুলি গ্রহণ করে বাকি গুলি তাকে প্রত্যর্পণ কর্‌লেন। ইচ্ছা, আশীর্ব্বাদ বা স্পর্শমাত্রেই মহা পাষণ্ড নাস্তিককেও ভক্তিতে গদগদ কর্‌তে দেখেছি; তিনি কৃপা করে ঐরূপ স্পর্শ কর্‌বামাত্র শরীর ও মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হত এবং উহা কখন ৩।৪ দিন স্থায়ী হত, ঐভাব কথায় বুঝাবার নয়। যে ভাগ্যবান্ দেখেছেন বা পেয়েছেন—তিনিই জানেন।

একদিন আমি খিদেয় বড় কাতর, প্রভু যেন জান্তে পেরে তাড়াতাড়ি করে দুটী সন্দেশ তাক হতে নিলেন, আমি ভাব্‌লাম বুঝি আমার খিদে পেয়েছে জেনে আমাকে দেবেন। কাজে কল্লেন উল্টা; ঐ দুটী প্রভু নিজে খেয়ে, আমাকে দিয়ে এক গেলাস জল ঢালিয়ে নিয়ে খেয়ে হেউ হেউ করে ঢেঁকুর তুল্‌তে লাগ্‌লেন, আর বল্লেন,—"বাপ, বাঁচ্‌লাম, শান্তি হল"। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা বল্‌ব কি—তাঁর তৃপ্তিতে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সব শান্তি হয়ে গেল। মহাভারতে পড়েছিলাম যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর রন্ধনপাত্র হতে একটু শাককণা খেয়ে সশিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্ষুধা নিবারণ করেছিলেন, আজ প্রত্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখ্‌লাম।

আমরা যেমন চিঠি ছাপিয়ে লোক ডেকে মিটীং করি ও তাইতে নিজ নিজ মত গলাবাজি করে লেক্‌চার করি, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তা কর্‌তেন না। তিনি বল্‌তেন—"মা, যদি এ শরীর দিয়ে তোর কাজ কর্‌বার জন্য আমাকে রেখেছিস্, তখন তুই মা নিজে লোক টেনে আন্ আর এ খোলের ভিতর দিয়ে তোর যা বল্‌বার ইচ্ছা তাই বল্।"

বল্‌তেন—"কামিনী আর কাঞ্চন এই দুইটী জিনিস জগৎকে একবারে মুগ্ধ করে রেখেছে, এই দুটীই ভগবান্ লাভের পথের কণ্টক, তাই আমি এই দুটীকেই বহু আয়াসে কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করেছি। কিন্তু এর ভেতর একটা মজা আছে। যদি কামিনীকে সদা মাতৃভাবে দেখ্‌তে পার, তা হলে ঐ কামিনীই তোমার সাধনপথের বাধা না হয়ে বরং সহায়তা কর্‌বে; তাই আমি জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতিকে সেই জগজ্জননী আদ্যাশক্তির অংশ বলে দেখি। আর কাঞ্চন, টাকা যদি ভগবৎসেবা বা তাঁর ভক্তপরিবার সেবার জন্য আনা নোয়া যায়, তা হলে সে কাঞ্চন তত অপকার কর্‌বে না।"

আবার বল্‌তেন—"দেখ্, ভগবান্ লাভের শ্রেষ্ঠ তপস্যা হলো সত্য, মন মুখ এক করা, অর্থাৎ যা ভেতরে ভাব্‌বি, তাই বাহিরে বল্‌বি। নইলে পেটে এক, মুখে আর—এ পাটোয়ারি বুদ্ধিতে তাঁর প্রকাশ হয় না। মন উপাসনা দ্বারা যতই নির্ম্মল হবে, ততই ভগবৎপ্রতিবিম্ব স্পষ্ট পড়্‌বে। যেমন ময়লা আর্শীতে ভাল রকম মুখ দেখা যায় না, তেমনি মলিন মনে তাঁর প্রতিবিম্বও ভাল রকম পড়ে না। তাই বলি—হরি বলে কাঁদ্,—চক্ষের জলে হৃদয়ের ময়লা যখন ধুয়ে যাবে, তখনই হরিকে পাবি; নইলে খালি নাচ্‌লে কুঁদ্‌লে কিছুই হবে না। আর উপাসনা ততক্ষণ আবশ্যক, যতক্ষণ না ভগবৎ নামে অশ্রুপাত হয়। ভগবান্ লাভের আর একটী অঙ্গ হচ্চে ত্যাগ। ত্যাগ কি জানিস্? ভগবানে অত্যন্ত ভালবাসা হলে সব আপনা হতেই ছেড়ে যায়, যেমন উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে দক্ষিণ দিক্ পেছনে পড়ে থাকে। তাই বলি, তাঁকে খুব ভালবাস্,—সতীর যেমন পতিতে টান্, ছেলের যেমন মাতে টান্, কৃপণের যেমন ধনেতে টান্, তেমনি টান্ তাঁর উপর হওয়া চাই। আর এক কথা—শরীর, মন, বাক্যের দ্বারা যা কিছু কর্‌বি, সদাই ভাব্‌বি যেন তাঁর কাজই কর্‌ছিস্। মালিক তিনি, দাস তুই। আর একটা সাধন হচ্চে—কূটস্থবৎ বুদ্ধি করে সদাই সদসৎ বিচার কর্‌বি ও সর্ব্বভূতে তাঁর বিকাশ দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌বি। ওরে, নামে বা মতে কিছু আসে যায় না। যত মত তত পথ, যত নাম সবই তাঁর; একটা মত বা একটা নামে আঁট করে থাক্, একেই বলে নিষ্ঠা।

"তার পর যোগ কাকে বলে জানিস্? ঈশ্বরে মনটা যোগ করে দেওয়ার নামই যোগ। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এ তিন পথ দিয়েই ঐ যোগ

লাভ করা যেতে পারে। কর্ম্ম কি?—ভগবানের উদ্দেশে অথবা ভগবান্‌কে নিয়ত মনে রেখে তাঁরই সন্তানদের নিষ্কাম সেবা কর্‌বারই নাম কর্ম্মযোগ। এতে সংসার-বন্ধন দূর করে মানুষকে ভগবানে মিলিয়ে দেয়। আর মিল্‌বে নাই বা কেন? রাত দিন কাজের সঙ্গে ভগবান্‌কে ভাব্‌ছে যখন, তখন ত ভগবান্ তার মধ্যে প্রকাশ হবেনই।

"দেখ্, ভক্তি আর জ্ঞান দুটি একই জিনিষ; মানুষে একথা তলিয়ে বোঝেনা বলেই গোল করে, দুটোকে আলাদা আলাদা মনে করে। ভক্তি মানে কি?—ভগবানে ভালবাসা; তাঁর সঙ্গে নানা ভাবে খেলা করা। আর ভক্ত বলেন কি—তুমি প্রভু আমি দাস, সব তুমি এবং তোমার। জ্ঞান মানেও ঐকান্তিক ভালবাসা। ভালবাসাটা এমনি ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জ্ঞানী ভগবান্ হতে একটুও তফাত থাক্‌তে চায় না, এক হয়ে যেতে চায়—তাই জ্ঞানী বলে 'সোঽহং শিবঃ কেবলোঽহং'; অর্থাৎ আমিই সেই। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন যে—প্রভু, আমি যখন দেহবুদ্ধি নিয়ে থাকি, তখন তুমি প্রভু আমি দাস; যখন জীববুদ্ধি নিয়ে থাকি, তখন তুমি পূর্ণ আমি অংশ; আর যখন আত্মা-আমি এই বুদ্ধি আসে তখন, বা সমাধিস্থ হয়ে—তুমিই আমি বা আমিই তুমি, এইরূপ একাকার বোধ হয়।

"তবে এ সব অবস্থাভেদেই হয়। যেমন মার পাঁচটি ছেলে, সকলের পেট সমান নয়, যে যেমন হজম্ কর্‌তে পার্‌বে, তাকে তেমনি ভাত লুচি বা পোলাও, মা ঠিক খেতে দেন, তা না হলে হজম হবে কেন। আর যে জিনিষ হজম হবেনা, তাতে জোরই বা হবে কেমন করে? তেমনি গুরুও সকলকে এক রকম উপদেশ দেন না। যাকে যেমন উচিত তাকে তেমনি উপদেশ দেন, আর তাই তার পক্ষে মঙ্গলের হয়; নইলে হট্ করে বা জোর করে যদি কেউ কোন ভাব ধর্‌তে যায়, তা হলে সে হটে যায়—সেই ভাবে জীবন গড়্‌তে পেরে উঠে না।

"আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে এই কলিকালে নারদীয়া ভক্তিই অর্থাৎ নামসঙ্কীর্ত্তনই প্রশস্ত, কেননা তাদের মন পাঁচ দিকে বিলিয়ে গেছে, সুতরাং তারা কেমন করে, কখনই বা জ্ঞানচর্চ্চা জপ ধ্যান বিচার কর্‌বে? কিন্তু ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মী সকলেরই পক্ষে একঘেয়ে ভাবটা বড় খারাপ, ওটা আমার আদৌ ভাল লাগে না। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভগবান্

যিনি এক হয়েও বহু হয়েছেন, তিনি যে অনন্ত ভাবের সমষ্টি ; তাঁর পূজা আমিও নানা ভাবে করি—যেমন জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, পূজা, জপ, ধ্যান, কীর্ত্তন ইত্যাদি। খালি তোমার বা আমার পছন্দসই ভাবটিই কি তাঁতে আছে আর বাকি ভাবগুলি কি ফেল্‌না, এ আমি ভাল বুঝি না। এতে তাঁকে ইতি করা হয়, মনে রেখ যে, তিনি ও তাঁর ভাবের শেষ নাই। বেদ যেমন বলেন,—'নেতি নেতি'।

"কেউ বলে ভগবান্ সাকার, আবার কেউ বলে নিরাকার ; এও তাঁকে ইতি করা। আমি বলি তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, আবার এর পারেও যা—তাও তিনি। যেমন ঘণ্টার শব্দ ঢং। ঢংটি সাকার ভাব, ঢংএর অংটি নিরাকার ভাব, আবার আওয়াজটী মিলিয়ে গেলে মনে যে একটা ভাবের উদয় হয়, সেটি সাকার নিরাকারের পারের ভাব। আবার সাকারেরও অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম। যেমন ময়রায় সন্দেশ কর্‌বার জন্য ছানা চিনি মিশিয়ে পাক করে একটি ঠাসা করেছে, তা হতে গোল্লা, মুণ্ডি, বরফি, তালশাঁস, মনোরঞ্জন প্রভৃতি নানারূপ আকার করে নানা নাম দেছে, আসল বস্তুটি কিন্তু ছানা চিনির পাক করা ঠাসা। এমনি যত রূপ বা নাম দেখ বা শোন, সে সব গুলিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-ঘন ভগবানের প্রকৃতি পুরুষ ভাবের ঠাসাতে তৈরি, সকল গুলিই তাঁর নাম, তাঁর ভাব। তিনি দূরে আছেন বলেই ছোট বা নানা রং এর দেখায়। কাছে গেলে দেখ্‌বে বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময়।

"ব্রহ্মশক্তি কি শুন্‌বে ?—বল্‌বার যো নাই ; বোঝ্‌বার যো নাই ; বাক্য মনের অতীত যিনি, তাঁকে কি করেই বা আমি বল্‌ব আর কি করেই বা তুমি বুঝ্‌বে। তবে উপমাচ্ছলে বলি শোন। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। তিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যেমন আগুন ও তার দাহিকাশক্তি অভেদ। আগুন যেন ব্রহ্ম, দাহিকাশক্তি তেজ তার শক্তি। অথবা সাপ স্থির হয়ে আছে, আর সাপ চল্‌ছে ; যখন স্থির ভাব তখন ব্রহ্ম, আর যখন কার্য্য বা গুণ প্রকাশের ভাব, তখনই শক্তি।"

এখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের কারণ এবং তাঁর দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মমতের নূতনত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা কর্‌ব। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, যথার্থ ধর্ম্ম বস্তুটি নিত্য সনাতন পদার্থ। ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট বস্তু শ্রীভগবান্ যেমন সনাতন, তদ্রূপ যা তাঁর স্বরূপ প্রকাশ

করে এবং মানবজীবনের সহিত তাঁর সম্বন্ধ নির্ণয় করে দেয়, সেই সকল ধর্ম্মমতও যে সনাতন, ইহা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। এই জন্যই হিন্দুরা বেদনিবদ্ধ জ্ঞানরাশি সৃষ্টির পূর্ব্ব হতে বর্ত্তমান বলে বিশ্বাস করে। এইরূপে যথার্থ-ধর্ম্ম নিত্য একরূপ হলেও দেশ কাল এবং তাৎকালিক মানবজীবনের ধারণাশক্তিভেদে সেই সময়ের অনুরূপ ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কালে কালে নব নব ভাবে প্রচারিত শ্রীভগবানের পূর্ণ স্বরূপের অংশ মাত্র প্রকাশকারী এই সকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মই শাস্ত্রে যুগধর্ম্ম বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এবং যে যে মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এই যুগধর্ম্ম-নিচয়ের প্রকাশ হয়ে থাকে, তাঁহাদিগকেই মনুষ্যসমাজ অদ্যাবধি ঈশ্বরমূর্ত্তির অবতার বলে পূজা করে আস্‌ছে। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে যুগধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এইরূপ আলোচনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নূতন প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্ম কিছুকাল মনুষ্যসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে থাকে কিন্তু দেশকাল এবং মনুষ্যমনের ভাব পরিবর্ত্তিত হলে, পরবর্ত্তী কালে আর সেরূপ কার্য্যকরী থাকে না। আবার ঐ কালের এবং ঐ প্রকার ভাবের অনুরূপ নূতন যুগধর্ম্মের আবশ্যকতা হয় এবং ঐ আবশ্যকতা পূরণ কর্‌বার জন্যই আবার এক নূতন ধর্ম্মমূর্ত্তি মহাপুরুষ লোকশিক্ষার জন্য আবির্ভূত হয়ে থাকেন। আমাদের শাস্ত্র বলেন—সত্যকাল হতে জগৎ এই নিয়মের অধীন হয়ে ভগবানের পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধির দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। হিন্দুশাস্ত্র অখণ্ডকালকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং আরও বলে থাকেন, এই ভিন্ন ভিন্ন কালে মানবজীবনের ধর্ম্মানুরাগও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সত্যে বহুল তপস্যা, ত্রেতায় যজ্ঞ ও দান, দ্বাপরে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কলিতে ভক্তিপ্রেম, ধারণার স্বল্পাধিক্য হেতু এই সকল ভাবই তত্তৎকালে মানবজীবনের প্রধান আশ্রয় হয়। কোন্ কার্য্য কর্‌ব, কি রূপেই বা কর্‌ব, এ সকল ধ্যান এবং তপস্যার দ্বারাই যথার্থ নিরূপিত হয়ে থাকে। তৎপরে কর্ম্মানুরক্ত হয়ে মানবমন শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানেই বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে জ্ঞান এবং প্রেমের অধিকারী হয়ে থাকে। বোধ হয়, এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন কালে পূর্ব্বোক্তভাবে মানবমনে ধর্ম্মানুরাগ প্রবাহিত হবার কথাই পুরাণকার

নির্দ্দেশ করেছেন। কর্ম্মানুষ্ঠানে বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের দৃষ্টি নানা ভাবে নানাদিকে চালিত হয়ে সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়ে থাকে। তাই বোধ হয়, দ্বাপরে লোক সকল ধর্ম্মাধর্ম্মনিরত হবে এবং জ্ঞাননিষ্ঠ হবে, এইরূপ কথার উল্লেখ আছে। এই জন্যই ঐ যুগে জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান কর্‌বার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের আবশ্যক হয়েছিল। দেখ্‌তে পাওয়া যায়, গীতাকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য কর্‌বার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি এবং কথিত আছে, তিনি দ্বাপর যুগের শেষভাগেই জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর আবির্ভাবের কিছুকাল পর হতেই দুঃখদুর্দ্দিন উপস্থিত হয়ে পুণ্যক্ষেত্র ভারত অধিকার কর্‌লে এবং মনুষ্যসমাজ পশুঘাতাদি নানা নৃশংস ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়ায় পরমকারুণিক ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়ে উঠ্‌ল। বুদ্ধপ্রচারিত জ্ঞান কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত অপ্রতিহত থেকে তিব্বত, চীন প্রভৃতি নানা জাতির কলুষিত ভাবের সহিত মিশ্রিত হয়ে আপনি কলুষিত হয়ে পড়্‌ল। দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এই সময়ে আবার শক প্রভৃতি নানা বর্ব্বর জাতিরও ভারতে আগমন ও বসবাসস্থাপন এবং জগতের ভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মসংস্কারের জন্য শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাচার্য্যের স্বল্পকালের মধ্যেই অভ্যুদয় হচ্ছে।

হে সমবেত ভ্রাতাসকল, ধর্ম্মই চিরকাল ভারতবর্ষের প্রাণ। ভারত ধর্ম্মকে বা ধর্ম্ম ভারতকে কখনও ছাড়ে নাই। সেই জন্যই বোধ হয়, আজ আবার ভারতবর্ষে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছে।

তিনি যে নবীন যুগধর্ম্মের প্রচার করেছেন, তার অন্তর্নিহিত উদারতা এবং গভীরতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল যুগধর্ম্মকে মলিন করেছে এবং ইহার উদয়ের স্বল্পকাল পরেই সুদূর ইয়োরোপ ও আমেরিকা খণ্ড হতে সমুত্থিত জয়ধ্বনিতে ইহার অন্তর্নিহিত শক্তিরও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেছে। ইহার অভিনবত্বের কথা আর অধিক বুঝাবার আবশ্যক নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার এবং আচার্য্যদের প্রত্যেকেই বলেছেন যে, তিনি যে মত প্রচার করেছেন, তা ছাড়া কল্যাণের এবং মানবজীবনের উন্নতিলাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্‌ছেন যে,

অদ্যাবধি ধর্ম্মজগতে যত মত প্রচারিত হয়েছে, সে সকলগুলিই সত্য, উহার প্রত্যেকটি পূর্ণ সত্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ বলেছেন—হে মানব, তুমি জীবে দয়া কর; শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঘোষণা কর্‌ছেন—হে মানব, তুমি প্রত্যেক মনুষ্যকেই নারায়ণমূর্ত্তি জ্ঞানে যতদূর পার সেবা কর। পূর্ব্বের আচার্য্যগণ নারীজাতিকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলে নির্ণয় করেছেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঘোষণা কর্‌ছেন—প্রত্যেক রমণীই আনন্দময়ী বিশ্বজননীর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, তাঁকে বিশেষ সম্মান কর, কামগন্ধহীনচিত্তে তাঁর সেবা কর, তিনি তোমার পূজায় প্রসন্না হয়ে অভয় দিলে, তবেই তোমার উন্নতি ও মুক্তির পথ উন্মুক্ত হবে। পূর্ব্বের আচার্য্যগণ বলেছেন, ষড়্‌রিপুর বিনাশ কর, তবেই ধর্ম্মলাভ সম্ভবে; শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্‌ছেন—শ্রীভগবানের দিকে ঐ ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দাও, তা হলেই তারা ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিণত হয়ে তোমায় সত্যলাভে সহায়তা করবে। পূর্ব্বের আচার্য্যগণ বলেছেন, নানা শাস্ত্র পাঠ না কর্‌লে তোমার দিব্যদৃষ্টি কখনই খুল্‌বেনা; শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর্‌ছেন—হে মানব, তুমি যদি আপন বুদ্ধির অহংকার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে সরল শিশুর ন্যায় জগজ্জননীর ক্রোড় লাভের জন্য ব্যাকুল হও, তবে নিরক্ষর হলেও পূর্ণ জ্ঞানদৃষ্টিলাভ অতি সুলভেই তোমার করতলগত হবে।

হে ভাই সকল, অশেষ ধর্ম্মসমন্বয়-তনু অনন্ত ভাবের সাগর-সঙ্গম-সদৃশ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইয়ত্তা নগণ্য আমি কেমন করে কর্‌ব। এখন এস ভাই, সকলে মিলে তাঁর চরণে প্রণত হই এবং তাঁরই শক্তিতে নব প্রাণ লাভ করে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করি—জয় হিন্দু, ক্রিশ্চিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের জয়—জয় বেদ, বাইবেল, কোরাণ পুরাণ সমগ্র শাস্ত্রকুলের জয়—জয় জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্মাদি চতুষ্পথের জয়—জয় সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্ব অবতারকুলের জয়—জয় সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বভাবের, সর্ব্ব অবতারকুলের ঘনীভূত প্রতিমা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জয়।

সংবাদ ও মন্তব্য।

নিউইয়র্ক বেদান্তপ্রচার সমিতির সম্পাদিকা মিস্ এল, এফ, গ্লেন মহোদয়া ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদিগকে লিখিতেছেন,—

স্বামী অভেদানন্দ কানাডার অন্তর্গত টরোন্টোনিবাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ঐতিহাসিক সমিতিতে একটী এবং ঐ নগরীর প্রধান হলে সাধারণ সভায় একটী হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই দ্বিতীয় বক্তৃতাটীতে টরোন্টোর শত শত গণ্য মান্য ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত হিন্দুধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হন। কিন্তু এই বক্তৃতার পর যখন তাঁহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল এবং তিনি যখন বিন্দুমাত্র চিন্তার পর্য্যাপ্ত সময় না লইয়া সেই সকল জটিল প্রশ্নের অতি সরল ও আশ্চর্য্য সমাধান করিয়া দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এই সকল তত্ত্ব আলোচনার জন্য বসিয়া রহিলেন এবং সকলেই স্বামীজির পুরোভাগে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার করমর্দ্দনের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্থানীয় সকল সংবাদপত্রেই এই বক্তৃতার দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানি সংবাদপত্র বলেন, "বিগত রজনীতে ভারতাগত স্বামী অভেদানন্দ এখানকার কনজারভেটারি মিউজিক হলে (Conservatory Music Hall) অপূর্ব্ব গভীর তত্ত্বপূর্ণ এক মনোহর বক্তৃতা দিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ এই মহাদেশে হিন্দুদর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বলিয়া সুপরিচিত এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির কার্য্যভার পরিচালনা করিতেছেন। আর একটী সংবাদপত্র সরলভাবে লিখিতেছেন,—"বক্তা মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় যে সকল গভীর তত্ত্বরাশি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কতকগুলি শ্রোতা মনে করিলেন, বক্তৃতান্তে প্রশ্নজাল বিস্তার দ্বারা ঐ সকল তত্ত্ব অনায়াসে উড়াইয়া দিব, কিন্তু স্বামীজি ঐ প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্য যেন প্রস্তুত ছিলেন। এই সভ্যতালোকপ্রাপ্ত কানাডায় স্বামীজির সুস্পষ্ট স্বর, ইংরাজী ভাষায় সবিশেষ নিপুণতা ও তত্ত্বজ্যোতিত ভাবের সম্মুখে এই সকল মতসর্ব্বস্ব বাদিগণের

শুষ্ক, অসার, অস্পষ্ট প্রশ্নগুলি যেন ভাসিয়া গেল। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় 'হিন্দুজাতির ধর্ম্মবিজ্ঞান।' ঐ বক্তৃতার দ্বারা হিন্দুজাতির ধর্ম্ম কেবলমাত্র অজ্ঞানপ্রসূত, কানাডাবাসীর এই চিরন্তন ভ্রমবিশ্বাস একেবারে দূর হইল। স্বামী অভেদানন্দ কলিকাতার কলেজে শিক্ষিত। তিনি জগতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞ ও নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি অতি সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন।"

কানাডা গোঁড়া খ্রীশ্চিয়ানের প্রবল দুর্গস্বরূপ, এরূপ স্থানে এরূপ কৃতকার্য্য হওয়া বেদান্তপ্রচারকার্য্যের শুভ বিজয়চিহ্ন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্বামীজি যে যথার্থই কানাডায় বেদান্তের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার কানাডায় অবস্থানকালীন প্রত্যেক ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়। আর একটী সংবাদপত্রের রিপোর্ট দেওয়া গেল,—"স্বামী অভেদানন্দ গত শুক্রবার রাত্রে কনজারভেটারি মিউজিক হলে অগণ্য শিক্ষিত ও চিন্তাশীল শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে বক্তৃতা করেন। টরোণ্টোয় তাঁহার চার দিন অবস্থান হয়। স্থানীয় অধিকাংশ ব্যক্তিই এই কয়দিন তাঁহাকে লইয়া মাতিয়াছিলেন। তিনি ত্রিনীতি কলেজ পরিদর্শন করিতে গমন করেন ও তথাকার চ্যান্সেলর ও অধ্যক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। অধ্যাপক ক্লার্কের সহিতও তাঁহার আলাপ ও কথাবার্ত্তা হয়। রবিবার রাত্রে তিনি এক সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রিত হন এবং যদিও সংযতাহার বলিয়া সকল সময়ে আহারে যোগ দিতে পারেন নাই, তথাপি যখনই তিনি এই সকল সুহৃৎসম্মিলনে গমন করিয়াছেন, তখনই তাঁহার প্রতিভা ও বাগ্মিতা এই সকল ভোজগুলিকেই এক বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে।" শিক্ষাবিভাগের ইন্স্পেক্টর এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার জনপ্রিয় অধ্যক্ষপদপ্রার্থী হিউগ্‌স মহাশয় সাধারণ সভার সভাপতি হইয়া স্বামীজিকে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ঐ নগরীর একজন প্রধান মেথডিষ্ট ধর্ম্মাচার্য্য উঠিয়া স্বামীজিরচিত অনেক গ্রন্থের প্রশংসা করেন এবং একজন স্কচ প্রেস্‌বিটেরিয়ান পাদ্রি আগ্রহসহকারে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া সপ্রেম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আতিথ্যসৎকার করেন। টরোণ্টোর লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্বামীজিকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার সম্মানার্থ অনেকগুলি ভোজ ও চা-পান সভার

আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন লিখিয়াছিলেন,—"সকলেই অভেদানন্দ স্বামীকে একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল ; ইহা হইতে লোককে নিবৃত্ত করাই এক মহা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।" স্বামীজি টরোণ্টো হইতে চলিয়া আসিবার পর তথাকার জনৈক ব্যক্তি লিখিতেছেন,—"আমি অনেকের সহিত কথা কহিয়া দেখিলাম ; সকলেই আপনার সম্বন্ধে একবাক্য—একজন লোকও বিরুদ্ধবাদী নাই ; আমার ধারণা,—আপনার শুভাগমনে এখানে অনেক মহৎকার্য্যের বীজ রোপিত হইল।" স্বামীজি যাহাতে টরোণ্টোয় আরো কিছুদিন থাকেন ও তথায় কালবিলম্বব্যতিরেকে একটী শাখা বেদান্তসমিতি স্থাপন করেন, অনেক ব্যক্তির এ বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই নিউইয়র্কে অন্যান্য অনেকগুলি কার্য্যের কথা থাকাতে তিনি আপাততঃ তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

স্বামী অভেদানন্দের অনুপস্থিতিকালে স্বামী নির্ম্মলানন্দ এখানকার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রথম রবিবাসরীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। 'ঈশ্বর সম্বন্ধে বৈদিক ধারণা' ইহাই তিনি তাঁহার বক্তৃতার বিষয়রূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি এত স্পষ্টভাবে ও ওজস্বিতার সহিত অথচ সরল ও স্বাভাবিক ভাবে তাহার চিন্তারাশি পরিব্যক্ত করেন যে, তিনি যে সর্ব্বদা বলিতেন—সাধারণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা আমার অভ্যাস নাই, তাঁহার এ কথা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

ব্রুকলিনে যে নূতন বেদান্তসমিতি স্থাপিত হইয়াছে, স্বামী নির্ম্মলানন্দ তাহারও কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দ বিগত শীত-ঋতুতে ব্রুকলিনে যে দুইটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে এত লোকসমাগম হইয়াছিল যে, তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতাটীতে লোক দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। বেদান্তের উপর লোকের এই অপরিসীম অনুরাগের ফলস্বরূপ তথায় নিউইয়র্ক সমিতির শাখাস্বরূপ এক সমিতি খোলা হইয়াছে ও তথাকার 'ঐতিহাসিক সমিতি'র গৃহে একটী ঘর লইয়া উহাতে স্থানীয় সভ্যগণ যোগশিক্ষা করিতেছেন। এই শাখাসমিতির এত শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি হইতেছে যে, শীঘ্রই উহার স্থায়ী গৃহ হইয়া উহাতে রীতিমত পৃথক্ বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত রেঙ্গুন সহরে কয়েক বর্ষ হইতে 'রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতির সভ্যগণ প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবাদি উপলক্ষে পূজাপাঠ, দরিদ্রভোজন প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। এবারে তাঁহারা মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তথায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। উক্ত সমিতি গত ২০শে মার্চ্চ বেঙ্গল সোস্থাল ক্লাবগৃহে স্বামীজিকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। অভিনন্দনপত্রে তাঁহারা বলেন,—'ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য সম্বন্ধ অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই সর্ব্বপ্রথমে এই দেশকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। এই জাতীয় অবনতির দিনেও যে আমাদের জন্মভূমি ব্রহ্মদেশকে আপনার ন্যায় একজন ত্যাগী ও কর্ম্মঠ ধর্ম্মপ্রচারক দিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাতে আমরা পরম আনন্দিত।' স্বামীজি এখানে 'আত্মার স্বরূপ' 'বেদ ও বেদান্ত' 'ভক্তি' ও 'ধর্ম্মসকলের তুলনায় আলোচনা' এই কয়েকটী বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। দরিদ্রভোজনাদিও যথারীতি হইয়াছিল। তিনি ২৭শে তারিখে মান্দ্রাজ মঠে প্রত্যাগত হইয়া তথা হইতে সেই তারিখে প্রচারার্থ বোম্বাইয়ে যাত্রা করিয়াছেন।

১লা ফাল্গুনের উদ্বোধনে বহুবাজার সার্পেন্টাইন লেনস্থ রামকৃষ্ণ সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত যে অনাথ ভাণ্ডারের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা আনন্দের সহিত পাঠকগণকে জানাইতেছি যে, উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি হইতেছে। ইহা হইতে বৃদ্ধ আতুর ও ভদ্রবংশীয়া অনাথা বিধবাগণকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে; এবং অসহায়, দরিদ্র, ভদ্রবংশীয় বালকগণকে ইহার অনাথাশ্রমে আশ্রয় দিয়া যথোচিত বিদ্যাদান করা হইতেছে। ভবিষ্যতে এই বালকগণ যাহাতে কার্য্যক্ষম হইয়া মানুষের মত হইতে পারে, তাহার জন্যও বিধিমত চেষ্টা করা হইতেছে। উপস্থিত এই আশ্রমে পাঁচটী বালক প্রতিপালিত হইয়া ইংরাজী স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। বহুবাজার নেবুতলালেনস্থিত কলিকাতা হাইস্কুলের উদারহৃদয় সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজ স্কুলে বালকগণকে বিনা বেতনে পড়াইতেছেন ও অনাথ ভাণ্ডারের

অবৈতনিক সেক্রেটারীর ভারগ্রহণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মঠের শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ ইহার স্থায়ী সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন। অনাথ ভাণ্ডারের সভ্যগণ ঐ পল্লীতে ও অন্যান্য স্থানে গৃহস্থের বাটীতে একটী করিয়া হাঁড়ি রাখিয়া দিয়াছেন; গৃহস্থেরা প্রতিদিন ভিক্ষাস্বরূপ ঐ হাঁড়িতে এক মুঠা করিয়া চাউল রাখিয়া দিয়া থাকেন এবং ঐ চাউল প্রতি রবিবারে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কিছু কিছু অর্থসাহায্যও পাওয়া যায়। এই প্রকার আয়ের উপর অনাথ ভাণ্ডারের ব্যয় নির্ভর করিতেছে। অনাথ ভাণ্ডার সভার আবশ্যকীয় খরচা (Establishment) বাদে শতকরা ৭২৲ টাকা বালকদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদিতে ও শতকরা ২৪৲ টাকা বৃদ্ধ, আতুর ও বিধবাদিগের সাহায্যে ব্যয়িত হয় এবং শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে জমার তহবিলে (Permanent Fund) জমা রাখা হয়।

এককালীন যাহা সাহায্য পাওয়া যায়, তাহাও জমার তহবিলে রাখা হয়।

গত ইং ১৯০৪ সালের নবেম্বর মাস হইতে ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আয়—		ব্যয়—	
মাসিক চাঁদা	৬৯৶০	অনাথ ভাণ্ডার স্থাপনের	
চাউল	৯৭৶/১০	আবশ্যকীয় ব্যয়	১৯/১৫
এককালীন চাঁদা	৩১৶৵৫	বিধবা ও দরিদ্র	
বালকদিগের দ্বারা		পরিবারের	
উপার্জ্জিত	৵১০	সাহায্যার্থে দান	১২৲
মোট	১৯৯/৫	অনাথ আশ্রমের ব্যয়	৬৯৷৶৫
		মোট	১০০৶০

সুতরাং এক্ষণে হস্তে ৯৮।৫ মজুদ আছে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই অনাথ ভাণ্ডারে মাসিক অথবা এককালীন সাহায্য দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সম্পাদক, অনাথ ভাণ্ডার, ১২ নং সার্পেণ্টাইন লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিগত ৮ই চৈত্র মঙ্গলবার দোল পূর্ণিমার দিবস যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটীয়া ধর্ম্মাশ্রমে দশম বার্ষিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তথায় সমস্ত দিবস পূজা পাঠ সংগীত সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মালোচনা বক্তৃতা

এবং প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। প্রায় ছয় শত নরনারী উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। ছয়টী সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত মধুর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর স্মৃতিরত্ন "মনুষ্যজীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এ "রামকৃষ্ণ মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের চতুর্থ বার্ষিক বিবরণী (১৯০৩ সালের জুলাই হইতে ১৯০৪ সালের জুন পর্য্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে আশ্রম হইতে ৬৬৫ জন নরনারী নানারূপে সাহায্য পাইয়াছেন। সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনের ইতিহাস নিম্নে বিবৃত হইল,—তীর্থ সিংহ নামক কাশ্মীর-নিবাসী পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ বৎসর বয়স্ক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক ৺বারাণসী ধামে সংস্কৃত শিক্ষার্থ আগমন করিয়া লাক্ষাপল্লীস্থ এক মঠে বাস করেন ও ছত্র হইতে ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করিতে থাকেন। তিনি দুই মাস কাল কোষ্ঠকাঠিন্য, শূল ও যকৃৎ পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন—তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা বা সেবাশুশ্রূষা কিছুই হইতেছিল না। ১৯০৩ সালের ১০ই জুলাই তারিখে তাঁহাকে সেবাশ্রমে গ্রহণ করা হয় এবং ডাক্তার সুবোধচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। রোগীর অবস্থা এরূপ সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। যত্নের সহিত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার পর ১২দিনের পর তিনি রোগমুক্ত হইয়া মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি রক্তামাশয়রোগাক্রান্ত হন। আশ্রমের জনৈক সেবক কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ব্যবস্থাপিত ঔষধ ও আশ্রম হইতে প্রস্তুত পথ্য তাঁহাকে দিয়া আসিতে থাকেন। কিন্তু রোগ ক্রমশঃ ভীষণাকার ধারণ করাতে তাঁহাকে পুনরায় সেবাশ্রমে লইয়া আসা হয় ও ডাক্তার এ, এন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়ের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। সময়ে সময়ে রাত্রে তাঁহার ৬৫ বার পর্য্যন্ত ভেদ হইত। ক্রমশঃ তিনি এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না, তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে হইত। সেবাশ্রমের সেবকগণ দিবারাত্র অবিশ্রান্ত তাঁহার সেবা করিতে থাকেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইল। তিনি গত ১৯০৩ সালের ১৫ই অক্টোবর দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেবাশ্রমের ব্যয়ে মণিকর্ণিকা ঘাটে তাঁহার সৎকার করান হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে হস্তে ৫৮৫৩৶১০ ছিল। সমুদয় বর্ষের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ জমা ১৮৩৮/৫ ও খরচ ১৩৮৯৬৶১০ হইয়াছে। সুতরাং বর্ষশেষে হস্তে ৫৩০১/৫ ছিল। ইহার মধ্যে ৪১০০।০ আশ্রম-গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রদত্ত। এতদ্ব্যতীত অনেক সহৃদয় বন্ধু ও ভদ্রলোক চাল, কাপড়, ঔষধ প্রভৃতি নানাপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য দানে এবং বারাণসীনিবাসী অনেক ডাক্তার কবিরাজ বিনা দর্শনীতে সযত্নে রোগিগণকে দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

৺বারাণসী হিন্দুর প্রধান তীর্থ। এখানে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের লোক আসিয়া বাস করিতেছেন। অনেকেই এখানে দেহত্যাগ করিয়া শিবত্ব প্রাপ্তির আশায় আসিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যার্থী এবং সাধু সন্ন্যাসীও অগণ্য। অনেকগুলি অন্নসত্র এবং কয়েকটী হাঁসপাতাল থাকিলেও একদিকে হিন্দুদাতৃগণের সঙ্কীর্ণতা অপর দিকে গবর্ণমেন্টের হিন্দু হৃদয়ের অনভিজ্ঞতা, সর্ব্বোপরি, আমাদের নিজেদের হৃদয়হীনতা বশতঃ উপযুক্ত লোকে যথাসময়ে সাহায্য পায় না। সুতরাং এরূপ উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সর্ব্বশ্রেণীর ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, এখনও এরূপ একটী আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে উপ-যুক্ত অর্থ জমিল না। বক্তৃতার আড়ম্বর করিয়া করতালি লওয়া অপেক্ষা এরূপ একটী কার্য্যে সাহায্য যে কোটীগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আশ্রমের কমিটি সাধারণের নিকট এতদর্থে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন—দেখা যাক্ কি ফল হয়। যদি কাহারও আশ্রমের বিবরণ জানিবার ইচ্ছা হয়, তিনি এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটরি, রামকৃষ্ণ হোম অফ সার্ভিস, রামাপুরা, বেনারস সিটি ঠিকানায় লিখিতে পারেন। অর্থাদিও উক্ত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

ভাঙ্গোড়ের নিকটবর্ত্তী বদ্‌রাগ্রামে শ্রীপুলিনবিহারী রায় চৌধুরী মহা-শয়ের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিসপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেকগুলি সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায় সমস্ত দিন ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন করেন। প্রায় ২০০ শত ভদ্রলোক ও প্রায় ১২০০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।]   [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

উত্তমপূর্ণনামক শ্রীরঙ্গনাথের জনৈক অর্চ্চক লক্ষ্মীকাব্য নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে কুরেশের জীবনী যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইতেছে। কুরেশ একজন বাৎস্যগোত্রসম্ভূত ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাঞ্চিপুরের একক্রোশ পশ্চিমে কুর-অগ্রহার নামক স্থানে তাঁহার বাস ছিল। তিনি উক্ত স্থানের ভূস্বামী ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কুরনাথ বা কুরেশ হইয়াছে; তিনি অণ্ডাল নাম্নী এক উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর পাণি-গ্রহণ করিয়া, আপনার বিপুল ঐশ্বর্য্য, দীন নিঃসহায় লোকদিগের সেবায় ব্যয় করিতেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীরামানুজকে তিনি প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন। যতিরাজ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে পর, স্ত্রীর সহিত তিনি তাঁহার শিষ্য হইলেন, এবং প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের অবধি ছিল না। স্মৃতিশক্তির পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। যাহা একবার শ্রবণ বা পাঠ করিতেন, তাহা তাঁহার মনে চিরকাল রহিয়া যাইত। ইঁহারই দ্বারা শ্রীরামানুজ মহাপণ্ডিত যাদবপ্রকাশকে বাদে পরাভূত করিয়াছিলেন।

ইঁহার সুবিশাল অট্টালিকা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কেবল "নীয়তাং, দীয়তাং, ভুজ্যতাম্" এই শব্দে শব্দায়মান হইত। তৎপরে তাঁহার লৌহময় কবাটবিশিষ্ট বিশাল দ্বার উষাকালে পুনরুদ্ঘাটিত হইবার জন্য রুদ্ধ হইত। শ্রীরামানুজ কাঞ্চিপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে যাইলে পর, তাঁহার আর ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধ কোনরূপেই রুচিকর হইল না।

কথিত আছে, শ্রীবরদরাজপত্নী জগন্মাতা লক্ষ্মী একদা কোনও গভীর রজনীতে কুরেশের দ্বাররোধধ্বনি শ্রবণ করিয়া, উক্ত ধ্বনির কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে, কাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে কুরাগ্রহার-পতির দরিদ্রপোষণ প্রভৃতির বিষয় সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত দীন, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতির সেবা চলিতেছিল। সর্ব্ব-

কর্ম্ম সমাধা করিয়া পরিচারকেরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবার মানসে বিশাল ধর্ম্মশালার দ্বার রোধ করিয়াছিল। সেই লৌহময় কবাট বিশিষ্ট সুবৃহৎ দ্বার রুদ্ধ হইবার সময় প্রতি রজনীতেই এইরূপ শব্দ করিয়া থাকে।" লক্ষ্মীদেবী ইহাতে চমৎকৃত হইয়া কুরেশকে দেখিবার জন্য কাঞ্চিপূর্ণকে কহিলেন, "বৎস, উক্ত মহাত্মাকে আমার নিকট কল্য প্রভাতে আনয়ন করিও, আমি তাঁহাকে দর্শন করিব।" কাঞ্চিপূর্ণ উষাকালে কুরেশকে দর্শন করিয়া জগন্মাতার মন্তব্য ব্যক্ত করিলে, তিনি কহিলেন, "হে মহাত্মন্, ক্বাহং কৃতঘ্নো দুর্ম্মনাঃ পাপিষ্ঠঃ পরবঞ্চকঃ। ক্বাসৌ লক্ষ্মীর্জগন্মাতা ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দিতা॥ আমার ন্যায় কৃতঘ্ন, দুর্ম্মনাঃ, পাপিষ্ঠ, পরবঞ্চকই বা কোথায়, আর ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দিতা, জগন্মাতা লক্ষ্মীই বা কোথায়। মহাপাতক জন্য মহাব্যাধিগ্রস্ত চণ্ডালের দেবালয়-প্রবেশের অধিকার কোথায়? আমি তদপেক্ষা নরাধম। বিষয়বিষ্ঠা আমার হৃদয়মনকে একবারে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি জানি না, ইহজীবনে আমি লক্ষ্মী দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হইব কি না।" ইহা কহিয়া কুরেশ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে অঙ্গ হইতে যাবতীয় বহুমূল্য আভরণ উন্মুক্ত করিয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে চীরবসন ধারণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদ হইতে কাঞ্চিপূর্ণকে এই বলিয়া বহির্গত হইলেন, "মহাশয়, জগন্মাতার আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না! আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতে চলিলাম। বিষয়বিষ্ঠাক্লিন্ন দেহমন শ্রীগুরুপাদরজোরূপ অমৃতসরোবরে স্নান না করিলে কখনও শুদ্ধ হইবে না। অতএব আমি স্নানার্থ চলিলাম। জানি না আমি কতদিনে এ ক্লেদ হইতে মুক্ত হইব। আপনার ন্যায় মহানুভবের আশীর্ব্বাদ থাকিলে হয়তো ইহজীবনেই জগন্মাতার চরণ দর্শনে অধিকার পাইব।" কুরেশ শ্রীরঙ্গমের দিকে চলিতে লাগিলেন।

ভর্ত্তার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া তদীয় সহধর্ম্মিণী অণ্ডালও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। স্বামী তৃষ্ণাতুর হইলে তাঁহাকে জলপান করাইবার জন্য, তিনি তাঁহার সহিত কেবল একটি স্বর্ণপাত্র লইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া তাঁহারা বনপথ আশ্রয় করিলেন। নিবিড় বনে অণ্ডালের মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইলে, তিনি ভর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, এখানে তো কোন ভয় নাই?" ইহাতে কুরেশ উত্তর করিলেন, "ধনবান্‌দিগেরই ভয়

হইয়া থাকে। তোমার সহিত কোনও অর্থাদি যদি না থাকে, তাহা হইলে কোনও ভয় নাই; চলিয়া আইস।" এতচ্ছ্রবণে অণ্ডাল তখনই স্বর্ণপাত্রটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা পরদিবস শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। দম্পতীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানুজ পরম স্নেহের সহিত তাঁহাদিগকে স্বীয় মঠে লইয়া আসিলেন। স্নান ভোজনাদি দ্বারা অধ্বশ্রম দূর হইলে, যতিরাজ তাঁহাদিগের বাসের জন্য একটি ভিন্ন বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

কুরেশ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীগুরূপদিষ্ট মন্ত্ররত্ন স্মরণ, ভগবন্নাম কীর্ত্তন, সচ্ছাস্ত্রালোচনা, গুরুপাদপদ্ম দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ সদুপায়ে কালক্ষেপ করতঃ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অণ্ডাল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তদীয় ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ পূর্ব্বক পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় একবারও মনে হইল না। কুরেশের সুখেই তিনি আপনাকে সুখী মনে করিলেন। একদিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অবিরত মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় কুরেশ ভিক্ষাটন করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং সমস্ত দিন সস্ত্রীক অনাহারে কাটাইয়া দিলেন। ক্ষুধার বিষয় তাঁহার একবার মনেও হইল না। কিন্তু পতিশুশ্রূষৈকপরায়ণা অণ্ডাল ভর্ত্তার উপবাস দেখিয়া মনে মনে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীকে তাহা জানাইলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরেই জনৈক অর্চ্চক নানাবিধ বহুমূল্য প্রসাদ আনিয়া কুরেশকে অর্পণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কুরেশ ইহাতে বিস্মিত হইয়া জায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর নিকট মনে মনে কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলে? নতুবা যে ভোগ আমরা কাকবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তিনি পুনরায় কেন সেই ভোগ দ্বারা আমাদের অন্ধ করিতে যত্নবান্ হইবেন?" সাশ্রুনয়নে অণ্ডাল আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলে, কুরেশ কহিলেন, "যাহা করিয়াছ, তাহার আর উপায় নাই। কিন্তু এরূপ যেন আর কখনও করিও না।" এই বলিয়া তিনি মহাপ্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া সহধর্ম্মিণীকে তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং বারবার শঠারিসূক্ত আবৃত্তি করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

কথিত আছে, উক্ত প্রসাদ গ্রহণের দশমাস পরে অণ্ডাল একবারে দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। রামানুজ এতচ্ছ্রবণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ গোবিন্দকে নবপ্রসূত শিশুদ্বয়ের জাতকর্ম্ম করিবার জন্য প্রেরণ

করিলেন। গোবিন্দ জাতকর্ম্ম সমাপন করিয়া তাহাদের কর্ণে "শ্রীমন্নারায়ণ-চরণৌ শরণং প্রপদ্যে। শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ।" এই মন্ত্রদ্বয় কহিয়া তাহাদের নবজাত দেহমনের শুদ্ধিবিধান করিলেন। যতিরাজ স্নেহপরবশ হইয়া শিশুদ্বয়কে রক্ষোভূতপিশাচগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদের উভয়কেই শ্রীবিষ্ণুর পঞ্চাস্ত্র (পাঞ্চজন্য, সুদর্শন, কৌমোদকী, নন্দক, শার্ঙ্গ) সুবর্ণে নির্ম্মিত করাইয়া, ধারণ করিবার জন্য দান করিলেন। এইরূপে রক্ষিত শিশুদ্বয় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ছয় মাস উত্তীর্ণ হইলে, তাহাদের নামকরণ হইল। যতিরাজ জ্যেষ্ঠের নাম পরাশর ও কনিষ্ঠের নাম ব্যাস রাখিলেন। তৎকালে গোবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বালগোবিন্দের পুত্রেরও নামকরণ কাল উপস্থিত। শ্রীরামানুজ তাহার নাম পরাঙ্কুশপূর্ণ রাখিলেন। এইরূপে যতিরাজ তাঁহার তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন।

বাল্যকাল হইতেই পরাশর আপনার অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যখন চারি বৎসরের, সেই সময় সর্ব্বজ্ঞ ভট্ট নামক একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে দামামা বাজাইয়া আপনার কীর্ত্তি প্রকট করিতে করিতে রাজপথ দিয়া মহাসমারোহে গমন করিতেছিলেন। ঐ পথে অন্যান্য বালকগণের সহিত পরাশর তৎকালে ধূলাখেলা করিতেছিলেন। তিনি দামামা-বাদকের মুখে শুনিলেন, "জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বজ্ঞ ভট্ট সশিষ্য গমন করিতেছেন, যে কেহ তাঁহার সহিত বাদ করিতে, বা তাঁহার শিষ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার শ্রীপাদমূলে আগমন করুন।" এতচ্ছ্রবণে বালক হাসিতে হাসিতে এক অঞ্জলি ধূলি লইয়া সর্ব্বজ্ঞের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও জিজ্ঞাসিলেন, "বলুন দেখি, আমার হাতে কতগুলি ধূলি আছে? আপনি যখন সর্ব্বজ্ঞ, তখন আপনার সকলই জানা সম্ভবে।" পণ্ডিত সহসা ধূলিধূসরকায় বালকের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং আপনার সর্ব্বজ্ঞত্বাভিমানকে ধিক্কার করিয়া বালককে ক্রোড়ে করতঃ তাহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস, তুমি আমার গুরু। তোমার প্রশ্নে আমার চৈতন্য লাভ হইল।"

শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর প্রসাদ ভোজনে ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম হইয়াছে, এই জন্য পরাশর ও ব্যাসকে তাঁহারই পুত্র বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিতেন।

উপনয়নের পর উপনিষদ্ পাঠ কালে গোবিন্দ যখন তাঁহাদিগকে ভগবানের "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" গুণদ্বয় সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছিলেন, সেই সময় বালক পরাশর জিজ্ঞাসা করিল, একজনের এই দুইটি বিপরীত গুণ কিরূপে সম্ভবে? গোবিন্দ ইহার সদুত্তর সহসা দিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইলেন। যতিরাজের ইচ্ছানুসারে পরাশর, উপনীত হইবার কিয়দ্দিবস পরেই মহাপূর্ণের কোনও দায়াদের কন্যার সহিত বিবাহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন।

ক্রমশঃ।

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

যাহা হউক, তাহার পর ফাটাচটী হইতে আমি ত্রিযুগীনারায়ণে পঁহুছিলাম। ৺কেদারের পথে ত্রিযুগীনারায়ণের দর্শন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তকাশী হইতে ত্রিযুগীনারায়ণে পঁহুছিতে ২।১ দিনের অধিক হয় নাই। গুপ্তকাশী হইতে যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, সমুদয় স্থানটী কেবল এক অদ্ভুত নিবিড় অরণ্যে আবৃত, অসংখ্য জলপ্রপাতে চিরপ্লাবিত এবং অসংখ্য বিহগ-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সঙ্গীতলহরীতে পরিপূর্ণ দেখিলাম। ত্রিযুগীনারায়ণ অত্যুচ্চ প্রশস্ত এক গিরিগাত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং তুষারধবল পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এই পর্ব্বতমালার উপরিভাগ চিরশুভ্র তুষাররাশিতে পূর্ণ এবং নিম্নভাগ দেবদারু প্রভৃতি নবীন পল্লবান্বিত বৃক্ষসমূহে ঘন আচ্ছাদিত। পর্ব্বতমালার অর্দ্ধাঙ্গ অতি শুভ্র এবং অর্দ্ধাঙ্গ ঘন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হওয়ায় আর একবার আমার মনে হইল যে, আমি এক বিরাট্ হরিহর মূর্ত্তির পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি! সমুদয় দেবদেবীর একত্র সমাবেশ দেখিয়াই বুঝি মহাকবি কালিদাস ইহাকে বলিয়াছিলেন, "দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ" গিরিরাজ হিমালয়কে এমন সুন্দর নামে অভিহিত করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।

৺ত্রিযুগীনারায়ণ একটী কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠে একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে; শুনিলাম

যে, এই অগ্নিকুণ্ড নাকি তিন যুগের মধ্যে কখনো নির্ব্বাপিত হয় নাই, এই সুদীর্ঘ কাল ইহা সমান ভাবে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। অতিশয় স্থূল, বৃহৎ, বৃক্ষকাণ্ডপূর্ণ অগ্নিকুণ্ডটী দেখিলেই মনে হইবে যে, ইহা অতিশয় প্রাচীনকাল হইতেই যেন আপনাকে পরার্থে উৎসর্গ করিয়া ভক্ত যাত্রিগণের শীত নিবারণ করিতেছে। ৺ত্রিযুগীনারায়ণের নামানুসারেই এই গ্রামের নাম ত্রিযুগীনারায়ণ হইয়াছে। এই গ্রামে অনেকগুলি লোকের বাস, ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণ মাত্রেই ত্রিযুগীনারায়ণের পাণ্ডা ও পূজারী। বৎসরে ছয় মাস তাঁহারা যাত্রিগণের নিকট যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাই তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা। এখানে শীতের তীব্রতা সদা অনুভূত হয় এবং অপার চিরহিমানীর সুশীতল বায়ু তাহার নিত্য-সহচর। সদা সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকায় এখানকার বায়ুমণ্ডল অতিশয় আর্দ্র বলিয়া বোধ হয়। অতিরিক্ত তুষারপাত নিবন্ধন শীতকালে এই সকল স্থান অতিশয় দুর্গম হইয়া পড়ে। যাহা হউক তাহার পর আমি ত্রিযুগী-নারায়ণের নির্ম্মল বারিপূর্ণ কুণ্ডে অবগাহন করিয়া সেই যুগত্রয়ব্যাপী-অগ্নিকুণ্ডের পবিত্র ভস্মরাশি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া ধন্য হইলাম। এই সুবৃহৎ অগ্নিকুণ্ডটী থাকাতে নিম্নদেশীয় যাত্রিগণের পক্ষে বড়ই সুবিধা হইয়াছে; ভক্ত যাত্রিগণ যখন শীতে কম্পমানকলেবর হইয়া এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের চতুঃপার্শ্বে বসিয়া আপন আপন দেহ উত্তপ্ত করেন, তখন যথার্থই মনে হয় যে, ভক্তবৎসল ভগবান্ যেন দিন থাকিতে আপন ভক্তগণের শীতকষ্ট দূর করিবার জন্যই এই মহাধুনী জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন।

যতদূর স্মরণ হয়, ত্রিযুগীনারায়ণে দুই রাত্রির অধিক অবস্থিতি করা হয় নাই। তাহার পর একদিন প্রাতঃকালে তথা হইতে গৌরীকুণ্ডাভি-মুখে যাত্রা করিলাম। গৌরীকুণ্ড হইতে বাবা কেদারনাথের মন্দির ছয় ক্রোশ। পথে আসিতে আসিতে শুনিয়াছিলাম যে, গৌরীকুণ্ড হইতে ৺কেদারনাথ পর্য্যন্ত কেবল একটী প্রকাণ্ড চড়াই; অবিরাম একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতোপরি উঠিতে হয়। এই কথা শুনিয়া অবধি আমিও ভাবিয়াছিলাম যে, না জানি ৺কেদারনাথে পঁহুছিবার পূর্ব্বে বুঝি বা আমাকেও পথ-ক্লেশ অনুভব করিতে হয়। মসুরী হইতে এ পর্য্যন্ত বহু-সংখ্যক পর্ব্বতে চড়াই ওৎরাই করিলাম, এক দিনের জন্যও বিকট

পথ-ভ্রমণ-ক্লেশ আমার হিমালয় দর্শনজনিত আনন্দকে পরাভব করিতে পারে নাই। উত্তরাখণ্ড যাত্রাকালে ৺ অযোধ্যায় জনৈক প্রবীণ ও বিচক্ষণ সাধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ৺ বদরিকাশ্রম অতি পবিত্র ও মহান্ তীর্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু বিকট পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিতে করিতে তীর্থ-দর্শনস্পৃহা ও তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধার লাঘব হয়। তিনি ৺ কেদার ও বদরীনারায়ণ যাত্রা করিয়াই যে পথক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন, তিনবার তিব্বত যাত্রা করিয়াও আমাকে সেরূপ পথক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই। আমার বরং হিমালয় প্রবেশ কবিয়া ঠিক্ তাহাব বিপরীত অবস্থা হইল। হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি ক্রমশঃ তাহার অন্তঃস্থলে যাইবার জন্য আমার ইচ্ছা বলবতী হইল। "দেবাত্মা" হিমালয়ের সন্দর্শনে আমি এতই চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইলাম যে, সেই মহান্ পবিত্র দৃশ্য যতই দেখিতাম, আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইত। যে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ সম্মুখে দেখিতাম, তাহারই পর পারে আবার কি আছে দেখিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইত। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, হিমাদ্রির অভিনব দৃশ্যাবলী আমার মনপ্রাণ হরণ করিতে লাগিল এবং তাহার অলৌকিক প্রভাব আমাকে এমনি অভি-ভূত করিল যে, দুর্গম পথ-ক্লেশে কাতর বা অবসন্ন না হইয়া বরং আমার হৃদয় শ্রদ্ধা, সাহস ও উৎসাহে পূর্ণ হইল।

এইরূপে তাহার পর আমি পবিত্রদর্শন হিমালয়ের অপূর্ব্ব রূপমাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে গৌরীকুণ্ডাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে পরম রমণীয় একটী নদীসঙ্গম দর্শন করিয়া তাহাতে অবগাহন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যেন কত বল সঞ্চয় করিলাম। এইখানে সুরতরঙ্গিনী মন্দাকিনী কালীগঙ্গা নাম্নী আর একটী সুনীলবরণী প্রবাহিনীর সহিত আসিয়া মিলিতা হইয়াছেন। এই কালীগঙ্গার সুনীল নির্ম্মল জলরাশি দেখিয়া মনে হইল যে, ইহাঁর কালী নাম সার্থক হইয়াছে। এই কালী ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল দর্শন করিলে মনে হয়, যেন ইহাঁরা গিরিরাজের যমজা কন্যা, কিছুদিন বিযুক্তা ভাবে আপন পিত্রালয়ে বিচরণ করিয়া পুনরায় এইখানে আসিয়া দুই ভগিনী একত্রে মিলিতা হইয়াছেন।

ক্রমশঃ।

ইতর জন্তুদিগের মানসিক বৃত্তি।

(শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।)

'আমি' এবং 'তুমি' শব্দলক্ষিত সমান্তরালাবস্থিত অন্তর এবং বাহ্য জগৎ দ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষ আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই সংঘর্ষের ভূমিই প্রাণিনিচয়ের মন এবং এই সংঘর্ষের ফলেই মনুষ্য এবং তদিতর প্রাণীমাত্রের জ্ঞান স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের ঋষিকুল জ্ঞানগিরির উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া মহান্ বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিতেছেন, *'ঐ উভয় জগতই এক বস্তু হইতে প্রসূত, একশক্তি-স্পন্দিত এবং একই প্রাণে অনুপ্রাণিত।'* ঐ বস্তুর সান্নিধ্য অনুভবই জ্ঞান এবং উহার অস্তিত্বানুভবহীনতাই অজ্ঞান। সমাধি, যাহাতে ঐ এক বস্তুর জ্ঞানই কেবলমাত্র বর্ত্তমান, যাহাতে নামরূপ বাহ্যান্তর ভেদাভেদ সম্পূর্ণ বিগলিত হইয়া অদ্বৈত একমাত্র বস্তু পরিলক্ষিত হয় এবং যে অবস্থায় যাবতীয় মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্পূর্ণ নিরোধ হওয়ায় মানসিক সসীমতাবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া বাহ্যান্তর বস্তুর স্বরূপ নিরীক্ষণ করিতে হয় না—দূরে থাকুক সে সমাধিলব্ধ জ্ঞানের কথা। সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বানুভূত আপেক্ষিক জ্ঞান এবং প্রাণ ও চৈতন্য সম্বন্ধেও হিন্দুশাস্ত্র, মানব এবং তদিতর সমস্ত প্রাণি-নিচয়ের এবং জড়চৈতন্যখ্যাত সমস্ত বস্তুজাতের স্বল্পাধিক অধিকার শিক্ষা দিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানও ঋষিকুলনির্দ্দিষ্ট একতত্ত্বের দিকে অনেক অগ্রসর। যে দেশে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে 'নারী-জাতির আত্মা আছে কি না' এই বিষয় মীমাংসা করিতে মহাসভা আহূত হইত, দুই চারি শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'মনুষ্য এবং তদিতর প্রাণি-বর্গের জীবনে বস্তুগত পার্থক্য বর্ত্তমান,' 'জগৎ চারি সহস্র বৎসর মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে' ইহাই শাস্ত্রশিক্ষা ছিল, সেই দেশই এখন বিজ্ঞানকৃপায় বুঝিতেছে, একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন রূপ অনুভূত হয়, একই নিয়মে জড় ও চেতন খ্যাত বস্তুজাত চালিত হইতেছে, একই চৈতন্য মনুষ্য এবং তদিতর প্রাণিবর্গে প্রকাশিত এবং এ জগতের প্রতি স্তররচনায় লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে! বিজ্ঞানবলেই ডারুইন বলিতে সাহসী হইয়াছেন যে, বানরজাতিবিশেষই মানবজাতির আদিপুরুষ এবং ঐ বিজ্ঞান

প্রভাবেই আবার আজ পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র প্রমাণিত করিতেছেন যে, উদ্ভিজ্জ জীবন এবং মনুষ্যজীবন একই বস্তু—কেবল পরিমাণগত পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় মাত্র।

মনুষ্য এবং তদিতর প্রাণীমাত্রের জীবন এবং বৃত্তিনিচয়ের গঠনে যে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, উহা তদুভয়ের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সমতা দর্শনে বিশেষ উপলব্ধি হয়। তদুদ্দেশ্যেই অদ্যকার প্রবন্ধটিতে মনুষ্যেতর জন্তুদিগের মানসিকবৃত্তির বিষয় আলোচিত হইতেছে।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্ট জন্তুদিগের মধ্যে মানসিক বৃত্তি লইয়া তুলনা করিলে বাস্তবিকই মনুষ্য শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করিবে। শুনা আছে, মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত অসভ্য, তাহারা চারের অধিক সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ নয় এবং পার্থিব বস্তু কিম্বা মানসিক বৃত্তিসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারেনা। তাহারাও কিন্তু বানরজাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানগণকে অথবা সুচতুর কুকুরগণকেও বুদ্ধিবৃত্তিতে পরাস্ত করিবে। প্রাণি-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতগণ নেকড়েবাঘ কিম্বা শৃগালকে কুকুরের পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া অনুমান করেন এবং বলেন যে, কুকুরগণ বহুকাল হইতে মনুষ্যের গৃহে পালিত হইয়াই তাহাদের বর্ত্তমান বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, আধুনিক উচ্চশ্রেণীস্থ বানরগণ বহুকাল এইরূপে মনুষ্যের সঙ্গ অবস্থান হেতু মার্জ্জিত হইলেও মানসিকবৃত্তি সম্বন্ধে মনুষ্যের বিস্তর নিম্নে পড়িয়া আছে। ফুজি-দ্বীপ-বাসিগণ অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যেও কয়েক জন ইংলণ্ডে কয়েক বৎসর অবস্থান হেতু ইংলণ্ডীয়দিগের ন্যায় স্বভাব ও মানসিক বৃত্তির পরিচয় দিয়াছে। ইতর জন্তুদিগের সহিত মনুষ্যের এই বৃত্তি সম্বন্ধে এত প্রভেদ হইলেও তাহাদের ভিতর যে মনুষ্যের ন্যায় সকল প্রকার বৃত্তিই কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে এবং কালে ঐ সকলের মনুষ্যের ন্যায় বিকাশ হওয়াও সম্ভবপর এবং মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণিসমূহের মধ্যে যে মানসিক বৃত্তিসম্বন্ধের এই প্রভেদ স্বল্পাধিকপরিমাণগতমাত্র নিরপেক্ষ আলোচনা করিলে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না। পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ল্যাম্প্রে (Lamprey), লন্‌সেলট্ (Lancelot) প্রভৃতি ক্ষুদ্রতম মৎস্যের মনোবৃত্তির সহিত উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের মনোবৃত্তির যত প্রভেদ, ঐ সকল উচ্চশ্রেণীর বানরের মনোবৃত্তির সহিত মনুষ্যের মনোবৃত্তিরও ততোধিক প্রভেদ বর্ত্তমান।...

যখন মনুষ্যদিগের ন্যায় ইতর জন্তুগণের প্রায় সকলই ইন্দ্রিয়ই আছে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহাদের সেই সকল ইন্দ্রিয় মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয়ের ন্যায় কতক পরিমাণে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। মানুষের ন্যায় ইতর জন্তুদিগের আত্মরক্ষা, স্ত্রীপুরুষের প্রণয়, মাতার পুত্র-স্নেহ, নবশিশুর স্তনপান প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সমান হইলেও কতকগুলি স্বভাবজাত গুণ তাহাদের মানুষের অপেক্ষা অনেক বেশী থাকে। যথা পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের বনমানুষগণ ও আফ্রিকার শিম্পাঞ্জিগণ ঐরূপ স্বভাবজাত বুদ্ধিবলেই উচ্চ মাচা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করে। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন যে, যে জন্তুর বুদ্ধিশক্তি যত কম, তাহার স্বাভাবিক শক্তিও তত অধিক। কিন্তু পুকেট (Pouquet) তাঁহার অদ্ভুত প্রাণিসম্বন্ধীয় রচনায় উহা অপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল জীব অত্যাশ্চর্য্য স্বাভাবিক শক্তি প্রদর্শন করে, তাহারাই অধিক বুদ্ধিমান্। মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুদিগের মধ্যে মৎস্য ও কয়েকটী উভচর প্রাণী জটিল স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচয় দেয় না, কিন্তু স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যে বিভার (Bever) প্রভৃতি জন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং অন্য প্রকারেও আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে।

মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুগণও সুখদুঃখাদি ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া থাকে। কুকুর বিড়াল ও মেষশাবকগণ খেলার সময় ক্রীড়াসক্ত মানব-শিশুদের ন্যায় অদ্ভুত আনন্দ প্রকাশ করে। এমন কি, কীট সকলও একত্রে ক্রীড়া করে। পণ্ডিত হিউবার (Huber) পিপীলিকাগণকে কুকুর শিশুর ন্যায় পরস্পর পশ্চাদ্ধাবমান হইতে ও খেলাচ্ছলে পরস্পরকে কামড়াইতে দেখিয়াছেন।

ইতর জন্তুগণ যে মনুষ্যের ন্যায় ক্রোধ প্রভৃতি দ্বারা বিচলিত হয়, তাহার অধিক প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। ভয় হইলে আমাদের ন্যায় তাহাদেরও শরীর কুঞ্চিত হয়, অন্তঃকরণের বেগ প্রবল হয় এবং দেহে লোমাঞ্চ হয়। অনেক বন্য জন্তুর ভিতরে সন্দিগ্ধতাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। অনেকেই জানেন যে, বন্য হস্তী ধরিবার জন্য পোষা হস্তিনীই প্রধান উপকরণ। সেই সকল হস্তিনীর তাৎকালিক ব্যবহার পর্য্যা-লোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া পালকের অভিলাষ পূরণ জন্য স্বজাতীয়দিগকে প্রতারণা করে। সাহস ও ভয় যে

একজাতীয় জন্তুগণেরই মধ্যে পরিমাণে কম বেশী থাকে, তাহা আমাদের গৃহপালিত কুক্কুরের আচরণেই বেশ বুঝা যায়। কতকগুলি কুক্কুর ও ঘোড়া অতি অল্পেই রাগিয়া উঠে এবং কতকগুলি শীঘ্র রাগে না। এই গুণটী প্রধানতঃ বংশগতই লক্ষিত হয়। অনেকেই জানেন যে, কতকগুলি জন্তু কত অধিক পরিমাণে রাগিয়া উঠে এবং কত শীঘ্র তাহা প্রকাশ করে। বহু দিন পরে এবং বহু কৌশলে অনেক জন্তু প্রতিহিংসা লইয়াছে, এ বিষয়ে বিস্তর সত্য গল্প কথিত আছে। মাহুতের হস্তিমস্তকে নারিকেল ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ জন্য কিছুদিন পরে সেই হস্তী দ্বারা মস্তকে নারিকেল আঘাতে মাহুতের মৃত্যু আমাদের পঞ্চম বৎসরের শিশুর পাঠ্য। প্রাণিতত্ত্ববিৎ রেঙ্গার (Renger) এবং ব্রেম (Brehm) বলেন যে, আফ্রিকা ও আমেরিকার যে সকল বানরকে তাঁহারা বন্দী করিযাছিলেন, তাহারা প্রতিহিংসা লইয়াছিল। বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ সার এণ্ড্রুস্মিথ (Sir Andrew Smith) এবিষয়ে একটি সুন্দর গল্প বলিয়াছেন। উত্তমাশা অন্তরীপে একটী পুরুষ একটি বানরকে বড়ই বিরক্ত করিত। একদিন রবিবারে যখন সে সুসজ্জিত হইযা যুদ্ধকৌশলাদি অভ্যাস করিতে যাইতেছে, দেখা গেল, ঐ বানরটী তাড়াতাড়ি একটী গর্ত্তে জল ঢালিয়া খুব শীঘ্র কাদা প্রস্তুত করিয়া সকলের সমক্ষে ঐ কাদা সৈন্যটীর সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করিল। ঐ ঘটনার বহুদিন পর পর্য্যন্তও ঐ বানরটী ঐ সৈন্যকে দেখিলেই হাসিত ও অন্য প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিত।

কুক্কুরের প্রভুভক্তি সংসারে অলৌকিক। প্রভুর সামান্য বস্ত্রের জন্য শকটবানের কঠিন কশাঘাতেও এক পা মাত্রও না সরিয়া শকটচক্রের নিস্পেষণে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন; হস্তিপদতল নিক্ষিপ্ত মাহুত তনয়ের শুণ্ডদ্বারা পৃষ্ঠে উত্তোলন প্রভৃতি বৃত্তান্ত আমরা শিশুকালে শিশুপাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছি। কোনও লেখক পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছেন, পৃথিবীতে কুক্কুরই একমাত্র নিঃস্বার্থ, সে নিজের জীবন হইতেও অন্যের জীবন বেশী ভাল বাসে। লেখক পরিহাসচ্ছলে বলিলেও উক্তিটী বিশেষ সত্য। শুনা গিয়াছে, মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও কুক্কুর প্রভুর সন্তোষ সাধন করিতেছে।

পশুপক্ষীদিগের অপত্যস্নেহ যে, মানুষের অপত্যস্নেহ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

চিল বাজ প্রভৃতির হস্ত হইতে সন্তান রক্ষার নিমিত্ত কুক্কুটের প্রাণপণ চেষ্টা, সদ্যপ্রসূতা গাভীর বৎসের অদর্শনে কাতর ভাব, প্রতিদিনই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ডেল্টা নগরের অগ্ন্যুৎপাত সময়ে বৃদ্ধ সারসের সন্তান রক্ষার জন্য অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন প্রভৃতি বৃত্তান্ত শিশুপাঠ্য পুস্তক-সমূহে সন্নিবেশিত। পাঁচ সাতটা বানর মধ্যে একটা বানরশিশু ক্রীড়া করিতেছে, কখনও একটার মাথায় কখনও অপরটার স্কন্ধে লাফ দিয়া পড়িতেছে এবং বানরদলের প্রত্যেকেই সেই একটা শিশুকে মনুষ্যসংসারে একটামাত্র "সাতরাজার ধন মাণিকের" ন্যায় কেহ বা ক্রোড়ে করিতেছে, কেহ বা মুখচুম্বন করিতেছে প্রভৃতি দৃশ্য দেখিলে কার না হৃদয় পুলকিত হয়? সন্তানের অদর্শনে বানরীরা এতই শোকাতুরা হয় যে, বেম বলেন যে, উত্তর আফ্রিকায় তিনি যে সকল বানরকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটা পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। পিতৃমাতৃহীন বানরশিশু অপর বানর দ্বারা পালিত হইতেও দেখা গিয়াছে। ডারউইন বলেন যে, তিনি একটা বানরীকে এতই দয়াবতী দেখিয়াছেন যে, বানরশিশুর ত কথাই নাই, সে কুক্কুর বিড়ালের শাবক সকলও চুরী করিয়া আনিত এবং সর্ব্বদা কোলে লইয়া বেড়াইত। একটা বিড়ালশাবক একদিন ঐ বানরীকে আঁচড়াইয়া দেওয়ায় সে তখনই তাহার পাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং আর কিছু না করিয়া তাহার নখগুলি ভাঙ্গিয়া দিল। ডারউইন বলেন যে, কোনও পশুশালায় একটা বৃদ্ধ বানর আর একটা সম্পূর্ণ অপরজাতীয় বানরশিশুকে অপত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু যখন সজাতীয় অপর দুইটা বানরশিশুকে তাহার পিঞ্জর মধ্যে দেওয়া হইল, তখন সে বিজাতীয়টাকে ত্যাগ করিল এবং সজাতীয় দুইটাকে অধিক পরিমাণে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল! তাহাতে পূর্ব্বগৃহীত পোষ্যসন্তান সময় পাইলেই নবগৃহীতদ্বয়কে বিরক্ত করিত। এই ব্যাপারে বৃদ্ধবানরের যে বিশেষ রাগ হইত, তাহাও তিনি দেখিয়াছেন। বানরেরা তাহাদের প্রভুদের ও সঙ্গী কুক্কুরদের অনেক সময় রক্ষা করিয়াছে শুনা গিয়াছে। ব্রেম বলেন যে, তাঁহার দ্বারা আবদ্ধ কতকগুলি বানর একটা বৃদ্ধ কুক্কুরকে ও অপরাপর জন্তুদিগকে বিরক্ত করিয়া আমোদ করিত।

পালিত কুক্কুরগণের মধ্যে একটার উপর প্রভুর বিশেষ দৃষ্টি হইলে অন্য গুলি যে হিংসা প্রকাশ করে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বানরে-

রাও ঐরূপ করিয়া থাকে। ইতর জন্তুগণ যে পরস্পরের প্রতি হিংসা স্পষ্ট প্রকাশ করে, তাহা নিঃসন্দেহ। তাহারা প্রভুকর্ত্তৃক প্রশংসার জন্য লালায়িত। প্রভুর দ্বারা আদিষ্ট কোন একটী কাজ করিয়াই কুক্কুর পা চাটিতে থাকে ও ঘন ঘন লাঙ্গুল সঞ্চালন করে। পুনঃপুনঃ আহার চাহিতে কুকুর লজ্জানুভব করে, তাহা প্রত্যেক সূক্ষ্মদর্শীই বুঝিতে পারিবেন। অধিকবলশালী কুক্কুর রুগ্ন দুর্ব্বল কুক্কুরের চীৎকারাড়ম্বরে কর্ণপাত না করিয়া গম্ভীরপদে চলিয়া যায়। অনেকেই জানেন যে, বানরগণের নিকটে বিকট হাস্য করিলে তাহারা বড়ই বিরক্ত হয়। ডারউইন দেখিয়াছেন যে, কোনও পশুশালায় একটী বানরের নিকট চীৎকার করিয়া কেহ কোন পুস্তক পড়িলে এতই রাগিয়া উঠিত যে, হাত পা কামড়াইয়া রক্তারক্তি করিত।

এতদ্ব্যতীত পশুদিগের মধ্যে বিস্ময়, কৌতূহল প্রভৃতি জটিল মানসিকবৃত্তিগুলিরও অভাব নাই। তাহারা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে এবং কোনও কিছুর আশায় বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইলে বিরক্ত হয়। এই বৃত্তিগুলি কুক্কুর ও বানরের আচরণে বেশ বুঝা যায়।

কোনও দেশে বাষ্পীয়যানের নূতন আগমন হইলে প্রত্যেক সূক্ষ্মদর্শী আরোহী প্রথম প্রথম বুঝিতে পারেন, ইতর জন্তুগণ তদ্দর্শনে কতই বিস্ময় অনুভব করিতেছে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে অনেক মহিষ রাত্রিকালে ট্রেণগাড়ীর সম্মুখস্থ আলোকে বিস্মিত হইয়া গাড়ী চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, এরূপ শুনা যায়। অনেক জন্তুই কৌতূহল প্রকাশ করে এবং অনেক সময় কৌতূহলপরবশ হইয়া ব্যাধের জালে নিপতিত হয়। মৃগ কলহংসনিনাদে মুগ্ধ, এদিকে ব্যাধ তাহার প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া নবুলিহগীতে আত্মহারা হইয়া বাণনিক্ষেপে অক্ষম, ইহা মহাকবির কল্পনামাত্র নহে; প্রকৃতির প্রকৃত চিত্র। কথিত আছে, অরফিয়াসের (Orpheus) বীণায় নরকের কুক্কুরও মুগ্ধ হইয়াছিল। বেদিয়া তুবড়ির আওয়াজে মুগ্ধ করিয়া সর্পকুলকে নিজ সান্নিধ্যে আনয়ন করে, একথা সকল দেশেই প্রসিদ্ধ। বানরের সর্পভয় বড়ই প্রবল। কিন্তু বানরের নিকট সাপের পেঁড়ী রাখিলে সে তাহা সর্ব্বদাই একটু উত্তোলন করিয়া দেখিবে। কোনও প্রাণিবিৎ একটী পশুশালার বানরগৃহে একটী নকল সাপ লইয়া গিয়াছিলেন। বানরগণ সাপটীকে দেখিবামাত্র ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। পরে ঐটীকে একটী বড় ঘরে রাখায় ক্রমশঃ

এক একটী করিয়া বানর আসিয়া তাহার চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই সময় তাহাদের খেলিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত একটী ছোট গোলার সামান্য শব্দে বানরের দল চমকিয়া উঠিল।

মানুষের, বিশেষতঃ অসভ্যজাতির মধ্যে অনুকরণবৃত্তি বড়ই প্রবল। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। ব্যাধিবিশেষ দ্বারা মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা (Softness of the brain) আরম্ভ হইলেই মানুষের নিকট স্বভাষায় কিম্বা পরভাষায় কেহ কোনও কথা কহিলে, কোনও রূপ অঙ্গভঙ্গী করিলে কিম্বা কোনও কাজ করিলে সে আপনা আপনিই তাহার অনুকরণ করে। ডেজর (Desor) বলেন, বানরের নিম্নস্থ কোনও জন্তুই ইচ্ছা করিয়া মানুষের কার্য্যের অনুকরণ করে না। কিন্তু বানরেরা মানুষের কার্য্যের অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। পক্ষান্তরে ইতর জন্তুদিগকে পরস্পরের কার্য্যের অনুকরণ করিতে দেখা যায়। কোনও প্রাণিতত্ত্ববিৎ একটী কুক্কুর দ্বারা পালিত দুইটী নেকড়ে বাঘকে কুক্কুরের মত শব্দ করিতে দেখিয়াছেন। কুক্কুর দ্বারা পালিত শৃগালও যে এইরূপ শব্দ করে, তাহাও তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পক্ষিশাবকেরা তাহাদের পিতা মাতার এবং কখনও কখনও অন্যান্য পক্ষীর শব্দ অনুকরণ করে। কাকাতুয়া যা শুনে, তাই বলে। ডুরো ডি লা মেল (Dureau de la Malle) মার্জ্জার-পালিত একটি কুক্কুরের বৃত্তান্ত বলিয়াছেন, কুক্কুরটি বিড়ালের মত হাত পা চাটিত। বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ অডোইন ও (Audouin) ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ডারউইন একটী কুক্কুরকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বিড়ালের ন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়াছেন। ডুরো ডি লা মেল একটী কুকুরকে বিড়ালের ন্যায় খেলা করিতে দেখিয়াছেন। আর একজন বলেন যে, একটি বিড়ালীর অনুকরণে তাহার সন্তানও একটি ক্ষুদ্র মুখবিশিষ্ট পাত্রের ভিতর হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া খাইত।

ইতরজন্তুদিগের পিতা মাতা যে তাহাদের সন্তানদিগকে নিজেদের বৃত্তি শিক্ষা দেয়, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিড়ালী তাহার সন্তানের নিকট প্রথমতঃ মৃত ও তাহার পর জীবিত ইন্দুর আনিয়া দেয়। বাজপক্ষীরাও এইরূপে তাহাদের সন্তানদের শীকার কৌশল ও দুরন্ত-

নির্ণয় শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমে মৃত পক্ষী শূন্যে নিক্ষেপ করে, পরে জীবিত পক্ষী আনিয়া তাহাদের নিকট ছাড়িয়া দেয়।

জন্তুগণের মনঃসংযোগ করিবার শক্তিও আছে, ইহা নিশ্চয়। বন্য পশু দিগন্তরে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া ধৃত হয়। কোনও গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, একজন বানরকে বাজী শিখাইয়া তাহাদিগকে বিক্রয় করিত। সে বন্য বানর ক্রয় করিবার সময় যদি তাহাদিগকে দুই একদিন গৃহে রাখিয়া ক্রয় করিতে পাইত, তাহা হইলে অধিক মূল্য দিতে স্বীকার করিত। সে বলিত, বানরের শিক্ষা কেবল তাহার মনঃসংযোগ করিবার শক্তির উপর নির্ভর করে। যে বানর মক্ষিকার বা অন্য কিছুর সামান্য শব্দে বিচলিত হয়, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। শাস্তি পাইলে শিক্ষিত বানর সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকে।

জন্তুগণের স্মরণশক্তিও অত্যন্ত অদ্ভুত। দুই বৎসরকাল অদর্শনের পরও দেখিয়াছি, গাভী পূর্ব্ববৎ আচরণ করিয়াছে। বলদেরা এক বৎসর পূর্ব্বে যে ক্ষেত্র হইতে শস্য আনয়ন করিয়াছে, এ বৎসর ও তাহাদের ঠিক সেই ক্ষেত্র মনে আছে। নিবিড় বনে পথভ্রান্ত কাষ্ঠজীবী সঙ্গী বৃষকে যথেচ্ছা আসিতে দিয়া তাহার পদানুসরণ করিয়া বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। সিংহপদতল হইতে কাঁটা বাহির করিয়া দিবার পুরস্কার স্বরূপ বন্দীর প্রাণরক্ষা অদ্ভুত ঘটনা। পিপীলিকারাও যে বিচ্ছেদের পর তাহাদের সঙ্গীদিগকে চিনিতে পারে, ইহা হিউবার (Huber) স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন।

পশুপক্ষীদের অনুমান ও চিন্তাশক্তি যে কতক পরিমাণে আছে, তাহাও নিঃসন্দেহ। মেঘের কোলে বক উড়িলেই আমরা বৃষ্টি অনুমান করি। কোন ইংরাজী পুস্তকে পড়া গিয়াছে যে, মেষপালকেরা মেষের লাঙ্গুলের ঊর্দ্ধক্ষেপ দেখিয়া ঝড় অনুমান করে। পক্ষীরা যে সময় সময় স্বপ্ন দেখে, ইহা রাত্রিকালে বৃক্ষতলায় গেলে কিম্বা গ্রীষ্মকালে শীতল স্থানে যেখানে একটী পক্ষী নিদ্রা যাইতেছে, সেখানে গেলে বেশ বুঝা যায়। পাখী হয়ত অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে কিম্বা পাখার শব্দ করিতেছে। আর যখন সকল মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাই বলেন যে, স্বপ্নদর্শন চিন্তাশক্তি না থাকিলে কখনই হইতে পারে না, তখন পক্ষীদের যে চিন্তাশক্তি কিয়ৎপরিমাণে আছে, তাহা নিশ্চয়। অনেক কুক্কুর পূর্ণিমার রাত্রে অত্যন্ত চীৎকার

করে। পণ্ডিত হুজো (Houzeau) বলেন, তাহারা চন্দ্রদর্শনে চীৎকার করে না, আকাশের নিম্নভাগে কোনও স্থির তারা দেখিয়া চেঁচায়।

পশুপক্ষীদের ও যে কিয়ৎপরিমাণে বিবেচনা শক্তি আছে, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। অনেক সময় অনেক জন্তু হঠাৎ থামিয়া যেন কি ভাবিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার হেজ (Dr. Hayes) কুক্কুরদের বিবেচনা শক্তি সম্বন্ধে অনেক সুন্দর গল্প বলিয়াছেন। হস্তীরা শুণ্ড দ্বারা দোয়ানী তুলিতে হইলে চারিদিকে ফুঁক দিয়া দোয়ানীকে উড়াইয়া একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া লয়। মিঃ ওয়েষ্ট্রপ (Mr. Westrop) ভায়েনা নগরে একটী ভল্লুককে একখণ্ড ভাসমান রুটী ধরিবার জন্য হস্তদ্বারা জলে তরঙ্গ করিতে দেখিয়াছেন। রেঙ্গার বলেন, প্যারাগোয়াতে যখন তিনি তাঁহার বানরদিগকে ডিম খাইতে দিতেন, প্রথম দিন তাহারা ডিমের সারভাগের কতকটা নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহার পর হইতে কোনও কঠিন দ্রব্যে ডিমের একদিক ঠুকিয়া বেশ আহার করিত। একবার কোনও ধারাল দ্রব্যে হাত কাটিলে তাহা তাহারা আর স্পর্শ করিত না কিম্বা অতি সাবধানে করিত। কাগজে মুড়িয়া তাহাদিগকে চিনি দেওয়া হইত। একদিন রেঙ্গার একটী জীবিত বোলৃতা চিনির সহিত দিয়াছিলেন। সেই দিন বোলৃতা দ্বারা বিদ্ধ হইয়া তৎপর দিন হইতে চিনি দিলেই আগে মোড়াটী কাণের নিকট ধরিয়া কোনও শব্দ হইতেছে কিনা দেখিয়া তাহার পর খুলিত। কুকুরদের বিবেচনা শক্তি সম্বন্ধেও এরূপ অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কলকোহন (Colquhoun) দুইটী পক্ষীর পাখায় একেবারে গুলি বিদ্ধ করেন। পক্ষী দুইটী উড়িয়া একটী নদীর অপর পারে পড়ে। তাঁহার কুকুর একবারে দুইটী জীবিত পক্ষী আনা অসম্ভব দেখিয়া একটী মারিয়া তথায় রাখিয়া জীবিতটীকে আগে আনিয়া পরে মৃতটীকে আনিল। এইরূপে অনেক শীকারীর গল্পে কুকুরদের বিবেচনার বিস্তর বিবরণ পড়া গিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিশ্বপিতা তাঁহার সৃষ্ট জীবগণের মধ্যে সকলকেই স্বল্পাধিক পরিমাণে সকল গুণে বিভূষিত করিয়াছেন। তবে মানুষ ধর্ম্মজ্ঞান ও নৈতিক কয়টী গুণের বিশেষ আধিক্যহেতু সৃষ্টির অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করে। পশুপক্ষীদিগের ভিতরও সেই সকল গুণের কণা পরিমাণে আছে কিনা বারান্তরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। *

শ্রীম — কথিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ভক্তের জন্য দেহধারণ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে রহিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর অসুস্থ। উপরের হলঘরে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও রাখাল দুইজনে পদসেবা করিতেছেন। মণি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকেও পদসেবা করিতে বলিলেন। মণিও পদসেবা করিতেছেন।

---

* দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত। For opinions see advertisement sheets

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীম--কে লিখিয়াছিলেন,—

Rawalpindi,

Dear M—— October, 1897.

C'est bon mon ami (That is good, my friend !) Now you are doing just the thing. Come out man—no sleeping all life—time is flying Bravo—that is the way.

Many many many many thanks for your publication—only I am afraid, it will not pay its way in a pamphlet form. The whole in one compact book will have more chance. * * Never mind—pay or no pay—let it see the blaze of daylight.

You will have many blessings on you and many more curses—but "বৈসাহি সদকাল বনতা সাহব!" (এইরূপ চিরকাল হইয়া আসিতেছে, মহাশয়!) This is the time.

Yours in the Lord

VIVEKANANDA.

আজ রবিবার, ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ ; ২রা চৈত্র ; ফাল্গুন শুক্লানবমী তিথি। গত রবিবারে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাগানে পূজা হইয়া গিয়াছে। গত বর্ষে ঠাকুরের জন্মমহোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া হইয়াছিল। এবার তিনি অসুস্থ। ভক্তেরা বিষাদ-সাগরে ডুবিয়া আছেন। পূজা হইল। নামমাত্র উৎসব হইল।

ভক্তেরা সর্ব্বদাই বাগানে উপস্থিত আছেন ও ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা ঐ সেবায় নিশিদিন নিযুক্ত আছেন। ছোক্‌রা ভক্তেরা অনেকেই সর্ব্বদা থাকেন ; নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু। বয়স্ক ভক্তেরা মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন ও প্রায় প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন বা তাঁহার সংবাদ লইয়া যান। তারক, সিঁতির গোপাল, ইঁহারাও সর্ব্বদা থাকেন। ছোটগোপালও থাকেন।

* * * * *

ঠাকুর আজ বিশেষ অসুস্থ। রাত্রি দুই প্রহর। আজ শুক্ল পক্ষের নবমী তিথি, চাঁদের আলোয় উদ্যানভূমি যেন আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক্‌ নিস্তব্ধ; কেবল বসন্তানিলস্পর্শে বৃক্ষপত্রের শব্দ হইতেছে। উপরের হলঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভারি অসুস্থ নিদ্রা নাই। দু একটী ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন—কখন কি প্রয়োজন হয়। এক একবার তন্দ্রা আসিতেছে ও ঠাকুরকে নিদ্রাগতপ্রায় বোধ হইতেছে। একি নিদ্রা না মহাযোগ ? 'যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'। একি সেই যোগাবস্থা ?

মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া আরো কাছে যাইতে বলিতেছেন। ঠাকুরের কষ্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয়! মাষ্টারকে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে বলিতেছেন, "তোমরা কাঁদ্‌বে বলে এত ভোগ কর্‌ছি—সব্বাই যদি বল যে—এত কষ্ট—তবে দেহ যাক্‌—তা হলে দেহ যায় !"

কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি তাঁহাদের পিতা মাতা রক্ষাকর্ত্তা, তিনি এই কথা বলিতেছেন! সকলে চুপ করিয়া

আছেন। কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম কি Crucifixion! ভক্তের জন্য দেহ বিসর্জ্জন করা!!

* * * * *

গভীর রাত্রি। ঠাকুরের অসুখ যেন আরো বাড়িতেছে! কি উপায় করা যায়? কলিকাতায় লোক পাঠান হইল। উপেন্দ্র ডাক্তার ও নবগোপাল কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া গিরীশ সেই গভীর রাত্রে আসিলেন।

ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটু সুস্থ হইতেছেন। বলিতেছেন, "দেহের অসুখ; তা হবে; দেখ্‌ছি পঞ্চভূতের দেহ।"

গিরীশের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন,—"অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখ্‌ছি! তার মধ্যে এই রূপটীও (নিজের মূর্ত্তি) দেখ্‌ছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সমাধি-মন্দিরে]

পর দিন সকালবেলা। আজ সোমবার, ৩রা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ। বেলা ৭টা ৮টা হইবে। ঠাকুর একটু সাম্‌লাইয়াছেন ও ভক্তদের সহিত আস্তে আস্তে, কখনও ইসারা করিয়া, কথা কহিতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, লাটু, শশী, সিঁতির গোপাল।

ভক্তদের মুখে কথা নাই; ঠাকুরের পূর্ব্বরাত্রের দেহের অবস্থা স্মরণ করিয়া ভক্তেরা বিষাদগম্ভীরমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

[ঠাকুরের দর্শন; ঈশ্বর, জীব, জগৎ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া, ভক্তদের প্রতি)। কি দেখ্‌ছি জান? তিনিই সব হয়েছেন! মানুষ আর আর যা জীব দেখ্‌ছি, যেন চামড়ায় সব তয়েরি—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়্‌ছেন।

"যেমন একবার দেখেছিলাম মোমের বাড়ী, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু; সব মোমের—সব এক জিনিষে তৈয়ারি।

"দেখ্‌ছি,—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাট হয়েছে!!!"

ঠাকুর কি বলিতেছেন, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তিনি নিজের শরীর জীবের মঙ্গলের জন্য বলিদান দিতেছেন?

ঈশ্বরই কামার, বলি, হাড়িকাট হইয়াছেন, এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন,—'আহা! আহা!'

আবার সেই ভাবাবস্থা। ঠাকুর বাহ্যশূন্য হইতেছেন। ভক্তেরা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন,—"এখন আমার কোনও কষ্ট নাই;—ঠিক পূর্ব্বাবস্থা!"

ঠাকুরের এই সুখদুঃখের অতীত অবস্থা দেখিয়া ভক্তেরা অবাক্ হইয়া রহিয়াছেন। ঠাকুর লাটুর দিকে তাকাইয়া আবার বলিতেছেন,—

"ঐ লোটো;—মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে;—তিনিই (ঈশ্বরই) মাথায় হাত দিয়ে যেন বসে রয়েছেন!"

ঠাকুর ভক্তদের দেখিতেছেন ও স্নেহে যেন বিগলিত হইতেছেন। যেমন শিশুকে আদর করে, সেইরূপ রাখাল ও নরেন্দ্রকে আদর করিতেছেন! তাঁহাদের মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন!

কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টারকে বলিতেছেন,—"শরীরটা কিছুদিন থাক্‌তো তো লোকদের চৈতন্য হোতো!"

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। আবার বলিতেছেন,—

"তা রাখ্‌বে না।"

ভক্তেরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার কি বলিতেছেন,—

"তা রাখ্‌বে না;—সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে! সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে!! একে কলিতে ধ্যান জপ নাই!"

রাখাল (সস্নেহে)। আপনি বলুন—যাতে আপনার দেহ থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

নরেন্দ্র। আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে!

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন—যেন কি ভাবিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্ররাখালাদি ভক্তের প্রতি)। আর বল্লে কই হয়?

"এখন দেখ্‌ছি এক হয়ে গেছে। শ্রীমতী ননদিনীর ভয়ে কৃষ্ণকে বল্লেন, তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো। যখন আবার ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণকে

দর্শন করতে চাইলেন ;—এমনি ব্যাকুলতা—যেমন বেরাল আঁচড় পাঁচড় করে,—তখন কিন্তু আর বেরোয় না!

রাখাল (ভক্তদের প্রতি, মৃদুস্বরে)। গৌর অবতারের কথা বল্‌ছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুহ্য কথা।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ।]

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভক্তদের সস্নেহে দেখিতেছেন। ঠাকুর নিজের হৃদয়ে হাত রাখিলেন ;—কি বলিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদির প্রতি)। এর ভিতর দুটী আছেন।—একটী তিনি।—

ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেছেন, আবার কি বলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন,—

"একটা তিনি ;—আর একটা ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙ্গেছিল—তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ?

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কারেই বা বোল্‌বো কেই বা বুঝ্‌বে!

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

"তিনি মানুষ হয়ে—অবতার হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।

রাখাল। তাই আমাদের যেন আপনি ফেলে না যান।

ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন,—

"বাউলের দল হঠাৎ এলো ;—নাচ্‌লে, গান গাইলে ;—আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো—গেল ; কেউ চিন্‌লে না। (ঠাকুরের ও সকলের ঈষৎ হাস্য)।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

"দেহধারণ করলে কষ্ট আছেই।

"এক একবার বলি, আর যেন আস্‌তে না হয়!

"তবে কি ;—একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ীর কড়ার ডাল ভাত ভাল লাগে না।

"আর যে দেহ ধারণ করা, এটী ভক্তের জন্য।

ঠাকুর ভক্তের নৈবেদ্য—ভক্তের নিমন্ত্রণ—ভক্ত সঙ্গে বিহার ভালবাসেন, এই কথা কি বলিতেছেন ?

*   *   *   *   *

(নরেন্দ্রের জ্ঞানভক্তি।)

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করাচার্য্য গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বল্লেন, তুই আমায় ছুঁয়ে ফেল্লি ! সে বল্লে, ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। তুমি বিচার কর, তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি ; কি তুমি, বিচার কর। শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত—সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ ;—কোন গুণে লিপ্ত নয়।

"ব্রহ্ম কিরূপ জানিস্ ? যেমন বায়ু। দুর্গন্ধ, ভাল গন্ধ—সব বায়ুতে আস্‌ছে, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।

নরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গুণাতীত। মায়াতীত। অবিদ্যামায়া বিদ্যামায়া দুয়েরই অতীত। কামিনীকাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি এ সব বিদ্যার ঐশ্বর্য্য। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যামায়া রেখেছিলেন। তুমি আর এরা যে আমার জন্য ভাব্‌ছো—এই ভাবনা বিদ্যামায়া।

"বিদ্যামায়া ধরে ধরে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। যেমন সিঁড়ির উপরের পইটে—তার পরে ছাদ।

"কেউ কেউ ছাদে পৌঁছোনোর পরও সিঁড়িতে আনাগোনা করে,—জ্ঞানলাভের পরও বিদ্যার আমি রাখে। লোকশিক্ষার জন্য। আবার ভক্তি আস্বাদ কর্‌বার জন্য—ভক্তের সঙ্গে বিলাস কর্‌বার জন্য !"

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি নিজের অবস্থা বলিতেছেন ?

(নরেন্দ্র ও সংসার ত্যাগ।)

নরেন্দ্র। কেউ কেউ রাগে আমার উপর ;—ত্যাগ কর্‌বার কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মৃদুস্বরে)। ত্যাগ দরকার।

ঠাকুর নিজের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া বলিতেছেন,—

"একটা জিনিষের পর যদি আর একটা জিনিষ থাকে, প্রথম জিনিষটা পেতে গেলে ও জিনিষটাকে সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?

নরেন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি মৃদুস্বরে)। সেই-ময় দেখ্‌লে আর কিছু কি দেখা যায়?

নরেন্দ্র। সংসার ত্যাগ করতেই হবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। যা বল্‌লুম, সেই-ময় দেখ্‌লে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার ফংসার আর কিছু দেখা যায়?

"তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়। (সহাস্যে) কারু কারু একটু ইচ্ছা ছিল—মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকা (রাখাল, মাষ্টার, ইত্যাদির ঈষৎ হাস্য)। সেই ইচ্ছা টুকু হয়ে গেল।

* * * * *

(নরেন্দ্র ও বীরভাব।)

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন,—'খুব!'

নরেন্দ্র (ঠাকুরের প্রতি সহাস্যে)। 'খুব' কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। খুব ত্যাগ হয়ে আস্‌ছে।

ঠাকুর বলিতেছেন, নরেন্দ্রের খুব ত্যাগ হয়ে আস্‌ছে।

নরেন্দ্র ও ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন।

এইবার রাখাল কথা কহিতেছেন।

রাখাল (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে)। নরেন্দ্র আপনাকে এখন খুব বুঝ্‌ছে।

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন,—

"হাঁ। আবার দেখ্‌ছি অনেকে বুঝ্‌ছে।

(মাষ্টারের প্রতি)। না গা?

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর নরেন্দ্র ও মণিকে দেখিতেছেন ও হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া রাখালাদি ভক্তদিগকে দুজনকে দেখাইতেছেন। প্রথমে ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে দেখাইলেন তার পর মণিকে দেখাইলেন। রাখাল ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

রাখাল (সহাস্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনি বল্‌ছেন, নরেন্দ্রের বীরভাব ? আর এঁর সখীভাব ?

ঠাকুর হাসিতেছেন।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)। ইনি বেশি কথা কন না, আর লাজুক ; তাই বুঝি বল্‌ছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, নরেন্দ্রের প্রতি)। আচ্ছা, আমার কি ভাব ?

নরেন্দ্র। বীরভাব, সখীভাব, সব ভাব।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণ কে ?]

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া যেন ভাবে পূর্ণ হইলেন ; হৃদয়ে হাত রাখিয়া কি বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তদের প্রতি)। **দেখ্‌ছি—এর ভিতর থেকেই যা কিছু !!**

ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি বুঝ্‌লি ?

নরেন্দ্র (ঠাকুরের প্রতি)। ('যা কিছু' অর্থাৎ) যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি, আনন্দে)। দেখ্‌ছিস্‌ ! কেমন বুঝ্‌ছে !

ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাহিতে বলিলেন। নরেন্দ্র সুর করিয়া গাহিতেছেন। নরেন্দ্রের ত্যাগের ভাব। গাহিতেছেন—

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্‌
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্‌।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

দুই এক চরণ গানের পরই ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন ; ও কি ! ও সব ভাব অতি সামান্য !

নরেন্দ্র এইবার সখীভাবের গান গাহিতেছেন—

কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান ?

ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,

ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ॥

মিলি সই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,

রূপবিহীন গোপকুঙারী।

কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,

হেন বঁধু রূপকি ভিখারী ॥

আগে নাহি বুঝনু, রূপ হেরি ভুলনু,

হৃদি বৈনু চরণ যুগল।

যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব,

আন সখি ভখিব গরল ॥

কিবা কানন বল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই,

নবীন তমালে দিব ফাঁস।

নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপই,

ছার তনু করব বিনাশ ॥

গান শুনিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতেছে।

নরেন্দ্র আবার ব্রজগোপীর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গাহিতেছেন—

কীর্ত্তনের সুর।

তুমি আমার, আমার বঁধু;
কি বলি কি বলি তোমায় বলি নাথ !
(কি জানি কি বলি আমি অভাগিনী নারীজাত)
তুমি হাতকি দর্পণ, মাথোকি ফুল।
(তোমায় ফুল করে কেশে পর্‌ব বঁধু)
(তোমায় কবরীর সনে লুকায়ে লুকায়ে রাখ্‌ব বঁধু)
(শ্যামফুল পরিলে কেউ লখ্‌তে নারে)
তুমি নয়নেরি অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল ॥
(তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে এঁখে পর্‌বো বঁধু)
(শ্যাম অঞ্জন পরেছি বলে কেউ লখ্‌তে নারে)

তুমি অঙ্গকি মৃগমদ গিমকি হার,
(শ্যামচন্দন মাখি শীতল হব বঁধু)
(তোমায় হার করে কণ্ঠে পর্‌ব বঁধু।)
তুমি দেহকি সর্ব্বস্ব গেহকি সার।
পাখীকো পাখ মীনকো পানি।
তৈযসে হাম বঁধু তুয়া মানি।

সাবিত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কোথাও ভক্তির রসে প্লাবিয়া হৃদয়,
ব্রাহ্মণকুমার সব নবীন বয়স,
মধ্যাহ্ন তপন হেন তেজস্কর দেহ,
স্বরগের জ্যোতি মাখা বদন-মণ্ডল,
করুণ-কিরণোজ্জ্বল নয়ন যুগল,
ঊর্দ্ধদেশে তুলি বাহু বাতুল সদৃশ
উন্মত্ত তাণ্ডবে ঘোর, আত্মহারা হয়ে
করে হরি-সংকীর্ত্তন ; লহরে লহরে,
ভক্তি-প্রেমরস-স্রোত উছলিয়া পড়ে ;
মৃদঙ্গের ঘাতে ঘাতে, আনন্দে অস্থির
হৃদয় নাচিয়া উঠে, তাড়িতের বেগে
চঞ্চল রুধির স্রোত শিরায় শিরায়।
কোথা ঋষি-শিষ্যগণ বিনীত স্বভাব,
বসনে আবরি পদ, সাগ্রহ অন্তরে,
আনন্দে লভিছে বিদ্যা গুরুর নিকটে।
দ্যুমৎসেন নরপতি একদা যাঁহার,
দুর্দ্দণ্ড প্রতাপবলে সশঙ্ক পৃথিবী,
আজি নিয়তির বশে—(হায় এজগতে
কে কবে দৈবের হাত পারে এড়াইতে),

অরাতি লাঞ্ছিত হয়ে, সাম্রাজ্য বিচ্যুত,
লয়ে দারাপুত্র সাথে তপস্বীর বেশে,
অনিত্য বাসনা ভোগ দূরে পরিহরি,
নিত্য নিরঞ্জন পদে দৃঢ় মন করি,
আসি এই তপোবনে শান্তির কুটীরে,
দুখতাপ নির্যাতন পরাজিত যথা,
পরম আনন্দে কাল করেন যাপন
তাপসদলের মাঝে শাস্ত্র-আলাপনে।
সত্যবান্ নামে তাঁর তনয় সুন্দর,
সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, সত্যব্রত সদা,
ধীমান্, প্রতিভাপন্ন, অদীনহৃদয়,
অসীম সাহস হৃদে, সিংহ বলে বলী,
মহাধনুর্দ্ধর বীর, সমরকুশল,
ক্ষমা ধৈর্য্যে বিভূষিত, শাস্ত্রবিশারদ,
গুরুজনে সদা ভক্তি, সতত তাঁদের
কায়মন করি পণ শুশ্রূষাতৎপর,
সর্ব্বভূতে সম দয়া, অতিথি-সেবায়
অকৃপণ চিত্তে সাধু সতত ব্যাপৃত।
প্রতিবেশী সবে তাঁর স্বজন সদৃশ।
ক্রোধ হিংসা দম্ভ সনে নাহি পরিচয়।
হঠতা বঞ্চনা মিথ্যা একান্ত ঘৃণিত।
সুন্দর সুশান্ত মূর্ত্তি ; আয়ত লোচন,
প্রতিভা মণ্ডিত চারু বদন মণ্ডলে
সততার স্ফূর্ত্তি দিব্য সতত লক্ষিত।
উন্নত বিশাল বক্ষ স্পর্দ্ধা করি কহে,
অয়স পাষাণ চূর্ণ হয় প্রতিঘাতে।
আজানুলম্বিত বাহু লৌহের অর্গল
শরীর-রক্ষক-প্রায় দুলে দুই পাশে।
সমান বিভক্ত অঙ্গ, শ্যামোজ্জ্বল কায়,
গম্ভীর সুস্বর কণ্ঠে, গজরাজ গতি।

যোগ্যে যোগ্য সম্মিলন পণ্ডিত বচন,
ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল।
সত্যবান্ সাবিত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ
যেই দিন, ভাবিলেক দোঁহে দোঁহাকারে,
পুরুষপ্রবর ইনি, নারীরত্ন উটী।
উভয়ের তরে যেন সৃষ্টি উভয়ের,
একটী সৃজনে যেন রহিত অভাব,
একটী নহিলে যেন একের জীবন
দুর্ব্বহ হইত ভবে আনন্দবিহীন ;
দোঁহে দোঁহাকার চির জীবনের সাথী ;
পাট সু-অঙ্কিত হল, হল সুরঞ্জিত,
প্রেম অনুরাগ রাগে মনোমুগ্ধকর !!
নয়নে নয়নে দোঁহে করিয়া বরণ,
ক্রমে পরিচয় হয় কথোপকথনে
নানা শাস্ত্র আলাপনে ;—দোঁহে সুবিস্মিত,
হেরি দোঁহাকার অঙ্গে, অশেষ সঞ্চিত
জ্ঞানরত্ন ; চিত্তখানি শারদ আকাশ,
তামসের লেশমাত্র করেনি পরশ।

শ্রীহা— (ক্রমশঃ)

সংবাদ ও মন্তব্য।

কলম্বো সহরে স্বামীজির জন্মতিথি মহোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তত্রস্থ বিবেকানন্দ সমিতির হলটি লতা পুষ্প দ্বারা নিপুণতা সহকারে সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছিল। মঞ্চের পশ্চাদ্বর্ত্তী দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামীজি ও তাঁহার অন্যান্য সন্ন্যাসী ভ্রাতাগণের ছবিগুলি পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা পরিশোভিত করা হইয়াছিল। হলের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" এই বাক্যটী সন্নিবেশিত ছিল। সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়। বক্তৃতার পূর্ব্বে পাঠ আবৃত্তি ও বেদগানাদি হয়॥ ব্যারিষ্টার এন্ নাগরাজ

মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন এবং সি, টি, অম্বিকাপতি মহাশয় গুরুস্তোত্র আবৃত্তি করিয়া স্বামীজি সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বামীজি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলিয়া সমিতির উন্নতিকল্পেও অনেক কথা বলেন। সভাগৃহ জনাকীর্ণ হইয়াছিল। স্থানীয় প্রথানুসারে সভামধ্যে পান সুপারি ও গন্ধদ্রব্যাদি বিতরিত হইয়াছিল এবং সভাভঙ্গের পর কতিপয় গায়ক তামিল, হিন্দুস্থানি এবং কানাড়ি ভাষায় মধুর সঙ্গীত ও ভজন করেন।

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারি রবিবার মন্থরা বিবেকানন্দ ইউনিয়ন সভায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মন্থরা নেটিভ কলেজের চিত্রাঙ্কণশিক্ষক এম্, পুণ্যকোটি নাইডু মহাশয়ের অঙ্কিত স্বামীজির একটি বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি হলে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। দিবাভাগে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও স্বামীজির "ভবিষ্যৎ ভারত" নামক বক্তৃতা পাঠ করা হয়। উৎসবোপলক্ষে সেতুপতি হাইস্কুলস্থ ভিক্টোরিয়া হলে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় এক সভা আহুত হয়। কলেজের সাম্বৎসরিক উৎসব সেই দিবস পড়া সত্বেও সভাস্থলে প্রায় ৩০০ ভদ্রলোকের সমাগম হয়। তত্রস্থ হাইকোর্টের উকিল এম্, বেঙ্কটরাম আইয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে সঙ্গীত ও স্বামীজি রচিত 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামক কবিতা আবৃত্তি করা হয়। তৎপরে এ, রাজারাম আইয়ার 'স্বামীজি ও তাঁহার শিক্ষা' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেন। তদন্তে স্বামীজির 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামক তামিল ভাষায় পদ্যাকারে অনূদিত ও মুদ্রিত কবিতা বিতরিত হয়। পরিশেষে তামিল ভাষায় প্রার্থনান্তে সভাভঙ্গ হইলে স্বামীজির প্রতিমূর্ত্তিখানি সংগীতাদিসহকারে সমারোহে জয়ধ্বনি করিতে করিতে তথা হইতে লইয়া যাওয়া হয় এবং পুষ্পচন্দন, পান সুপারি ও প্রসাদ বিতরিত হয়।

স্বামী আত্মানন্দ মান্দ্রাজ মঠে গমন করায় স্বামী বিমলানন্দ বাঙ্গালোর বেদান্ত সমিতির সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে তিনটি ক্লাস করিতেছেন। তিনি সমিতির ছাত্রদিগকে প্রতি বৃহস্পতিবারে উপনিষদ্ ও শনিবারে স্বামীজির কর্ম্মযোগ বুঝাইয়া দেন এবং রবিবারে সর্ব্বসাধারণের জন্য পঞ্চদশী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

নিউইয়র্ক হইতে কোনও সংবাদদাতা লিখিতেছেন—

গত ২৭শে জানুয়ারি অত্রস্থ বেদান্ত সমিতিতে স্বামীজির জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হয়। অতীব আনন্দের বিষয় যে, সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসবও সেই দিবস পড়িয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় যে বেদান্ত-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সুন্দর ফলপুষ্পশোভী বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাহা এই সভায় সকলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী নির্ম্মলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যাগ্রণী স্বামীজির সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। তাঁহারা স্বামীজির প্রতি যে প্রগাঢ় প্রেম বহন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বক্তৃতায় তাহা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েও কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইয়াছিল। সমিতির মন্দিরগৃহে সভা আহূত হইয়াছিল এবং মন্দিরবেদীটী ফলপুষ্পে পরিশোভিত করা হইয়াছিল। সভাপতি অধ্যাপক পার্কার ও সমিতির ধনাধ্যক্ষ গুডইয়ার সাহেব বক্তৃতা করেন এবং মিস্ ওয়াল্‌ডো এখানে প্রথম বেদান্ত প্রচার করিতে স্বামীজিকে যেরূপ বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, স্বামীজির শিক্ষাসম্বন্ধেও কিছু বলেন। মিসেস্ কেপ ও মিস্ গ্লেন মহোদয়া কিছু কিছু বলিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯০৪ সালের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসমেত ২৫০০ শত রোগী এখান হইতে ঔষধ পথ্যাদি পাইয়া রোগমুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ৫৪০ জন স্ত্রীলোক এবং ১৯৬০ জন পুরুষ। এই সেবাশ্রমে মোট ৫৬ জন রোগীকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়; তাঁহারা সকলেই সাধু। অবশিষ্ট ২৪৪৪ জন আশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া যান। ইহাঁদের মধ্যে ৮২৮ জন সাধু, ২৩০ জন মুসলমান, ৩৩৫ জন ব্রাহ্মণ, ১৬২ জন ছত্রী, ১৮০ জন বৈশ্য ও অবশিষ্ট শূদ্রজাতি। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আশ্রম হইতে ঔষধাদি দ্বারা সেবা করা হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের দুই জন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী এই সকল রোগীর সেবায় প্রাণপণ যত্নে নিযুক্ত থাকিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছেন ও জগতের সমক্ষে মহান্ সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

উদ্বোধনের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কলিকাতানিবাসী জনৈক

সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে গত ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে আশ্রমের জন্য ১৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়। তথায় কয়েকটী কুটীর নির্ম্মিত হইয়া আশ্রমের কার্য্য চলিতেছিল। কিছু দিন পরে বাবু ভজন লাল লোহিয়া প্রমুখ কয়েকটী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ৬১০৭৲ টাকা ব্যয়ে দুইটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই বৎসর আশ্রমে সর্ব্বশুদ্ধ জমা ৮৭৩৷৶৪ পাই সর্ব্বশুদ্ধ খরচ ৫২১৷৷৶১১ পাই। এতদ্ব্যতীত অনেক সহৃদয় মহোদয় ব্যক্তি খাদ্য ঔষধ এবং আশ্রমের ব্যবহারার্থ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দান করিয়া আমাদের সবিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বম্বে হইতে কোনও সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—

গত ৩১শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে মান্দ্রাজ মেলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এখানে পঁহুছিয়াছেন। গত শনিবার ফ্রামজি কাওয়াসজি ইন্‌ষ্টিটিউশন হলে এই সমিতির সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সভা হইয়াছিল। সার্ বালকৃষ্ণচন্দ্র নাইট মহোদয় সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রায় ৩০০ ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। স্বামীজি ৪ঠা এপ্রিল বৈকালে আর্য্যসমাজগৃহে "ভক্তিযোগ" সম্বন্ধে ও ৬ই তারিখে সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা সমাজে "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বিচারপতি চন্দ্রভারকার সভাপতি ছিলেন। আগামী শনিবার (৮ই এপ্রিল) ফ্রামজি কাওয়াসজি হলে পুনরায় সভা হইবে। বক্তৃতার বিষয় "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও শিক্ষা"—বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের সভাপতি হইবার কথা আছে। এবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে সাধারণভাবে সভা আহূত হওয়ায় স্থানীয় সংবাদপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দোলন হইয়াছে। প্রথম দিনের সভার কার্য্যবিবরণী এখানকার দৈনিক "ইন্দুপ্রকাশে" প্রকাশিত হইযাছে। তাহা ছাড়া "আকবরী সওদাগর" "জামে জামশেদ" "বম্বে গেজেট" ও তিলক মহোদয় পরিচালিত "কেশরী"তে উক্ত বিবরণী বিস্তারিত রূপে বাহির হইয়াছে। "কেশরী"তে তিলক মহোদয় এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী বেদান্ত ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সেট্‌লুর মহাশয় এখানে একটী অনাথাশ্রম খুলিবার কথা বলেন। শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উপস্থিতিতে আমাদের সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ আগামী রবিবার মান্দ্রাজের জন্য রওনা হইবেন।

নিউইয়র্ক বেদান্তসমিতিতে বিগত ৮ই মার্চ্চ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত উৎসব হইয়াছিল। সমিতির ছাত্র ও অন্যান্য বন্ধুগণ ভক্তিভরে ফুল আনিয়া বেদী সজ্জিত করিলেন। প্রথমে ধ্যান করা হইল। পরে স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নেও ধ্যান ও দুই ঘণ্টা ধরিয়া চণ্ডীপাঠ হইল।

তৎপরে স্বামী নির্ম্মলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্য জীবনের ঘটনাবলি বলিতে লাগিলেন,—সকলেই প্রত্যেক কথা পরম আগ্রহে শুনিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ হইতে নির্ব্বাচিত কিছু কিছু অংশ পঠিত হইল। উহা সকলেরই প্রাণে আনন্দ দান করিয়াছিল।

স্বামী অভেদানন্দ প্রতি মঙ্গলবার সায়ংকালে ৮টার সময় 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত' নামক কয়েকটী বক্তৃতা ধারাবাহিক ক্রমে দিতেছেন। ১৯০৫ সালের মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসের জন্য তাঁহার রবিবাসরীয় সাধারণ বক্তৃতাগুলির নাম ও তারিখ দেওয়া গেল:—৫ই মার্চ্চ প্রাকৃতিক ক্ষতিপূরণের নিয়ম; ১২ই ঐ জনৈক সাধুর আত্মবিজয়; ১৯শে একাগ্রতার শক্তি; ২১শে ঐ জড় ও চৈতন্য। ২রা এপ্রেল প্রাণায়ামের আরোগ্যকারিণী শক্তি; ৯ই ঐ ভাবাবস্থা ১৬ই ঐ দৈনিক জীবনে বেদান্ত; ২৩শে ঐ যোগবিভূতি; ৩০শে ঐ প্রত্যাদেশ।

গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা ইটালি রামকৃষ্ণ মিশনে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন, কাঙ্গালীভোজন প্রভৃতি হইয়াছিল।

আমরা সান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্তসমিতি হইতে স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রদত্ত 'Mental Healing' (মনঃশক্তিবলে রোগচিকিৎসা) নামক একটী বক্তৃতা (অতি সুন্দর ভাবে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত) উপহার পাইয়াছি। আমেরিকায় আজকাল এই মতের দিন দিন প্রভাব বাড়িতেছে। এই মতের সহিত বেদান্তের সামঞ্জস্য ও বিরোধ উভয় দিক্‌ই প্রদর্শন করিতে বক্তা অতি উত্তমরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

স্বামীজির স্মৃতি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন] [ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত।

২২শে জানুয়ারী ১৮৯৮ সাল। ১০ই মাঘ শনিবার।

সকালে উঠিয়াই হাত মুখ ধুইয়া বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটস্থ বলরাম বাবুর বাটীতে স্বামীজির কাছে উপস্থিত হইয়াছি। একঘর লোক। স্বামীজি বলিতেছেন, "চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের উপর বিশ্বাস চাই। Strength is life, weakness death. আমরা আত্মা, অমর, মুক্ত। Pure, pure by nature. আমরা কি কখন পাপ করিতে পারি? অসম্ভব। এই রকম বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাসই আমাদের মানুষ করে, দেবতা করে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই ত দেশটা উৎসন্ন গিয়েছে।"

প্রশ্ন। এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন করে নষ্ট হল?

স্বামীজি। ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education পেয়ে আস্‌ছি। আমরা কিছু নই, এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জন্মেছে, তা আমরা জান্তেই পাই না। Positive কিছু শেখান হয় নি। হাত পার ব্যবহার ত জানিই নি। ইংরেজদের সাত গুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ দাদার খবর রাখিনা। শিখেছি কেবল দুর্ব্বলতা। জেনেছি যে, আমরা বিজিত, দুর্ব্বল, আমাদের কোন বিষয়ের স্বাধীনতা নেই। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন? দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আন্‌তে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তা হলেই দেশের যত কিছু problems ক্রমশঃ আপনা আপনই solve হয়ে যাবে।

প্রশ্ন। সব দোষ শুধ্‌রে যাবে, তাও কি কখন হয়? সমাজে কত অসংখ্য দোষ রয়েছে। দেশে কত অভাব রয়েছে, যা পোরাবার জন্যে কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য দেশহিতৈষী দল কত আন্দোলন ও ইংরেজ বাহাদুরের কাছে কত প্রার্থনা কর্‌ছে। এসব অভাব কিসে পূরণ হবে?

স্বামীজি। অভাবটা কার? রাজা পূরণ করবে না তোমরা পূরণ করবে?

প্রশ্ন। রাজাই অভাব পূরণ কর্‌বেন। রাজা না দিলে আমরা কোথা থেকে কি পাব, কেমন করে পাব?

স্বামীজি। ভিখিরীর অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ কর্‌লে সব রাখ্‌তে পার্‌বে, সে লোক কই? আগে মানুষ তৈরি কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আস্‌লে মানুষ কি করে হবে?

প্রশ্ন। মহাশয়, majorityর কিন্তু এ মত নয়।

স্বামীজি। Majorityরা ত fools, men of common intellect. মাথা-ওয়ালা লোক অল্প। এই মাথাওয়ালা লোকেরাই সব কাজের সব department-এরই নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে majorityরা চলে। এদেরই আদর্শ করে চল্‌লে কাজও সব ঠিক হয়। আহম্মকেরাই শুধু হামবড়া হয়ে চলে, আর মরে। সমাজ সংস্কার আর কি কর্‌বে? তোমাদের সমাজ সংস্কার মানে ত বিধবার বিয়ে আর স্ত্রীস্বাধীনতা বা ঐরকম আর কিছু। তোমাদের দুই এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছ ত? দুই চার জনের সংস্কার হ'ল, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিষ্কার হলেই হল, আর যারা মরে মরুক।

প্রশ্ন। তা হলে কি কোন সমাজ সংস্কারের দরকার নেই বলেন?

স্বামীজি। দরকার আছে বই কি। আমি তা বল্‌ছি না। তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুন্‌তে পাই, তার মধ্যে অনেক গুলোই অধিকাংশ গরীব সাধারণদের স্পর্শই কর্‌বে না। তোমরা যা চাও, তাদের তা আছে। এজন্য তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে কর্‌বে না। আমার কথা এই যে, শ্রদ্ধার অভাবই আমাদের মধ্যে সমস্ত evils এনেছে ও আরও আন্‌ছে। আমার চিকিৎসা হচ্চে রোগের কারণকে নির্ম্মূল করা—রোগ চাপা দিয়ে রাখা নয়। সংস্কার আর দরকার নেই? যেমন ভারতবর্ষে intermarriageটা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্ব্বলতা এসেছে।

* * * *

সেদিন সূর্য্যগ্রহণ। বক্সারে পূর্ণগ্রাস দেখা যাইবে। দেশ বিদেশ হইতে অনেকে সে দৃশ্য দেখিতে আসিযাছেন। পাশ্চাত্য দেশ হইতে অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তাঁহাদের সময়োপযোগী যন্ত্রাদি লইয়া, প্রকৃতির নূতন তত্ত্ব যদি কিছু আবিষ্কৃত হয়, তাহা আবিষ্কার করিতে আসিয়াছেন। এই সব কথা শ্রোতাদিগের মধ্যে দুই এক জন আলোচনা করিতে লাগিলেন। স্বামীজিকেও ঐ সব ভদ্র বিদেশীদিগের উদ্যম ও অধ্যবসাযের কথা বলিতে লাগিলেন। যে শ্রোতা এতক্ষণ প্রশ্ন করিতেছিলেন, তিনি সকলকে একটু

ব্যস্ত দেখিয়া স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, বলিলেন যে, আমি আর এক দিন আস্‌ব। আজ গঙ্গাস্নান কর্‌তে হবে। বাসাটা অনেক দূর, এখন আসি।

* * * *

২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৮ সাল। ১১ই মাঘ রবিবার।

বাগবাজার বলরাম বাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হইয়াছে। স্বামীজি উপস্থিত আছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ আদি অনেকেই আসিয়াছেন। স্বামীজি পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। বারাণ্ডাটী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ দিকের ও উত্তর দিকের বারাণ্ডাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ। স্বামীজি কলিকাতায় থাকিলে নিত্যই এইরূপ হইত। স্বামীজি সুন্দর গান গাহিতে পারেন, অনেকে শুনিয়াছেন। অধিকাংশের গান শুনিবার ইচ্ছা দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ফিস্ ফিস্ করিয়া দুই একজনকে, স্বামীজির গান শুনিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। স্বামীজি নিকটেই ছিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন।

স্বামীজি। কি বল্‌ছ মাষ্টার বলনা? ফিস ফিস্ কর্‌ছ কেন?

মাষ্টার মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে অতঃপর স্বামীজি "যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে" গানটি ধরিলেন। যেন বীণার ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। যাঁহারা তখনও আসিতেছেন, সত্যই তাঁহারা সিঁড়ি হইতে যেন গানটা বেহালার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গীত হইতেছে মনে করিলেন। গান শেষ হইলে স্বামীজি মাষ্টার মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হয়েছে ত? আর গায় না। নেশা ধরে যাবে। আর গলাটা লেক্‌চার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। voice টা roll করে।" * * * *

অতঃপর স্বামীজি এক শিষ্য ব্রহ্মচারীকে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীটী সভাস্থলে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতান্তে শচীন বাবু ও আর দুই একজন বক্তৃতার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলেন। স্বামীজি তাঁহার অনুগত আর একজন গৃহীকে বলিলেন, "এর সপক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বল্‌বার থাকে ত বল্।" গৃহী ভক্তটি দুই একটী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, এমন সময় শচীন বাবু আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, বক্তা যে বলিলেন, "ভক্তিটা হীন অধিকারীর জন্য, এটা কেমন কথা? যতক্ষণ শরীর থাক্‌বে, ততক্ষণ দ্বৈত থাক্‌বেই। সমাধি

না হলে ত এক জ্ঞান হয় না। আর সেই অবস্থাতেই একত্বের অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু সমাধি ভঙ্গের পরে আর তা থাকে না।" গৃহী যুবকটী অতঃপর অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেন। বলিলেন, "এক ভিন্ন দুই নেই, দ্বৈত দৈত আবার কি? দ্বৈত কর্‌তে কর্‌তে দ্বৈতই থাকে।" ইত্যাদি। ইহার পর গৃহী যুবাটীর সহিত শচীন বাবুর ঘোরতর তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল। তর্ক ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া স্বামীজি ও তুরীয়ানন্দ স্বামী উভয়ে তর্কবিতর্ক থামাইয়া দিলেন।

স্বামীজি। রেগে উঠ্‌লি কেন? তোরা বড় গোল করিস্। তিনি (পরমহংসদেব) বল্‌তেন, 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক'। ভক্তিমতে ভগবান্‌কে প্রেমময় বলা হয়। তাঁকে ভালবাসি, একথাও বলা যায় না। তিনি যে ভালবাসাময়। যে ভালবাসাটা হৃদয়ে আছে, তাই যে তিনি। এইরূপ যার যে টান, সে সমস্তই তিনি। চোর চুরি করে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করে, মায়ে ছেলেকে ভালবাসে, সে সব জায়গায়ই তিনি। একটা জগৎ আর একটাকে টান্‌ছে, সেখানেও তিনি। সর্ব্বত্রই তিনি। জ্ঞানপক্ষেও সর্ব্বস্থানে তাঁকে অনুভূত হয়। এইখানেই জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। যখন ভাবে ডুবিয়া যায়, অথবা সমাধি হয়, তখনই দ্বিভাব থাকৃতে পারে না, ভক্তের সহিত ভগবানের পৃথকৃত্বও থাকে না। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবান্ লাভের জন্য পাঁচভাবে সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে যোগ করা যেতে পারে—ভগবান্‌কে অভেদ ভাবে সাধন করা। ভক্তেরা অদ্বৈতবাদীদের অভেদবাদী ভক্ত বলিতে পারেন। মায়ার ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকৃবেই। দেশ, কাল, নিমিত্ত বা নাম রূপের নামই মায়া। যখন এই মায়ার পারে যাওয়া যায়, তখনই একত্ব বোধ হয়, তখন মানুষ দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী থাকে না, তার কাছে তখন সব এক, এই বোধ হয়। জ্ঞানী ও ভক্তের তফাৎ কোথায় জানিস্? একজন ভগবান্‌কে বাহিরে দেখে আর একজন ভগবান্‌কে ভিতরে দেখে। তবে ঠাকুর বল্‌তেন, ভক্তির আর এক অবস্থাভেদ আছে, যাকে পরাভক্তি বলা যায়। মুক্তিলাভ করে, অদ্বৈত জ্ঞানে অবস্থিত হয়ে তাঁকে ভক্তি করা। যদি বলা যায়, মুক্তিই যদি হয়ে গেল, তবে আবার ভক্তি করবে কেন? এর উত্তর এই,—মুক্ত যে, তার পক্ষে কোন নিয়ম বা প্রশ্ন হতে পারে না। মুক্ত হয়েও কেহ কেহ ইচ্ছা করে ভক্তি রেখে দেয়।

প্রশ্ন। মশায়, এ ত বড় মুস্কিলের কথা। চোরে চুরি কর্‌বে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি কর্‌বে, সেখানেও ভগবান্; তা হলে ভগবান্‌ই ত সব পাপের দাযী হলেন।

স্বামীজি। ঐ রকম জ্ঞান একটা অবস্থার কথা। ভালবাসা মাত্রকেই যখন ভগবান্ বলে বোধ হবে, তখনই কেবল ঐ রকম মনে হতে পারে। সেই রকম হওয়া চাই। ভাবটার Realisation হওয়া দরকার।

প্রশ্ন। তা হলেও ত বল্‌তে হবে, পাপেতেও তিনি।

স্বামীজি। পাপ আর পুণ্য বলে আলাদা জিনিষ ত কিছু নেই। ওগুলো ব্যাবহারিক কথা মাত্র। আমরা কোন জিনিষের এক রকম ব্যবহারের নাম পাপ ও আর এক রকম ব্যবহারের নাম পুণ্য দিয়া থাকি। যেমন এই আলোটা জ্বলার দরুণ আমরা দেখ্‌তে পাচ্চি ও কত কাজ কর্‌ছি, আলোর এই এক রকম ব্যবহার। আবার এই আলোতে হাত দাও, হাত পুড়ে যাবে। এটা ঐ আলোর আর এক রকম ব্যবহার। অতএব ব্যবহারেই জিনিষটা ভাল মন্দ হয়ে থাকে। পাপ পুণ্যটাও ঐ রকম। আমাদের শরীর মনের কোন শক্তিটার সুব্যবহারের নামই পুণ্য ও কুব্যবহার বা অপচয়ের নাম পাপ।

তাহার পর প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। একজন বলিলেন, "একটা জগৎ আর একটাকে টানে, সেখানেও ভগবান্, এ কথা সত্য হক আর না হক, এর মধ্যে বেশ poetry আছে।"

স্বামীজি। "নাহে বাপু, ওটা poetry নয়। ওটা জ্ঞান হলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।" *

তাহার পর আবার প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। Mill, Hamilton,

* স্বামীজির ঐ কথাতে আমি এই বুঝিয়াছিলাম যে, জড় ও চেতন ব্যাবহারিক কথায় পৃথক্ পৃথক্ বস্তু হলেও, এক বস্তুরই রূপান্তর মাত্র এবং তদ্রূপ জড় বা অন্তর্জগতে যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি, সে সমস্তও, এক শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশে প্রতীত হইয়া থাকে। সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় জড়, এমন কোন বস্তু নাই। সেটাকে আমরা বস্তুর চেতন অবস্থা দেখিয়া থাকি, যে অবস্থাসমূহে তদপেক্ষা স্বল্প শক্তি প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থাসমূহই বস্তুর জড়াবস্থা বলিয়া উপলব্ধ হয়। যে শক্তি জড় অবস্থায় আকর্ষণ রূপে প্রকাশিত থাকে, তাহাই আবার চেতনাবস্থায় স্পন্দন হইয়া ভালবাসাদি রূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

Herbert Spencer ইত্যাদির দর্শন হইতে প্রশ্ন হইতে লাগিল। স্বামীজি সকলেরই যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। উত্তরে সকলেই মহা-সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার উত্তরদানে তৎপরতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষে আবার প্রশ্ন হইল।

প্রশ্ন। ব্যাবহারিক প্রভেদই বা হয় কেন? লোকের কোন শক্তি মন্দরূপে ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তিই বা হয় কেন?

স্বামীজি। নিজের নিজের কর্ম্ম অনুসারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্ম্মকৃত; সেইজন্য প্রবৃত্তি আদি দমন বা তাকে সুচারুরূপে চালনা করাও সম্পূর্ণ নিজের হাতে।

প্রশ্ন। সবই কর্ম্মের ফল হলেও, গোড়া ত একটা আছে! সেই গোড়াতেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভাল মন্দ হয় কেন?

স্বামীজি। কে বল্লে গোড়া আছে? সৃষ্টি যে অনাদি। বেদের এই মত। ভগবান্ যতদিন আছেন, তাঁর সৃষ্টিও ততদিন আছে।

আর একজন প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা মশায়, মায়াটা কেন এল? আর কোথা থেকে এল?"

স্বামীজি। ভগবান্ সম্বন্ধে কেন বলাটা ভুল। কেন বলা যায় কার সম্বন্ধে? যার অভাব আছে, তারই সম্বন্ধে। যার কোন অভাব নেই, যে পূর্ণ, তার পক্ষে আবার কেন কি? 'মায়া কোথা থেকে এল'—এরূপ প্রশ্নই হতে পারে না। দেশ, কাল, নিমিত্তের নামই মায়া। তুমি আমি সকলেই এই মায়ার ভিতর। তুমি প্রশ্ন কর্‌ছ ঐ মায়ার পারের জিনিষ সম্বন্ধে। মায়ার ভিতর থেকে মায়ার পারের জিনিষের কি কোন প্রশ্ন হতে পারে?

অতঃপর অন্য দুই চারিটী কথার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমরাও সকলে আপন আপন বাসায় ফিরিলাম।

* * * * * *

২৪শে জানুয়ারি ১৮৯৮ সাল ১২ই মাঘ সোমবার।

গত শনিবার যে লোকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি আবার আসিয়াছেন। তিনি intermarriage সম্বন্ধে আবার কথা পাড়িলেন। বলি-

লেন, "ভিন্ন জাতির সহিত আমাদের কিরূপে আদান প্রদান হতে পারে?"

স্বামীজি। বিধর্ম্মী জাতিদের ভিতর আদান প্রদান হবার কথা আমি বলি না। অন্ততঃ আপাততঃ উহা সমাজবন্ধনকে শিথিল করে নানা উপদ্রবের কারণ হবে, এ কথা নিশ্চিত। জান ত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন—

'ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নং' ইত্যাদি (গীতা)।

স্বধর্ম্মীদের মধ্যেই বিবাহ প্রচলনের কথা আমি বলে থাকি।

প্রশ্ন। তা হলেও ত অনেক গোল। মনে করুন, আমার এক মেয়ে আছে, সে এদেশে জন্মেছে ও পালিত হয়েছে। মনে করুন, তার বিয়ে দিলুম এক পশ্চিমে মেড়ুয়ার সঙ্গে বা মান্দ্রাজির সঙ্গে। বিয়ের পর, মেয়েও জামাইয়ের কথা বোঝে না; জামাইও মেয়ের কথা বোঝে না। আবার পরস্পরের দৈনিক ব্যবহারাদিরও অনেক তফাৎ। বর কনের সম্বন্ধে ত এই গণ্ডগোল। আবার সমাজেও মহা বিশৃঙ্খলা এসে পড়্‌বে।

স্বামীজি। ও রকম ধরণের বিয়ে হতে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরি। একেবারে ও রকম করাও ঠিক নয়। কাজের একটা secret হচ্ছে to go by the way of least possible resistance। সেইজন্য প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক। এই বাঙ্গালা দেশের কায়স্থদের কথা ধর। এখানে কায়স্থদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ইত্যাদি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নাই। প্রথমে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক্। যদি তা সম্ভব না হয়, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীতে হোক্। এইরূপে যেটা আছে, সেটাকেই গড়্‌তে হবে—ভাঙ্গার নাম সংস্কার নয়।

প্রশ্ন। আচ্ছা না হয় বিয়েই হল, তাতে ফল কি? উপকার কি?

স্বামীজি। দেখ্‌তে পাচ্চনা, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধর্‌তে গেলে সব ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হতে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগ আদিও এসে জুট্‌ছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভিতরই রক্তটা চলা ফেরা করে দূষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল বালকেই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেই জন্য তাদের

শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resist করবার ক্ষমতাও ওই সব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্য রকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়্‌লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে ও এখনকার চাইতে ঢের active হবে।

প্রশ্ন। আচ্ছা মশায়, early marriage সম্বন্ধে আপনার মত কি?

স্বামীজি। বাঙ্গালাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার নিয়মটা উঠে গিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও পূর্ব্বের চেয়ে দুই এক বছর বেশী বড় করে বিয়ে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে টাকার দায়ে। তা যে জন্যই হোক্, মেয়েগুলোর আরও বড় করে বিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বাপ বেচারীরা করবে কি? মেয়ে বড় হলেই বাড়ীর গিন্নি থেকে আরম্ভ করে যত আত্মীয়ারা ও পাড়ার মেয়েরা বে দেবার জন্য নাকে কান্না ধরবে। আর তোমাদের ধর্ম্মধ্বজীদের কথা বলে আর কি হবে! তাদের কথা ত আর কেউ মানে না, তবুও তারা আপনারাই মোড়ল সাজে। রাজা বল্লে যে, বার বৎসরের মেয়ের সহবাস করতে পারে না, অমনি দেশের সব ধর্ম্মধ্বজীরা 'ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল' বলে চীৎকার আরম্ভ করলে। বার তের বছরের বালিকার গর্ভ না হলে তাদের ধর্ম্ম হবে না! রাজাও মনে করেন, বা রে এদের ধর্ম্ম! এরাই আবার political agitation করে, political right চায়।

প্রশ্ন। তা হলে আপনার মত যে, মেয়ে পুরুষের সকলেরই বেশী বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত।

স্বামীজি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা না হলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হবে। তবে যে রকম শিক্ষা চলেচে, সে রকম নয়। Positive কিছু শেখা চাই। খালি বই পড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে character form হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই।

প্রশ্ন। মেয়েদের মধ্যে অনেক সংস্কার দরকার।

স্বামীজি। ঐ রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems মেয়েরা আপনারাই solve করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপেনে ভাবই

শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদ্‌তেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যেও self-defence শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দিখিন্ ঝান্সির (Jhansi) রাণী কেমন ছিল!

প্রশ্ন। আপনি যা বল্‌ছেন তা বড়ই নূতন ধরণের, আমাদের মেয়েদের মধ্যে সে রকম শিক্ষা দিতে এখনও সময় লাগ্‌বে।

স্বামীজি। চেষ্টা কর্‌তে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও শিখ্‌তে হবে। খালি বাপ হলেই ত হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে কর্‌তে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষাও ত সহজে দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুর মেয়ে—সতীত্ব কি জিনিষ, তা তারা সহজেই বুঝ্‌তে পারবে; এটা তাদের heritage কি না। প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ করে তাদের মধ্যে উস্কে দিয়ে তাদের character form কর্‌তে হবে—যাতে তারা বিবাহ হোক বা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যে রকম সময় পড়েছে, তাতে তাদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল থেকে আছে, তার বলেই তাদের মধ্যে কতকগুলিকে চিরকুমারী করে রেখে ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হতে পারে, তাও শেখাতে হবে। তা হলে তারা অতি সহজেই ঐ সব শিখ্‌তে পার্‌বে ও ঐ রূপ শিখ্‌তে আমোদও পাবে। আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য এই রকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন। ঐরূপ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন করে হবে?

স্বামীজি। তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উল্টে যাবে। এখন ধরে বিয়ে দিতে পারলেই হল! তা নয় বছরেই হোক দশ বছরেই হোক! এখন এ রকম হয়ে পড়েছে যে, তের বছরের মেয়ের সন্তান হলে গুষ্টিশুদ্ধর আহ্লাদ কত, তার ধুমধামই বা দেখে কে? এ ভাবটা উল্টে গেলে ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্ধাও আসতে পারবে। যারা ঐ রকম ব্রহ্মচর্য্য কর্‌বে, তাদের ত কথাই নেই——কতটা শ্রদ্ধা, কতটা নিজেদের উপর বিশ্বাস তাদের হবে, তা বলা যায় না।

শ্রোতা মহাশয় এতক্ষণ পরে স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজি বলিলেন, "মাঝে মাঝে এস"। তিনি বলিলেন, "ঢের উপকার পেলুম ; অনেক নূতন কথা শুন্‌লুম্, এমন আর কখনও কোথাও শুনি নাই।" সকাল হইতে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এখন বেলা হইয়াছে দেখিয়া আমিও স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

স্নান আহারাদি ও একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাগবাজারে চলিলাম। আসিয়া দেখি, স্বামীজির কাছে অনেক লোক। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতেছে। হাসি তামাসাও চলিতেছে। একজন বলিয়া উঠিলেন, "মহাপ্রভুর কথা নিয়ে এত রঙ্গরসের কারণ কি? আপনারা কি মনে করেন, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করেন নাই?"

স্বামীজি। কে বাবা তুমি? কাকে নিয়ে ফষ্টিনাষ্টি কর্‌তে হবে? তোমাকে নিয়ে নাকি? মহাপ্রভুকে নিয়ে রঙ্গ তামাসা করাটাই দেখ্‌ছ বুঝি? তাঁর কাম কাঞ্চন ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীবনটা গড়্‌বার ও লোকের ভিতর সেই ভাবটা ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা দেখ্‌তে পাচ্ছনা। শ্রীচৈতন্যদেব মহা ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাক্‌তেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া নেড়ীর দল কর্‌লে। আর তিনি যে প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। তা কখন সাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তাঁর প্রেমটাকে সাধারণের ভিতর ঢোকাবার চেষ্টা কর্‌লেন। কাজেই সাধারণ লোকে সে উচ্চ প্রেম ভাবটা নিতে পার্‌লে না ও সেটাকে নায়ক নায়িকার দূষিত প্রেম করে তুল্‌লে।

প্রশ্ন। মশায়, তিনি ত আচণ্ডালে হরিনাম প্রচার কর্‌লেন, তা সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজি। প্রচারের কথা হচ্চে নাগো, তাঁর ভাবের কথা হচ্চে—প্রেম প্রেম——রাধাপ্রেম। যা নিয়ে তিনি দিন রাত মেতে থাক্‌তেন——তার কথা হচ্ছে।

প্রশ্ন। সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজি। সাধারণের সম্পত্তি করে কি হয়, তা এই জাতটা দেখে বোঝ না। ওই প্রেম প্রচার করেই ত সমস্ত জাতটা মাগী হয়ে গিয়েছে। সমস্ত উড়িষ্যাটা কাপুরুষ ও ভীরুর আবাস হয়ে গিয়েছে। আর এই বাঙ্গালা দেশটায় চারশ বছর ধরে রাধাপ্রেম করে কি দাঁড়িয়েছে দেখ। এখানেও পুরুষত্বের ভাব প্রায় লোপ হয়েছে। লোকগুলো কেবল কাঁদ্‌তেই মজবুত হয়েছে। ভাষাতেই ত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়——তা চারশ বছর ধরে বাঙ্গালা ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে, সে সব এক কান্নার সুরে। প্যান-প্যানানি ছাড়া আর কিছু নাই। একটা বীরত্বসূচক কবিতাও জন্ম দিতে পারেনি!!

প্রশ্ন। ওই প্রেমের অধিকারী তবে কারা হতে পারে?

স্বামীজি। কাম থাক্‌তে প্রেম হয় না——এক বিন্দু থাক্‌তেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও প্রেমের অধিকারী কেউ নয়। ওই প্রেম সাধারণের সম্পত্তি কত্তে গেলে নিজেদের এখনকার ভিতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠ্‌বে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিন্নিদের সঙ্গে প্রেমের কথাই মনে উঠ্‌বে। আর প্রেমের যে অবস্থা হবে, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ।

প্রশ্ন। তবে কি ওই প্রেমের পথ দিয়ে ভজন করে—ভগবান্‌কে স্বামী ও আপনাকে স্ত্রী ভেবে ভজন করে—তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) লাভ করা গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব?

স্বামীজি। দু এক জনের পক্ষে সম্ভব হোলেও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যে অসম্ভব, একথা নিশ্চিত। আর একথা জিজ্ঞাসারই বা এত আবশ্যক কি? মধুর ভাব ছাড়া ভগবান্‌কে ভজন কর্‌বার আর কি কোন পথ নেই? আর চারটে ভাব আছে ত, সে গুলো ধরে ভজন করনা? প্রাণ ভরে তাঁর নাম কর না? হৃদয় খুলে যাবে। তার পরে যা হবার আপনি হবে। তবে একথা নিশ্চিত জেন যে, কাম থাক্‌তে প্রেম হয় না। কাম-শূন্য হবার চেষ্টাটাই আগে কর না। বল্‌বে, তা কি করে হবে—আমি গৃহস্থ। গৃহস্থ **হলেই** কি কামের একটা জালা হতে হবে? স্ত্রীর সঙ্গে কামজ সম্বন্ধ রাখ্‌তেই হবে? আর মধুর ভাবের উপরেই বা এত ঝোঁক কেন? পুরুষ হয়ে মাগীর ভাব নেবার দরকার কি?

প্রশ্ন। হাঁ, নামকীর্ত্তনটাও বেশ। সেটা লাগেও বেশ; শাস্ত্রেও

কীর্ত্তনের কথা আছে। চৈতন্যদেবও তাই প্রচার কর্‌লেন। যখন খোলটা বেজে উঠে, তখন প্রাণটা যেন মেতে উঠে। আর নাচ্‌তে ইচ্ছা করে।

স্বামীজি। বেশ কথা ; কিন্তু কীর্ত্তন মানে কেবল নাচাই মনে করনা। কীর্ত্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা যেমন করেই হোক। বৈষ্ণবদের মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্তু তাতেও একটা দোষ আছে। সেটা থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে যেও। কি দোষ জান ? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোক দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও রিরি করে, তার পর যেই সংকীর্ত্তন থামে, তখন সে ভাবটা হু হু করে নাব্‌তে থাকে। যত উঁচু ঢেউ উঠে, নাব্‌বার সময় সেটা তত নিচুতে নাবে। বিচার-বুদ্ধি সঙ্গে না থাক্‌লেই সর্ব্বনাশ—সে সময়ে রক্ষা পাওয়া ভার। কামাদি নীচ ভাবের অধীন হযে পড়্‌তে হয়। আমেরিকাতেও ওইরূপ দেখিচি, কতকগুলো লোক গির্জ্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনা কর্‌লে, ভাবের সঙ্গে গাইলে, লেক্‌চার শুনে কেঁদে ফেল্লে—তার পর গির্জ্জা থেকে বেরিয়েই বেশ্যালয়ে ঢুক্‌ল।

প্রশ্ন। তা হলে মহাশয়, চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রচারিত ভাব গুলির ভিতর কোন্ গুলি নিলে আমাদের কোনরূপ ভ্রমে পড়্‌তে হবে না এবং মঙ্গলও হবে ?

স্বামীজি। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভগবান্‌কে ডাক্‌বে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখ্‌বে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তাঁর heart, সর্ব্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ কর্‌বে।

প্রশ্নকার (স্বামীজিকে লক্ষ্য করিয়া)। ঠিক বলেছেন মশায়। আমি আপনার ভাব প্রথমে বুঝ্‌তে পারিনি। (করযোড়ে) মাপ কর্‌বেন। তাই আপনাকে বৈষ্ণবদের মধুর ভাব নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কর্‌তে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল।

স্বামীজি। (হাসিতে হাসিতে)। দেখ, গালাগাল যদি দিতেই হয় ত ভগবান্‌কে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি তেড়ে যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। ভগবান্ ত সে সব পার্‌বেন না।

এইবার প্রশ্নকর্ত্তা তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়াছি, স্বামীজি কলিকাতায় থাকিতে নিত্যই এইরূপ লোকের ভিড় হইত। তাঁহার নিকট এইরূপ লোকসমাগম পরে আর কখনও দেখি নাই। লোকের বিরাম নাই। সকাল হইতে রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত লোকের যাওয়া আসা হইত। খাওয়া দাওয়াও বড় অসময়ে হইত। সেইজন্য অনেকে জনতা বন্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময় কাহারও সঙ্গে দেখা করিবেন না, এইরূপ করিবার জন্য স্বামীজিকে অনেকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চিরপরহিতাকাঙ্ক্ষী স্বামীজির প্রেমিক হৃদয়, জন সাধারণের এইরূপ ধর্ম্মপিপাসা দেখিয়া একেবারে গলিয়া গিয়াছিল,—তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকা সত্বেও জনতারোধ সম্বন্ধে কাহারও কথা তিনি রাখিলেন না। বলিলেন, "তারা এত কষ্ট করে দূর থেকে হেঁটে আস্‌তে পারে আর আমি এখানে বসে বসে, একটু নিজের শরীর খারাপ হবে বলে, তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারিনি?"

অতঃপর আর কোন কথা হইল না। সভা ভাঙ্গিয়া গেল। দুই চারি জন লোক ভিন্ন আর কেহ রহিল না। এখন বেলা তিন চারিটা হইবে। স্বামীজির সহিত অন্য কথাবার্ত্তা উপস্থিত কয়েক জনের সঙ্গে হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কথাও হইতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজি বলিলেন, ইংলণ্ড হইতে আস্‌বার সময পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। Mediterranean Sea তে আস্‌তে আস্‌তে জাহাজে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখি— বুড় থুড়থুড়ে ঋষিভাবাপন্ন একজন লোক আমাকে বল্‌ছে—"তোমরা এস, আমাদের পুনরুদ্ধার কর,—আমরা হচ্চি সেই পুরাতন 'থেরাপুত্ত' সম্প্রদায়,—ভারতের ঋষিদের ভাব লইয়াই যাহা গঠিত হইয়াছে। খৃষ্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহই, যিশুর দ্বারা প্রচারিত বলিয়া, প্রকাশ করিয়াছে। নতুবা যিশুনামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। ওই বিষয়ক নানা প্রমাণাদি এই স্থান খনন করিলে পাওয়া যাইবে।" আমি বলিলাম, "কোথায় খনন করিলে ওই সকল প্রমাণ চিহ্নাদি পাওয়া যাইতে পারে?" বৃদ্ধ বলিল, 'এই দেখনা এইখানে,' বলিয়া টর্কির নিকটবর্ত্তী একটী স্থান দেখাইয়া দিল। অতঃপর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তাড়া-

তাড়ি উপরে যাইয়া কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন জাহাজ কোন্ স্থানের নিকট উপস্থিত হইযাছে?" কাপ্তেন বলিল, "ওই সম্মুখে টর্কি এবং ক্রীটদ্বীপ দেখা যাইতেছে।" গল্প বলিয়াই স্বামীজি হাসিতে লাগিলেন, স্বপ্ন কিনা! অতঃপর আমি স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সাবিত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রাতঃকৃত্য করি শেষ নৃপ অশ্বপতি
বসি রাজসিংহাসনে, বিবিধ রতনে
খচিত ; শিখিনী পুচ্ছ সুন্দর যেমন।
কনক মুকুট শিরে, হেমদণ্ড করে।
বামে মন্ত্রিবর বসি, চতুঃপার্শ্বে যত
অমাত্য, বেষ্টিত চন্দ্র যেন তারাদলে।
ছত্রধর ধরি ছত্র ; ঢুলায় চামর
যত চামরধারিণী ; প্রহরী যতেক,
বর্ম্মাবৃত, চর্ম্ম শূল তরবার করে,
চৌপাশে দণ্ডায়মান, যুড়ি দুই কর।
সম্মুখে আসীন বন্দী, "জয়" উচ্চারিয়া,
বেণুর স্বস্বন সনে করে স্তুতিপাঠ।
হেন কালে বায়ু সহ আসিল ভাসিযা,
নভঃপথে দূর হতে সঙ্গীত সুস্বর।
প্রথমে অস্ফুট যেন অলির গুঞ্জন
মৃদু মন্দ, পরে স্ফুট কভু বা অস্ফুট ;
ক্রমে দিব্য শুনা যায় ছয় রাগ যেন
ছত্রিশ রাগিণীসহ তালমান সাথে,
সঙ্গীত তরঙ্গে নভঃ করিছে প্লাবিত।
দশদিক্ আমোদিত দেবপুষ্পবাসে,

কে যেন নন্দনবন আনিল ভূতলে।
দেবদেহ জ্যোতিচ্ছটা চকিল সহসা,
উজলি দিঙ্মুখ, ক্ষণপ্রভালোক হেন।
দৌবারিক, সদা নম্র, আসি নিবেদিল
রাজপদে, ভূমিপানে হেলায়ে মস্তক,
"জয়" শব্দ উচ্চারিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে ;—
"হে রাজন্! দ্বারে তব তাপসসত্তম
নারদ, যাচেন ভিক্ষা রাজদরশন।"
"সসম্মান আমন্ত্রিয়া," কহিলা নৃপতি,
"যাও শীঘ্র সভাতলে কর আনয়ন।"
সায়ং আকাশে যথা রোহিণী-রঞ্জন
দেন দেখা, পিছে করি শুক্র জ্যোতিষ্কেরে ;
সেই মতে ঋষিবর পিছে দৌবারিক
প্রবেশিল, সভাস্থল করিয়া উজ্জ্বল।
গলে পারিজাত মালা। ভক্তে সন্তোষিতে,
লক্ষ্মীপতি পরাইয়া দেছেন সাদরে) ;
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিভূষা, শ্বেত পট্টবাস,
শ্বেত উত্তরীয় শিরে ; করে ধৃত বীণা
মৃদু মন্দ ঝঙ্কারিত অঙ্গুলি আঘাতে।
বয়সে প্রবীণ কিন্তু নবীন শরীর,
পুণ্যদেহ পরশিতে ভীত যেন জরা।
আবক্ষলম্বিতশ্মশ্রু, তুষারধবল
শ্বেত জটাজূট শিরে অসংযত পড়ি
স্কন্ধে বক্ষে পৃষ্ঠদেশে, গাঙ্গেয় লহর
নির্ম্মল, শঙ্কর শিরে সুন্দর যেমতি।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি পদে, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া
পূজি দেবঋষিবরে, রত্নাসন আনি
দিইলা বসিতে,—আপনি সেবক হেন
নৃপকুলনিধি মালবেয় ; মহতের
মান, মহৎ নহিলে, জানে কি রাখিতে ?

বিজ্ঞাপি সে ভাগ্য নিজ কুশল জিজ্ঞাসি,
জিজ্ঞাসিলা—"হে ঋষিসত্তম! পারে কি এ
দাস সুধাইতে কোন্ শুভ করি চিন্তা,
চিরঋণী এ জনের, ভৃত্যের মন্দিরে
আগমন? এ বিশ্বাস জগৎ জনের,—
নহে স্বার্থসিদ্ধি হেতু, ধরার মঙ্গলে
ত্যজি সাধু সহবাস, দেব সন্নিধান,
চিরনরস্পৃহনীয় লভ্য বহু তপে
অবিচ্ছিন্ন আনন্দের আলয় গোলোক,
দুঃখময় এ সংসারে পর্য্যটন তব?"
"নৃপকুলমণি তুমি; ধরণী মণ্ডলে,
দ্বিতীয় দেবেন্দ্র প্রায়, ধর্ম্ম আচরণে
দেবতা সন্তুষ্ট সদা, তব দরশন,
আকাঙ্ক্ষিত দেবনরে জানিবা সতত।"—
উত্তরিলা হরিপ্রিয়। সহসা তখন
পিতৃপদ বন্দিবারে আইলা সভায়,
সাবিত্রী; জন্মায়ে ভ্রান্তি তপোধন চিতে
তেয়াগি বৈকুণ্ঠ সদ্য উপজিলা হেথা,
বিষ্ণুপ্রিয়া, হরপ্রিয়া কৈলাস বা ত্যজি।
প্রণমি জনক পায়, নমি ভক্তিভরে
ঋষিপদে, জিজ্ঞাসিয়া কুশল তাঁহার,
দাঁড়াইলা একপার্শ্বে সহ সহচরী।
সুধান সাদরে নৃপ সম্বোধি কন্যায়
"শুনি তব সখীমুখে হে প্রিয়নন্দিনী!
দ্যুমৎসেন নৃপতির খ্যাত সুতবরে
সত্যবানে বরিয়াছ, সত্য কি বচন?"
মৌন রহিলেক কন্যা, হেরিলা রাজেশ
সলজ্জ নয়ন দুটী ভূতলে পতিত,
চারু চিত্রিয়াছে ব্রীড়া রক্তিম বরণে
গণ্ডতল, প্রাভাতিক ভানুকরে যথা—

শতদল-দল অতি সুরঞ্জিত ভায়।
বিকম্পিত অধরোষ্ঠ, পল্লব যেমতি
মৃদুবাতে ; সর্ব্ব অঙ্গে চাঞ্চল্য বিকাশ।
দমি পরে এইরূপ চিত্তের বিকার
বাহ্যিক স্ফুরণ অঙ্গে, কহিলা বিনীতা
(সুস্বনে আনন্দ রাশি ছড়ায়ে চৌদিকে)
"হে পিতঃ, আদেশ তব শিরোমণি মম,
যে দিন দিইলা আজ্ঞা স্বয়ম্বরা হয়ে
স্বতন্ত্রা বরিতে পতি, ভ্রমি কত দেশ
সহ প্রিয় সহচরী, বরিলাম শেষ,
শূর বীর ধীর গুণময় ধর্ম্মপ্রাণ
সর্ব্বপ্রিয় সত্যবানে।"—হেরিলা বিস্ময়ে
নরবর তাপসের প্রফুল্ল বদন
আনন্দের জ্যোতিহারা, প্রভাতের যথা
নক্ষত্র, ঝটিকা অন্তে কুসুম যেমতি।
কাতরে করুণ বাক্যে সুধান নৃপতি
"সহসা বিবর্ণ মুখ হে বৈষ্ণব-নিধি,
কহ কি কারণ তব, শাল্বপতিসুত,
নহে কি সে বরণীয়, নহে কি তাহার
গুণরাশি, মানবের ভূষণ স্বরূপ ?"
　উত্তরিলা গদগদ দেবপ্রিয়-ঋষি
জগতের হিতব্রতে অর্পিত জীবন,
"সত্যবান্, হে নরেন্দ্র, এ মহীমণ্ডলে
পুরুষপ্রবর খলু, মানিবে বিস্ময়
একক্ষেত্রে একত্রিত সমূহ-সম্ভাব
হেরি তায়, বিধাতার অদ্ভুত সৃজন!
কিন্তু কটু, যথা হায়, তিক্তের মিলনে
অমৃত ; চন্দন বিষ, বিষের সংযোগে ;
তেমতি এ গুণরাশি, একমাত্র দোষে
অগুণ, নিরায়ু হায় দ্যুমৎ-কুমার,

বৎসরের আয়ুমাত্র অবশিষ্ট তাঁর।"
এত বলি নীরবিলা, ঝরিলা নয়নে
অশ্রুবিন্দু, পদ্মপত্রে নীরবিন্দু যথা।
পরদুঃখ শেলসম বাজে বে সতত
কোমল হৃদয়ে, হায়, পীড়িয়া নিতরা।

ক্রমশঃ।

প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ইহুদী জাতির ইতিহাস।

ইউসেফের রাজত্বকালে জেরুজালেম নগরে খুব জলকষ্ট হয়। তাঁহার ভ্রাতারা নিতান্ত কাতর হইয়া মিশরদেশে জলক্রয় করিতে যান। মন্ত্রী ইউসেফ অচিরে তাঁহাদের চিনিতে পারিলেন ও যতক্ষণ না তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বেঞ্জামিনকে লইয়া আইসে, ততক্ষণ জলক্রয় করিতে দিলেন না। অগত্যা তাহারা বেঞ্জামিনকে লইয়া আসিল ও সকল ভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া সদ্ভাবে বাস করিতে লাগিল। প্রায় সকল ইহুদীই এই সময় মিশরের অধিবাসী হইল।

ইউসেফ স্বয়ং মন্ত্রী হওয়ায় ভ্রাতা ও সহচরবর্গকে রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, তাহারাও বিশেষ গণ্যমান্য হইয়া উঠিল। প্রচুর অর্থাগম হওয়াতে তাহারা ঐদেশেই বাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইয়া তাহারা সংখ্যায় অনেক হইল। মিশরদেশে সকল রাজা ইহুদীগণকে স্নেহচক্ষে দেখিতেন না, কেহ কেহ অত্যাচারও করিতেন। কাইরোর পিরামিড্ নির্ম্মাণ কালে অনেক ইহুদীকে ধরিয়া কুলির কর্ম্ম করান হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুয়েজ ক্যানাল খননকালে পুরাতন মিশরদেশীয় প্রথানুসারে লোকদিগকে ধরিয়া এইরূপ বলপূর্ব্বক কর্ম্ম করান হইয়াছিল। ইহাকে Corve বা বেগারি বলে। মিশরদেশের সম্রাড়্গণের মধ্যে সম্ভবতঃ রমাসিস তৃতীয়। ইনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার

একটী মাত্র কন্যা ছিল। কন্যাটী এক দিবস সহচরী সমভিব্যাহারে নীল নদীতে স্নান করিতে যান ও পুরাতন কাইরো নগরের কিঞ্চিৎ দূরে উলু-খড়যুক্ত নদীতটে পিত্তলের হাড়ির ভিতর একটী জীবন্ত শিশু দেখিতে পান। রাজকুমারী এই শিশুটীকে দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট হইলেন ও নিজ অপত্যনির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। ফেরো রমাসিস তাহাকে আপন দৌহিত্ররূপে গ্রহণ করিলেন ও ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধি-কারী বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। মুশার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ। তাঁহার প্রাপ্তি-স্থান অদ্যাপিও পুরাতন কাইরো নগরের দর্শকদিগকে দেখান হয়। ভবি-ষ্যতে রাজা হইবেন, এই নিমিত্ত অতি যত্ন সহকারে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হইতে লাগিল ও মিশরদেশীয় ধর্ম্মপ্রণালীতে তাহাকে দীক্ষা দেওয়া হইল। এক দিবস মুশা পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, একজন মিশরদেশীয় লোক একটী ইহুদীকে হত্যা করিল। তাহাতে তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুণ্নমনা হন। দ্বিতীয় দিবসও তিনি আর একটী এইরূপ ঘটনা দর্শন করেন ও ইহুদীদিগের অপমান দেখিয়া সেই মিশরদেশীয় লোকটীকে হত্যা করেন ও বালুকাভ্যন্তরে নিহিত করিয়া রাখেন।

ক্রমে ক্রমে এই কথা রমাসিসের কর্ণগোচর হইল। ইহা শুনিয়া তিনি নিতান্ত সংশয়ান্বিত ও ভীত হন, পাছে মুশা ইহুদীদিগের নেতা হইয়া রাজ্যে কোনও বিপ্লব উৎপাদন করেন। এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া মুশা কাইরো সহর হইতে পলায়ন করেন এবং কয়েক বৎসর নানা দেশ পর্য্যটন ও নিতান্ত কঠোর তপস্যাদি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া কাইরো নগরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

মুশা একটু তোতলা ছিলেন। এ্যারন (Aaron, আরবী—হারুন) তাহার এক ভ্রাতা। তিনি বিশেষ বাক্‌পটু ছিলেন। মুশা তাহাকে সম্রাটের নিকট দৌত্যকর্ম্মে প্রেরণ করেন ও ইহুদীদিগকে মোচন করিবার প্রস্তাব করেন। রাজা কোনমতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে মুশার শক্তিতে রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার দৈব উৎপাত ঘটিতে লাগিল ও ক্রমশঃ ইহুদীরা মুক্ত হইল। এই সূত্রে মুসলমানেরা মুশা সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত গল্প বলিয়া থাকে, যাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কথিত আছে,—মুশা ইহুদীদিগকে দেশত্যাগের পূর্ব্বে কাইরোবাসীদিগের নিকট হইতে বহু ঋণ করিয়া অচিরে পলায়ন করিতে পরামর্শ দেন এবং যাই-

বার সময় একটী মেষ কাটিয়া তাহার রক্ত বহির্দ্বারে লাগাইয়া তিক্ত শাক ও খামিরাবিহীন রুটি দণ্ডায়মান হইয়া ভোজন করিতে বলেন। এই প্রথাকে Passover কহে। অদ্যাপিও উক্ত দিবস ইহুদীদিগের পর্ব্ব দিন রূপে পরিগণিত এবং প্রত্যেক ইহুদী ঐ দিবস পূর্ব্বপ্রথানুযায়ী ভোজন করে।

মুশা এইরূপে স্বগণ সঙ্গে কাইরো হইতে বহির্গত হইয়া এক মরুভূমির নিকট যান। তথায় একটী কূপ আছে—তাহাকে বির-মুশা (মুশার কূপ) বলে। এই স্থানটীকে আরবী ভাষায় জবল্ খেসাব বা Petrified Forest বলে। এই স্থানে বৃক্ষ বা কাষ্ঠ সমস্ত প্রস্তর (Fossil) হইয়া গিয়াছে। মুশা এই স্থান হইতে বাহির হইয়া আরবদেশের মরুভূমিতে ইহুদীগণকে লইয়া ৪০ বৎসর পর্য্যটন করেন ও অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু ঈশ্বরাভিপ্রেত স্থান কেনানে পঁহুছিতে পারেন নাই। কেনান ডামাস্কাসের নিকট এবং উহার বর্ত্তমান নাম গণত্রা। মিশরদেশের পুরাতন ধর্ম্মবিধান পাঠ করিলে মুশাপ্রবর্ত্তিত বিধানের সহিত উহার অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে একই ব্যক্তি রাজা ও প্রধান যাজক হইতেন। মুশা রাজা হইবার জন্য মনোনীত হওয়ায় মিশরদেশীয় প্রধান যাজকের কর্ম্মও তাঁহাকে শিখিতে হইয়াছিল। এই সকল মিশরদেশীয় বিধান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া মুশা আপনার স্বনামখ্যাত ধর্ম্মবিধান প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মুশা একজন খুব শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। আরবদেশে ইহাঁর অপর একটী বিশেষ নাম কালম্ উল্লা অর্থাৎ ভগবানের সহিত যিনি কথা কহিতে পারেন।

আরবেরা কিমিয়া (Alchemy) জানিতে নিতান্ত উৎসুক। তাহাদের বিশ্বাস, এমন কোন বস্তু আছে, যাহা তাম্রের সহিত মিশ্রিত করিলে উহা অচিরে স্বর্ণ হইয়া যায়। এই বস্তু অন্বেষণের নিমিত্ত তাহারা প্রচুর অর্থব্যয় করে। এমন কি, আপনার বসতবাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া তামাকে অচিরে স্বর্ণ করিবে এই আশায় সর্ব্বস্বান্ত হয়। এরূপ দুই একটী দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে। নবাগত বিদেশী লোক হইলে তাহারা প্রথম প্রশ্ন করে, আপনি কিমিয়া জানেন কি? এইরূপ প্রশ্ন করায় অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকে। আরবদিগের মধ্যে এক প্রবাদ আছে যে, মুশা এ বিষয় প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার সমুদয় পুস্তক লিখিয়া-

ছিলেন। কিন্তু পাছে সাধারণ লোকে স্বর্ণপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া অনায়াসে অবগত হয়, এই নিমিত্ত তিনি সাঙ্কেতিক ভাষায় এই সুবর্ণ করিবার নিয়ম লিখিয়াছিলেন। কয়েকটী এইরূপ শ্লোক আরবেরা প্রায়ই উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার কয়েকটী বর্ণ সংযোগ করিলে তাম্র, পারদ প্রভৃতি শব্দ বুঝায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। ইহার অমূলকত্ব প্রতিপাদন করিতে কেহ চেষ্টা করিলে তাহারা মুশার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উহার প্রতিবাদ করে।

এ প্রসঙ্গে মুশার সম্বন্ধে আর একটী কথাও বলা আবশ্যক। আরবেরা মহম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে ও তাঁহাদিগের লিখিত পুস্তকগুলি ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া গ্রহণ করে। তাহারা মুশাকে ঈশ্বরপ্রেরিত লোক বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহুদীগণের ধর্ম্মপুস্তকাদি তাঁহার রচিত বলিয়া স্বীকার করে না। আরবেরা বলে ঐগুলি ইহুদিগণের স্বকপোলকল্পিত। মুশা স্বর্ণাক্ষরে বহুসংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আনিতে প্রায় ৭০টী উষ্ট্রের আবশ্যক হইয়াছিল। সে সকল পুস্তক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ও মুশার ধর্ম্মবিধান কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। ইহুদীরা পরে নূতন মত প্রবর্ত্তন করিয়াছে ও মুশার নাম করিয়া কয়েকখানি পুস্তক নিজেরা রচনা করিয়াছে। মুসলমানেরা চারিখানি পুস্তক ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করে,—তওরাৎ (মুশার পুস্তক), জবুর (দাউদের পুস্তক),আঞ্জিল (ঈশার পুস্তক) আলকোরাণ (মহম্মদের পুস্তক)। মুসলমানেরা বলে, প্রথম তিনখানি পুস্তক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল কোরাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৪০ বৎসর পর্য্যটন করিয়া মুশা অভীষ্ট স্থানে পঁহুছিতে পারিলেন না। ইহুদীরা আসিয়া বহু পরে কেনান নামক স্থানে বাস করিল। কিন্তু পূর্ব্ব শত্রু আসীরিয়েরা (নামরুদের বংশীয়গণ) ইহাদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিত। আসীরিয় রাজা সেনাশরিব বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ইহুদীদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার সকল সৈন্য নিহত হয়। নিনিভা রাজ্যের অপর নাম আসিরিয়া বা খল্‌দিয়া।

নিনিভারাজ্য ধ্বংসের পর বাবিলেরা মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইহার আধুনিক নাম মেসোপটেমিয়া। ইহা ইস্পাহান পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং আধুনিক বোগদাদ, কারবালা প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভূত ছিল। নেবুকাড্‌নাজাব বা বক্ত-

নাসার সমস্ত ইহুদীদিগকে বাবিলনে লইয়া যান ও তথায় বাস করিতে আদেশ করেন। এই মহানিক্রমণের সময় কতিপয় ইহুদীকে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণস্থ ফ্রিজিয়া দেশে বাস করিতে আজ্ঞা করেন এবং তাহাতে ইহুদী ও অপর জাতি মিশ্রিত হইয়া আরমানি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। নেবুকাড্‌নাজার সমানীত অল্পসংখ্যক ইহুদী অদ্যাপি পারস্যদেশে বাস করিতেছে। ইস্পাহান নগরের একটী বিশেষ পল্লীতে তাহারা বাস করে—তাহা জু-বারা বা ইহুদী পল্লী বলিয়া অভিহিত। এখানে ইহুদীদিগকে জুদি বলে। কথিত আছে—ডানিয়েল নামক এক অল্পবয়স্ক ইহুদী বাবিলনে আসিয়াছিলেন এবং বেল্‌থশাজার নাম ধরিয়া রাজার প্রধান নপুংসকের অধীনে ভৃত্যের কর্ম্ম করিতেন। ডানিয়েলের জীবনে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সকল বলা অনাবশ্যক। বাবিলনদেশীয় রাজা বেলশাজার একদা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া স্ত্রীলোক লইয়া যখন মহা আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, তখন দেয়ালের উপর অগ্নিময় অক্ষরে এই বাক্যটী দেখিয়া নিতান্ত ভীত ও বিস্মিত হইলেন। বাক্যটী এই,—মিনি মিনি টিটিল ইউফারসিন্‌ অর্থাৎ তোমার রাজত্ব তুলাদণ্ডে ওজন করা হইয়াছে—ওজনে কম হওয়াতে মিড ও পারসীদিগকে দেওয়া হইল। বহুসংখ্যক জ্যোতির্ব্বিদ্‌ আসিল, কেহই ইহার অর্থ করিতে পারিল না, অবশেষে ডানিয়েল আসিয়া ইহার অর্থ করিয়া দেন ও তাহাতে রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে উচ্চপদ প্রদান করেন।

এক সময় ডানিয়েল এক স্বপ্ন দেখেন যে, একটী সিংহের সহিত একটা মেষের যুদ্ধ হইল ও সিংহটী অচিরে মরিয়া গেল। অবশেষে পাশ্চাত্য দেশ হইতে এক ছাগ আসিল ও মেষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে মেষের প্রাণ বিয়োগ হইল ও ছাগটীর শৃঙ্গ ক্রমশঃ অতি দীর্ঘ হইয়া উঠিল, অবশেষে সহসা শৃঙ্গটী ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গেল। ইহার অর্থ এই যে, বাবিলোনিয়ান রাজত্বের পর পারস্যরাজ্য উঠিবে ও তাহার পর আলেক্‌জাণ্ডারের রাজত্ব বিস্তার হইবে এবং আলেক্‌জাণ্ডারের সহসা মৃত্যু হইবে।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এরূপ এক প্রবাদ আছে যে, বাবিলনে আনীত হইবার সময় কতিপয় অল্পসংখ্যক ইহুদী চীনদেশে পলায়ন করে। অদ্যাপি তাহারা তথায় বাস করিতেছে। তাহারা ডানিয়েলের

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী ধর্ম্মপুস্তককে পবিত্র বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু তৎ-পরবর্ত্তী পুস্তকাদি গ্রাহ্য করে না।

বেলশাজারের রাজত্বকালে পারস্যবিজেতা খসরু (Cyrus) বাবিলন অবরোধ করেন ও পরিশেষে উহা তাঁহারই হস্তগত হয়। বাবিলন রাজত্ব ধ্বংস হইলে পারস্যরাজ্য প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইল। এই সময় ইহুদীদিগের অদৃষ্ট কিঞ্চিৎ সুপ্রসন্ন হইল। খসরু নিতান্ত উদারস্বভাব ছিলেন। তিনি বহু ইহুদীকে অর্থসাহায্য করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি দেন। এই সময়ে পারস্যদেশের রাজধানী সুসান (বর্ত্তমান সুস্তার বা সুস) করুণ নদীর পার্শ্বে স্থাপিত ছিল। যদিও বহুসংখ্যক ইহুদী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু পারস্যদেশীয় রাজাদের বিশেষ অনুগ্রহ পাওয়াতে কেহ কেহ সুসানে রহিয়া গেল ও রাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। বক্তিয়ারী দেশ ভ্রমণ কালে সুসানে যাইয়া কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। সুস্তারিরা বলে, ডানিয়েলের এখানে মৃত্যু হয় এবং তাঁহার স্মরণার্থ নির্ম্মিত একটী সমাধিমন্দিরও দেখাইয়া থাকে। পরন্তু আরবদিগের মতে ডানিয়েল মোসলের নিকট প্রাণত্যাগ করেন ও তথায় তাঁহার সমাধিমন্দির। সুস্তারিদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও মুখশ্রী দেখিলে তাহারা পূর্ব্বে ইহুদী ছিল, পরে মুসলমান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং পারস্যদেশীয় মুসলমানদিগের ইতিহাস ও সুস্তারিদিগের কথিত ইতিহাস অনুসারে ইহাই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহুদীদিগের দ্বাদশ শাখার মধ্যে যে দশ শাখার কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ ইহারা তাহার এক শাখা।

পারস্যদেশে যখন জারাক্সিস্ রাজসিংহাসনে আরূঢ়, তখন তিনি এস্থা নাম্নী এক ইহুদীকন্যাকে বিবাহ করেন। নিহিমিয়া নামক জনৈক ইহুদী-কুমার রাজার সরবতদার (Page) ছিল। নিহিমিয়া নিতান্ত বিষণ্ণভাবে কয়েকদিন রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়। এক দিবস রাজা তাহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় নিহিমিয়া কহিল, তাহার স্বজাতিরা অতিশয় কষ্টে বাস করিতেছে ও তাহাদিগের উপর অনেক কঠোর দণ্ডনীতি প্রচলিত আছে। রাজা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া নিহিমিয়াকে বহু পরিমাণে অর্থ দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দেন এবং জেরুজালেম নগর ও মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দেন। এই সময় দেশদেশান্তর হইতে বহুসংখ্যক ইহুদী আসিয়া

প্যালেষ্টাইনে পুনরায় বাস করিতে লাগিল।

ইহুদীরা স্বদেশে আসিয়া সঙ্গতিপন্ন হইল ও কিছুকাল পরে দাউদ তাহাদিগের রাজা হইল। দাউদ নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জাতির উপর ইহুদীদিগের অধিকার বিস্তার করেন ও পূর্ব্বকথিত দুর্গ প্রভৃতি কয়েকটী অট্টালিকা সংস্কার করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র আব্‌সলাম পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহী হওয়ায় একিটোফেল নামক সেনাপতি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। দাউদ অতি শোকার্ত্ত হইয়া পুত্রের স্মরণার্থ একটী সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করান। ইহা জেরুজালেম ও জৈতুন পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী কিড্রন্ নদীর সোলোআম নামক পুলের সম্মুখে অদ্যাপি বর্ত্তমান, কিন্তু এই মন্দিরে গ্রীকদিগের নির্ম্মাণপ্রণালী স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

দাউদের অপর পুত্র সলোমন বা সলিমান রাজা হইলেন। ইনি অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীগণ নানাধর্ম্মাবলম্বিনী ছিল। তিনি তাহাদের জন্য নানাস্থানে নানারূপ মন্দির নির্ম্মাণ করান। ইহাঁর সময় জেরুজালেম নগর অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে ইহুদীদিগের মন্দিরটী অতি সুরম্য। কথিত আছে যে, সালোমনের নিমিত্ত একবার ভারতবর্ষ হইতে চন্দনকাষ্ঠ Myrrh (সুগন্ধিবিশেষ) প্রভৃতি বহুবিধ উপঢৌকন যায়। কথিত আছে—লিবানন পর্ব্বত হইতে বৃক্ষচ্ছেদ করিয়া কাষ্ঠ আনিয়া তিনি বহুসংখ্যক গৃহনির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি লিবানন পর্ব্বতে কোন অরণ্য বা বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। জেরুজালেম নগরেও কোন গৃহ কাষ্ঠনির্ম্মিত নহে। স্থানীয়লোকেরা কাষ্ঠাভাবে প্রস্তরের খিলান ও ছাদ প্রস্তুত করে।

সলোমানের নাম বুদ্ধিমান্ বলিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে সাবাদেশের (বর্ত্তমান আবিসিনিয়া) রাণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আধুনিক আবিসিনিয়াতে এক জাতি আছে। ইহারা আপনাদিগকে ইহুদী বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের ইতিবৃত্ত এই যে, ইহারা সলোমনের ঔরসে পূর্ব্বোক্ত রাজ্ঞীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধর। অপরাপর ইহুদীদের সহিত ইহাদের বিবাহ ও পান ভোজনাদি প্রচলিত নহে। ধর্ম্মবিষয়েও ইহাদের সহিত অন্যান্য ইহুদীদের অনেক প্রভেদ আছে।

সলোমনের সময় একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার সংঘটিত হয়, এই সময় Freemason সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। এই সম্প্রদায়ের কি মত

তাহা সাধারণ লোকে বিশেষ অবগত নহে এবং তন্মতাবলম্বী ব্যতীত কেহই জানিতে পারেন না।

জেরুজালেম সহরটি দ্বিতল, উপরে নানাপ্রকার গৃহাদি আছে। অভ্যন্তরেও অতিশয় দীর্ঘ বহুসংখ্যক গৃহ আছে। ঐতিহাসিক জোসেফাস বলেন যে, সহরনির্ম্মাণকালে এমন একস্থান হইতে প্রস্তর লইয়া আসিত যে, খননকালে তথা হইতে অস্ত্রাদির কোন প্রকার শব্দ উথিত হইত না। সলোমানের মন্দির সম্প্রতি হারেম নামে অভিহিত। বহু চেষ্টায় চাবি সংগ্রহ করিয়া কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে সহরের নিম্নদেশ (অভ্যন্তর—Solomon's quarry) দেখিতে যাই। প্রবেশদ্বারটা অতিশয় ক্ষুদ্র। সঙ্গে অনেকগুলি মশাল লইয়াছিলাম। ভিতরে যাইয়া মশাল কয়েকটি জ্বালিলে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইলাম। নানাস্থান বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম। এক একটি প্রকোষ্ঠ অতিশয় দীর্ঘ এবং স্থানে স্থানে খননকারিগণের জলপানের নিমিত্ত চৌবাচ্চা ও প্রদীপ রাখিবার নিমিত্ত দেওয়ালে স্থান রহিয়াছে। অনেক স্থানে বাটালি দিয়া কাটিতে কাটিতে কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছিল। উহা সেইরূপ অসমাপ্ত অবস্থায় পতিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইস্থানের প্রস্তর নিতান্ত নরম মৃত্তিকার ন্যায়, হস্তে করিয়া অনায়াসে গোলাকৃতি করিলাম; কিন্তু হাওয়া ও উত্তাপ লাগিবামাত্র শক্ত হইয়া গেল। জোসেফাসের উল্লেখ অনুসারে এখানে কয়েকখানি বৃহদাকার প্রস্তরের পরিমাণ করিয়া দেখিলাম, কয়েকখানি পূর্ণ ১৪ ফিট। একস্থানে কিছু পরিমাণে প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। উপরকার ছাদ হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে; এইরূপে চূণ ও জল মিশ্রিত হইয়া এই টুকরাগুলি জমিয়া গিয়াছে। অবশেষে একটী গৃহ দেখিলাম, তাহাকে অনেকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন। এইস্থানে পূর্ব্বকালে Freemason সম্প্রদায়ের সম্মিলন হইত। কিন্তু Freemason ব্যতীত কেহই এ বিষয় নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারে না।

আলেকজাণ্ডারের বাবিলনে মৃত্যুর পর তাঁহার বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য কতিপয় সেনাপতির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এন্টিওকাস মুররাজ্য লাভ করেন ও এন্টিঅক নামে সহর স্থাপন করেন। এই সহর বেরুট হইতে ৮ দিনের পথ। সম্প্রতি ইহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। আরবেরা ইহাকে আন্তাকিয়া কহিয়া থাকে। এই সকল গ্রীক রাজার রাজত্বকালে ইহুদীদিগের উপর নানাপ্রকার উৎপীড়ন হয়, অবশেষে জুডাস

ম্যাকাবিয়াস নামক জনৈক ইহুদী গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বজাতিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীন করেন। গ্রীকরাজ্য ধ্বংস হইলে রোমীয়দিগের প্রবল প্রতাপ বিস্তারিত হয়। এই সময় ইহুদীদেশ ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিগণিত ছিল এবং ইহুদীরাজপুত্র আরিষ্টবিউলাস ও হিরকেনাস নামক দুইভ্রাতায় পরস্পর যুদ্ধ হয়। তৎকালীন রোমের প্রধান সেনাপতি পম্পিয়াস ম্যাগ্‌নাস্‌ নানাদেশ জয় করিতেছিলেন এবং ইহুদীদেশ রোমরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার তাঁহার বিশেষ প্রযাস ছিল। তিনি এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একের পক্ষ লইয়া অপরকে আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। অবশেষে বিজয়ী হইয়া জেরুজালেম সহরে আসিয়া ইহুদীদিগের মন্দিরের পবিত্রতম স্থানে (Holy of Holies) প্রবেশ করেন। রোমীয়েরা মূর্ত্তিপূজা করিতেন ও শূকরমাংস খাইতেন। এইরূপ ব্যক্তি ঐরূপ স্থানে যাতায়াতে স্থান অপবিত্র হইয়া যায়। অবশেষে পম্পি লুণ্ঠন দ্বারা বহুরত্ন ও নানাবিধ স্বর্ণনির্ম্মিত দ্রব্যাদি লইয়া সসম্মানে নিজরাজধানী রোমে মহাসমারোহে প্রবেশ করেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, মন্দিরের দ্রব্য অপহরণ করাতে ইহুদীরা তাঁহাকে অভিসম্পাত দিয়াছিল ও তদবধি পম্পির অদৃষ্টলক্ষ্মী অপ্রসন্না হন। সিজারের দিগ্বিজয়কালে তিনি ইহুদীদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করেন ও প্রত্যেকটীতে এক একজন ইহুদী রাজা রাখিয়া যান। একজন রোমক শাসনকর্ত্তা ইঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। অগষ্টসের রাজত্বকালে ভগবান্ ঈশার জন্ম হয়। ঈশার মৃত্যুর প্রায ৩০ বৎসর পরে রোমান সম্রাট ভেস্‌পেসিয়ানের পুত্র টাইটাস্‌ আসিয়া জেরুজালেম অবরোধ করেন এবং উহা তাঁহার হস্তগত হইলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত এক প্রস্তরের উপর আর একখানি প্রস্তর রাখিলেন না—অর্থাৎ সকল প্রাসাদই ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। অবশেষে তিনি ইহুদীদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

এই সময ইহুদীরা নানাস্থানে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে ও মক্কা মেদিনা প্রভৃতি স্থানেও বাস করিতে আরম্ভ করে। অল্পসংখ্যক ইহুদী সেই সময় ভারতবর্ষে আসে ও তখন হইতে বোম্বাই প্রদেশে বাস করিতেছে। টাইটাস্‌ যদিও সমস্ত সহর ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে একটি মন্দিরের এক অংশে ১৩খানি পাথর রহিয়া গিয়াছে। ইহা আধুনিক হারেমের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে ও ওমরের মস্‌জিদের পূর্ব্বকোণে অবস্থিত। এইস্থানে একটী খেজুর গাছ আছে এবং ইহুদীদের বিশ্রামবারে প্রাতে তাহারা স্ত্রী-

পুরুষে মিলিত হইয়া এইস্থানে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও রোদন করিয়া থাকে। সাধারণ লোকে ইহাকে ইহুদীদের রোদনস্থল কহিয়া থাকে (Jewish wailing placo)।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

চরকসার বা জীবনবন্ধু। আয়ুর্ব্বেদীয় চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদক এবং চিকিৎসা সম্মিলনীর সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ২০০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১টাকা।

অবিনাশ বাবু বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয়গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদ করিয়া সাধারণের, বিশেষতঃ চিকিৎসাব্যবসায়িগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, সম্প্রতি চরক হইতে সার সার উপদেশ সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতমূল ও বঙ্গানুবাদ সহিত সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকপাঠে চরকোক্ত বিষয় সকল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞানলাভ হয় এবং মূলগ্রন্থ পড়িবার পিপাসা উদ্রিক্ত হয়। আমাদের বোধ হয়, এই পুস্তকের বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোন অংশ একেবারে বাদ দিয়া অপরাংশগুলি একটু বিস্তারিত ভাবে লিখিলে ভাল হইত।

চিকিৎসা সম্মিলনী। চিকিৎসা বিষয়িনী মাসিক পত্রিকা। কবিরাজ শ্রী অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন সম্পাদিত। এই পত্রিকা খানির প্রকাশ এতদিন বন্ধ ছিল, উহার পুনঃপ্রকাশে আমরা সুখী হইলাম। ইহারও উদ্দেশ্য আয়ুর্ব্বেদোক্ত জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার। অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক কথার কিছু বাহুল্য দেখা গেল।

প্রবাহ। একখানি কবিতাপুস্তক। ১২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসরসীলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানির ছাপা কাগজ প্রভৃতি অতি সুন্দর। এখানি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার একত্র গ্রন্থন স্বরূপ। কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটী পাঠে বোধ হইল, কবি বেশ শক্তিসম্পন্ন— কবিতাগুলি প্রাণস্পর্শী।

সুমতি। নূতন মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দত্ত

কর্ত্তৃক ১৪।১ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। এই পত্রিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমরা ইহার তিন সংখ্যা পাইয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। যাহাতে জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয়, ইহাই এই পত্রিকার মূলমন্ত্র। লেখা অতি প্রাঞ্জল ও মনোরম। 'সুমতি' পাঠে সকলের সুমতি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় এবং অন্যান্য অনেক স্থলে বলিয়াছেন, ধর্ম্মবিষয়ে আমাদিগকে পাশ্চাত্য জাতির আচার্য্যস্থান অধিকার করিতে হইবে এবং তাহাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। চিকাগো সহরে স্বামীজির অদ্ভুত কৃতকার্য্যতার পর রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসিগণ ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক ধর্ম্মপ্রচারকও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে ভারতীয় গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়াছেন এবং সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার জন্যও অনেকে জাপান এবং ইউরোপ আমেরিকায় গমন করিতেছেন এবং নূতন স্থাপিত শিল্পবিজ্ঞান সমিতি ইহার সবিশেষ উদ্যোগী হইয়া দেশস্থ সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ভারতবাসী অনেকে নানাকারণে শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষার্থ পাশ্চাত্য প্রদেশে যাইতে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মত, অনেকসংখ্যক ছাত্র পাশ্চাত্য শিল্পবিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া আসিলেও মূলধনাভাবে তাহাদের শিক্ষিত বিষয় এখানে কোনরূপ কার্য্যে লাগাইতে পারিবে না। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে, দলে দলে ছাত্রবর্গ শিল্পবিজ্ঞানে শিক্ষিত হইয়া আসিলে এবং সামান্য সামান্য কার্য্যে কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিলে মূলধনীরা ক্রমশঃ তাহাদের কার্য্যে বিশ্বাসবান্ হইবেন এবং ক্রমশঃ নিজেদের লাভজনক অথচ দেশের হিতকর কোনরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাদের শিক্ষাকে কার্য্যে লাগাইবেন।

কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন এই, অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও অর্থা-ভাবে জাহাজের ভাড়া দিবার এবং বিদেশে অধিক খরচে বাস করিবার সামর্থ্য নাই। এতদ্ব্যতীত কিরূপ খরচে কিরূপভাবে সেখানে দিনাতিপাত করিতে হয়, এতৎসম্বন্ধেও অনেকের বিশেষ জানা নাই। শিল্প-বিজ্ঞানসমিতি অনেকগুলি ছাত্রের জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিয়া অনেক সাহায্য করিতেছেন। কোন কোন ছাত্র জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে পত্রপ্রেরণ করিয়া সেখানকার অনেক সংবাদও দিতেছেন। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রে আমেরিকাপ্রবাসী শ্রীমহেশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক দুইজন বঙ্গীয় যুবক এতদ্দেশীয় ছাত্রবর্গকে সম্বোধন করিয়া যে একখানি মনোরম পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রগণের অতি স্বল্পব্যয়ে বা একরূপ বিনাব্যয়েই শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষার সুবিধা আছে। ঐ পত্রের ভাবানুবাদ দেওয়া গেল।

"ছাত্রগণ ইচ্ছামত যে কোন বিষয় অধ্যয়ন করিতে পারেন। বিদ্যা-লয়ের পুস্তকাগারে বা পরীক্ষাগারে ছাত্রগণের দ্বারা কার্য্য করান হয়। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী করিয়া Y.M.C.A. আছে। যে সকল ছাত্র অভাবগ্রস্ত, তাঁহাদিগকে এই সমিতি কায যোগাইয়া থাকেন। অবশ্য এখানে কায বলিতে আমাদের দেশে যেগুলিকে নীচ কায বলে, তাহারও অনেকগুলি বুঝিতে হইবে, যথা—রন্ধন, টেবিলে পরিবেশন, টাইপরাইটিং, ঝাঁট দেওয়া, কাঠ কাটিয়া আনা প্রভৃতি। বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশের মত আমেরিকায় কেহ এই সকল কার্য্যকে হীন কার্য্য বলিয়া মনে করে না বরং যে সকল ভদ্রব্যক্তির যথেষ্ট সংস্থান আছে, তাঁহারাও নিজ নিজ সন্তানকে আত্মনির্ভর শিখাইবার জন্য তাহা-দিগকে এইরূপে নিজেদের খরচ চালাইতে উৎসাহ দিয়া থাকেন। সপ্তাহে দুই দিন ছুটির সময়, বাৎসরিক ৩ মাস গ্রীষ্মাবকাশে এবং অন্যান্য অব-কাশ সময়ে ছাত্রগণ এতদূর রোজকার করিতে পারে যে, তাহাতে তাহা-দের সারা বৎসরের খরচ কুলাইয়া যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট কলেজ গুলিতে বেতন লাগে না, কেবল পরীক্ষাগারে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হয় এবং ভাঙ্গচুরের দরুন যৎকিঞ্চিৎ ধরিয়া লওয়া হয়। এই সকল কলেজে যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে সভ্য

জগতের আবশ্যক যে কোন বস্তু প্রস্তুতের প্রণালী শিক্ষা করিতে পাবা যায়। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ খুব ভদ্রলোক। কোনরূপ পরিচয়পত্রের আবশ্যক নাই। ছাত্র যদি যথার্থ শিখিতে ইচ্ছুক, সচ্চরিত্র ও একটু চট্‌পটে হন, তাহা হইলে তাঁহার সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়া থাকে। এসিয়াবাসী বা ভারতবাসীর উপর ইহাঁদের কোনরূপ কুসংস্কারজনিত ঘৃণা নাই। লণ্ডনে যে রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য ভারতবাসীদিগকে এ সকল বিষয় শিখিতে দেওয়া হয় না, ইহাঁদের ভারতবাসীকে না শিখাইবার সেরূপ কোন রাজনৈতিক স্বার্থও নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপানীদের অভাবনীয় সফলতায় এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী রামতীর্থের প্রভাবে ভারতবাসীর প্রতি আমেরিকানদের সহানুভূতি খুব বাড়িয়াছে। আমেরিকায় শিক্ষার জন্য যাইবার এই উপযুক্তসময়।"

এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা বা স্বয়ং আসিয়া A।৯৪ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট বাটীতে অবস্থিত কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে সোমবার ব্যতীত যে কোন দিবস সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮॥ টার মধ্যে সংবাদ লইতে পারেন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া নিবাসী শ্রীতারিণী চরণ পাল মহাশয় সম্প্রতি বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বিল্‌ডিং ফণ্ডে ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে কুচবিহার ষ্টেটে কার্য্য করিতেন। এক্ষণে সামান্যমাত্র পেন্সন লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। ইনি ১৯০২ সালের নবেম্বর মাসে সেবাশ্রমে যোগদান করিয়া উহার কার্য্যে বিশেষরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহাকে ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বর নিযুক্ত করা হয়। এই সময় হইতে তিনি সেবাশ্রমে মাসিক অধিক পরিমাণে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি নিঃসন্তান বলিয়া নিজের যাহা কিছু টাকাকড়ি আছে, সমুদয় সেবাশ্রমে দান করিতে কৃতসংকল্প হন, এবং বিগত ১লা এপ্রেল ২০০০৲ টাকা ম্যানেজিং কমিটির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এরূপ সাত্ত্বিক দান আজ কাল বড় বিরল। আশা করি, অন্যান্য সহৃদয় মহোদয়গণও ইহাঁর মহদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া নিজেরা ধন্য হইবেন এবং দরিদ্রগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

অনেকে মনে করেন, হিন্দুর ছেলে না হইলে হিন্দু হইবার যো নাই। গোঁড়া হিন্দুরা এই কথা বলিয়া নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও পবিত্রতা ঘোষণা করেন; আবার হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদিগণ ঐ কথা বলিয়া হিন্দুধর্ম্মকে মহা-সঙ্কীর্ণ ও অনুদারভাবাপন্নরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। সম্প্রতি বলরামপুরের মহারাজের উত্তরাধিকার মকদ্দমা সম্বন্ধে হাইকোর্ট যে রায় দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এ কথার সম্পূর্ণ মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইবে।

হাইকোর্ট বলেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা লইয়া বিবাদ,—তাহা এই ভ্রান্ত ধারণার উপর স্থাপিত যে,—হিন্দুধর্ম্ম কোন অবস্থায় কোন অহিন্দুকে হিন্দু হইতে অনুমতি দেয় না। সার মোনিয়ার উইলিয়াম্‌স তাঁহার 'ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মজীবন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'হিন্দুধর্ম্ম এক সুবৃহৎ অতিথিশালা স্বরূপ। ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যস্বীকার ও জাতিগত নিয়মাদি প্রতিপালন করিলে উহা উচ্চনীচ কাহাকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নয়।' সার আলফ্রেড লায়াল তাঁহার এশিয়িক আলোচনা নামক গ্রন্থেও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্ম অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজধর্ম্মে গ্রহণ করেনা, এ কথা ত সত্য নহেই বরং উহা যত অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে নিজধর্ম্মে গ্রহণ করে, ভারতীয় অন্যান্য সকল ধর্ম্ম একত্র করিলেও তাহারা এত করে না। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল তাঁহার ১৮৭১—৭২ সালের বঙ্গীয় শাসনকার্য্যবিবরণীতে উক্তমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—হিন্দুদিগের জাতিভেদ থাকা প্রযুক্ত যত ইচ্ছা লোক আসিয়া হিন্দু হইতে পারেন। তাঁহারা নিজেরা এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়া যদি অপর জাতির সহিত কোনরূপ বিরোধ না করেন, তবে তাঁহারা অনায়াসে হিন্দু নাম গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা, তাঁহাদিগকে মানিয়া চলিলে সকলকেই হিন্দু ধর্ম্মে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন আর উচ্চাভিলাষসম্পন্ন আদিমনিবাসীদিগকে আজও পর্য্যন্ত রাজপুত করিয়া লওয়া হইতেছে। বলরামপুর মহারাজের রাজ্যের সমীপবাসী নেপালের ক্ষত্রিয়গণের বিষয় আলোচনা করিলেও হিন্দুধর্ম্মের এই উদার ভাব প্রতিপন্ন হয়। ব্রায়ান হজসন বলেন, নেপালে পূর্ব্বে মোগল জাতি বাস করিত। দ্বাদশশতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণকারীদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ সমতল দেশ হইতে পলাইয়া নেপালের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লন এবং আদিম

অধিবাসী মোগলগণকে ক্ষত্রিয় পদবীতে উন্নীত করেন। তাঁহারা মোগল বালিকাদিগকে বিবাহ করিলেন এবং তদ্গর্ভজাত সন্তানগণকে ক্ষত্রিয় উপাধি দিলেন—এখনও তাহারা ক্ষত্রিয নামে পরিচিত। সার আলফ্রেড লায়াল আজমিরের এক আদিম জাতির কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের অর্দ্ধেককে জোর করিয়া মুসলমান করা হয়। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ এতদিন তাহাদের প্রাচীন আচার রক্ষা করিয়া আসিতেছিল এবং মুসলমানদের সহিত তাহাদের বিবাহও চলিত। এক্ষণে তাহারা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছে। এখন আর তাহারা মুসলমানদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। মিষ্টার কার্ণেঘি তাঁহার জাতিবিষয়ক টীপ্পনী মধ্যে লিখিয়াছেন, রাজপুত জাতির মধ্যে উদয়পুরের মহারাণাই কেবল মুসলমানদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু তিনিও একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রাজকন্যার বংশধর।

(পাইওনিয়ার হইতে উদ্ধৃত।)

খৃষ্টীয় মিশনরিগণ এখনও ভারতে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লজ্জিত হন না,—মহাযোগী ঈশার পবিত্র নাম লইয়া তাহারা কি ঘোর সঙ্কীর্ণ ও অনুদার ভাবের প্রচার করিতেছেন, তাহা একবার কলিকাতার কোন চার্চ্চে গমন করিয়া ইহাদের বক্তৃতা শুনিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই গোঁড়ামী ভাবটা এখনও এত বেশী যে, আমেরিকার পাদরীদের মধ্যে যাঁহারা একটু উদারভাবাপন্ন হইতেছেন, অপরাপর গোঁড়া পাদরীরা তাঁহাকেই অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছেন। সম্প্রতি এক আমেরিকান ছাত্র প্রবুদ্ধ ভারত পত্রে এ বিষয়ে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। লিমান এবট নামক জনৈক বিখ্যাত পাদ্রী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে যে সকল কঠোর সমালোচনা সহ্য করিতে হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়, গোঁড়াদের এখনও কিরূপ প্রবল প্রতাপ। উঁহার অপরাধ এই যে, উনি খৃষ্টধর্ম্মকে উদারভাবে বুঝেন। আমরা উঁহার এবং অন্যান্য উদারভাবাপন্ন খৃশ্চিয়ানগণের খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় চর্চ্চ সম্বন্ধে মত আগামী সংখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ উদার ব্যক্তিগণের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই বিভিন্নধর্ম্মে সহানুভূতি বর্দ্ধিত হইবে এবং প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম ততই লোকে অধিক বুঝিতে থাকিবে।

স্বামীজির স্মৃতি।

(শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ)

আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার কিছু আগেই চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার ও ভয়ানক তর্জ্জন গর্জ্জন করে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমরা সেদিন মঠে। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল এসেছেন, নূতন মঠ হচ্ছে দেখ্‌বেন ও সেখানে মিসেস্ বুল আছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। মঠের বাড়ীটী সবে আরম্ভ হয়েছে। পুরাণ যে দুই তিনটী কুটরী আছে, তাইতে মিসেস্ বুল আছেন। সাধুরা ঠাকুর লইয়া শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে ভাড়া দিয়া বাস করছেন। ধর্ম্মপাল বৃষ্টির পূর্ব্বেই সেই খানে স্বামীজির কাছে এসে উঠেছেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হল, বৃষ্টি আর থামেনা। কাজেই ভিজে ভিজে নূতন মঠে যেতে হবে। স্বামীজি সকলকে জুতো খুলে ছাতা নিয়ে যেতে বল্‌লেন, সকলে জুতো খুল্‌লেন। ছেলেবেলাকার মত শুধু পায় ভিজে ভিজে কাদায় যেতে হবে, স্বামীজির কতই আনন্দ! একটা খুব হাসি পড়ে গেল। ধর্ম্ম-পাল কিন্তু জুতা খুল্‌লেন না দেখে স্বামীজি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌লেন, "বড় কাদা, জুতোর দফা রফা হবে"। ধর্ম্মপাল বল্‌লেন "Never mind, I will wade with my shoes on" সকলে এক এক ছাতা নিয়ে যাত্রা করা হল। মধ্যে মধ্যে কাহারও পা পিছ্‌লয়, তার উপর খুব জোর ঝাপটায় সমস্ত ভিজে যায়, তার মধ্যে স্বামীজির হাসির রোল, মনে হল, যেন আবার সেই ছেলেবেলাকার খেলাই বুঝি করছি। যা হক্ অনেক খানা-খন্দল পার হয়ে নূতন মঠের সীমানায় আসা গেল। জমিটীতে অনেক বড় বড় খাদ ছিল; দূর হতে মাটি আনিয়ে সবে ভরাট করা হয়েছে। যখন সেখানে আসা গেল, তখন সকলের কাদায় পা বসে যেতে লাগ্‌ল। ধর্ম্মপাল একে খঞ্জ, তার উপর নূতন মাটির বেজায় কাদা; একবার বেচারার সেই খোঁড়া পাটী এমন বসে গেল যে, তিনি আর তাকে উদ্ধার করতে পার্-লেন না। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে তাঁকে কাঁধ পেতে দিলেন ও ডান হাতে তাঁর কোমর ধরলেন; ধর্ম্মপাল তাঁর কাঁধের উপর ভর দিয়ে মহা কর্দ্দম হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তার পর হাঁস্‌তে হাঁসতে দুইজনে সেই ভাবেই মঠ পর্য্যন্ত চল্‌লেন।

স্বামীজি জল আন্‌তে বল্লেন, সকলের পা ধোবার জন্য। জল আনা হলে ধর্ম্মপাল স্বয়ং পা ধোবার জন্য একটি ঘটী লইবামাত্র স্বামীজি তাহা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বল্‌লেন, "আপনি অতিথি—আমি আপনার সৎকার করব" বলে বাঁ হাতে ঘটীটি নিয়ে ডান হাতে পা ধুয়ে দিতে উদ্যত হলেন। আমি তাই দেখে তাঁর হাত থেকে ঘটীটা কেড়ে নিতে গেলাম, তিনি বিরক্ত হয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমি বল্‌লাম, "মহারাজ! আমরা তোমার চেলা; সেবক থাক্‌তে তুমি পা ধুইয়ে দেবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব, তা ভাল দেখাবে না"। এই বলে তাঁর হাত থেকে ঘটীটি বলপূর্ব্বক কেড়ে নিলে তিনি নিরস্ত হলেন।

সকলের পা হাত ধোয়া হলে মিসেস্ বুলের কাছে সকলে গিয়ে বস্‌লেন, এবং অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর ধর্ম্মপালের নৌকা এলে সকলে ওঠা গেল। নৌকা আমাদের মঠে নামিয়ে দিয়ে ধর্ম্মপালকে নিয়ে কলিকাতা যাত্রা করল। তখনও বেশ টিপীর্ টিপীর্ বৃষ্টি পড়্‌ছে।

মঠে এসে স্বামীজি তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীতে ধ্যান করতে গেলেন এবং ঠাকুরঘরে ও তার পূর্ব্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন হলেন। আমার আর সেদিন ধ্যান হল না, পূর্ব্বের কথা সকলই কেবল মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ছেলেবেলায় মোহিত হয়ে দেখ্‌তাম, এই অদ্ভুত বালক নরেন আমাদের সঙ্গে কখন হাস্‌ছে খেল্‌ছে গল্প কচ্ছে আবার কখন বা সকলের মনোমুগ্ধকর কিন্নর স্বরে গান কচ্ছে। ছেলেবেলাকার ছবিগুলি যেন জীবন্ত হয়ে আমার সম্মুখে পুনরায় রঙ্গ করতে লাগ্‌লো। মনে হল, লোকটার ভিতরে এখন যা দেখ্‌ছি, সমস্তই তখনও জাজ্বল্যমান ছিল, তখনও দশের মধ্যে একজন; নইলে তখনও কেন নরেন কথা আরম্ভ করলে সকল ছেলেগুলো হাঁ করে থাকৃত? সে একটা মত প্রকাশ করলে তার সঙ্গে তর্ক করে ভুল ধরে দেয় এমন ত একটাও ছেলে ছিল না। সে যে কাযটা করৃত, মনে হত যেন তার চেয়ে ভাল আর কেহই করতে পারে না। ক্লাসে তো বরাবর first থাক্‌তো। খেলায়ও তাই, ব্যায়ামেও তাই, বালকগণের নেতৃত্বেও তাই, গানেতে ত কথাই নাই, গন্ধর্ব্বরাজ!

স্বামীজিরা ধ্যান করে উঠ্‌লেন। বড় ঠাণ্ডা, একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে স্বামীজি তানপুরা ছেড়ে গান ধর্‌লেন। তার পর সঙ্গীতের

উপর অনেক কথা চল্লো। স্বামী শিবানন্দ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, বিলাতী সঙ্গীত কেমন?

স্বামীজি। খুব ভাল, harmonyর চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটে নাই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কাণে বড় ভাল লাগেনা। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শ্যালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুন্‌তে আর বুঝ্‌তে লাগলুম, তখন অবাক্‌ হলুম। শুন্‌তে শুন্‌তে মোহিত হয়ে যেতাম। সকল artএর তাই। একবার চোক বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝ্‌তে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোক নইলে ত তার অঙ্কি সন্ধি কিছুই বুঝ্‌বে না। আমাদের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল কীর্ত্তনে আর ধ্রুপদে আছে। আর সব ইস্‌লামী ছাঁচে ঢালা হয়ে বিগ্‌ড়ে গেছে। তোমরা ভাব, ঐ যে বিদ্যুতের মত গিট্‌কিরি দিয়ে নাকি সুরে টপ্পা গায়, তাই বুঝি দুনিয়ার সেরা জিনিষ। তা নয়। প্রত্যেক পর্দ্দায় সুরের পূর্ণবিকাশ না কর্‌লে musicএ science থাকেনা। Paintingএ natureকে বজায় রেখে যত artistic করনা কেন ভালই হবে, দোষ হবে না। তেমনি musicএর science বজায় রেখে যত কার্‌দানি কর, ভাল লাগ্‌বে। মুসলমানেরা রাগ রাগিণী গুলোকে নিলে এদেশে এসে। কিন্তু টপ্পাবাজিতে তাদের এমন একটা নিজেদের ছাপ্‌ ফেল্‌লে যে তাতে science আর রইল না।

প্রশ্ন। কেন মহারাজ, science মারা গেল? টপ্পা জিনিষটা কার না ভাল লাগে?

স্বামীজি। ঝিঁজি পোকার রবও খুব ভাল লাগে। সাঁওতালরাও তাদের music অত্যুৎকৃষ্ট বলে জানে। তোরা এটা বুঝ্‌তে পারিস্‌ না যে, একটা সুরের উপর (নোটের উপর) আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাহাতে আর সঙ্গীতমাধুর্য্য (music) কিছুই থাকে না, উল্‌টে discordance জন্মায়। সাতটা পর্দ্দার permutation combinationনিয়ে এক একটা রাগ রাগিণী হয় ত? এখন টপ্‌পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি কর্‌লে আবার তার উপর গলায় জোয়ারী বলালে কি করে আর তার রাগত্ব থাক্‌বে? আর টোক্‌রা তানের এত ছড়াছড়ি কল্লে সঙ্গীতের কবিত্ব ভাবটা ত একেবারে যায়। টপ্‌পার যখন সৃজন হয়, তখন গানের ভাব বজায়

রেখে গান গাওয়াটা দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল। আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগ রাগিণীর শ্রাদ্ধটা আরও বিশেষ করে হচ্চে।

"এইজন্য যে ধ্রুপদী, সে টপ্‌পা শুন্‌তে গেলে তার কষ্ট হয়। তবে আমাদের সঙ্গীতে Cadence মিড় মূর্চ্ছনা বড় উৎকৃষ্ট জিনিষ। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের musicএ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা য়ুরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে নিয়েছে।

প্রশ্ন। মহারাজ, ওদের musicটা কেবল martial বলে বোধ হয় আর আমাদের সঙ্গীতের ভিতর ঐ ভাবটা আদতেই নেই যেন।

স্বামীজি। আছে আছে। তাতে Harmonyর বড় দরকার। আমাদের Harmonyর বড় অভাব, এইজন্যই ওটা অত দেখা যায় না, আমাদের musicএর খুবই উন্নতি হচ্ছেল, এমন সময়ে মুসলমানেরা এসে সেটাকে এমন করে হাতালে যে, সঙ্গীতের গাছটী আর বাড়্‌তে পেলে না। ওদের music খুব উন্নত; করুণরস বীররস দুই আছে, যেমন থাকা দরকার। আমাদের সেই কদুকলের আর উন্নতি হলনা।

প্রশ্ন। কোন্ রাগ রাগিণী গুলি martial?

স্বামীজি। সকল রাগ গুলিই martial হয়, যদি harmonyতে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজান যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়।

ইতিমধ্যে ঠাকুরের ভোগ হলে পর সকলে ভোজন করতে গেলেন। আহারের পর কলিকাতার যে সকল লোক সেই রাত্রে মঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে স্বামীজি তার পর নিজে শয়ন কর্‌তে গেলেন।

* * * * *

প্রায় দুই বৎসর নূতন মঠ হয়েছে, স্বামীজিরা সেইখানেই আছেন। একদিন প্রাতে আমি গুরুদর্শনে গেছি। স্বামীজি আমায় দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে তন্ন তন্ন করে সমস্ত কুশল এবং কলিকাতার সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করে বললেন, আজ থাক্‌বি ত?

আমি "নিশ্চয়" বলে অন্যান্য অনেক কথার পর স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, মহারাজ, ছোট্ট ছেলেদের শিক্ষা দিবার বিষয়ে তোমার মত কি?

স্বামীজি। গুরুগৃহে বাস।

প্রশ্ন। কি রকম?

স্বামীজি। সেই পুরাকালের বন্দোবস্ত। তবে তার সঙ্গে আজ কালের পাশ্চাত্য দেশের জড় বিজ্ঞানও চাই। দুটোই চাই।

প্রশ্ন। কেন, আজ কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে কি দোষ?

স্বামীজি। প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরাণিগড়া কল বই ত নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচ্‌তুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধাবিশ্বাস-বর্জ্জিত হচ্চে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বল্‌বে; বেদকে চাষার গান বল্‌বে। ভারতের বাহিরে যা কিছু আছে, তার নাড়ী নক্ষত্রের খবর আছে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক্—তিন পুরুষের নামও জানে না।

প্রশ্ন। তাতে কি এসে গেল? নাই বা বাপ দাদার নাম জান্‌লে?

স্বামীজি। না রে; যাদের দেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই। তুই মনে কর্‌না, যার "আমি এত বড় বংশের ছেলে" বলে একটা বিশ্বাস ও গরব থাকে, সে কি কখন মন্দ হতে পারে? কেমন করে হবে বল্‌না? তার সেই বিশ্বাসটা তাকে এমন রাস টেনে রাখ্‌বে যে, সে মরে গেলেও একটা মন্দ কাজ কর্‌তে পার্‌বে না। তেম্‌নি একটা জাতের ইতিহাস সেই জাতটাকে রাস টেনে রাখে, নিচু হতে দেয় না। আমি বুঝেছি, তুই বল্‌বি আমাদের historyত নেই। তোদের মতে নেই। তোদের universityর পণ্ডিতদের মতে নেই, আর এক দৌড়ে বিলেতে বেড়িয়ে এসে সাহেব সেজে যারা বলে, আমাদের কিছুই নেই আমরা বর্ব্বর, তাদের মতে নেই। আমি বলি, অন্যান্য দেশের মত নেই। আমরা ভাত খাই, বিলেতের লোকে ভাত খায় না; তাই বলে কি তারা উপোষ করে মরে ভূত হয়ে আছে? তাদের দেশে যা আছে, তারা তাই খায়। তেম্‌নি তোদের দেশের ইতিহাস যেমন থাকা দরকার হয়েছিল, তেমনিই আছে। তোরা চোক বুজিয়ে "নেই, নেই" বলে চ্যাঁচালে কি ইতিহাস লোপ হয়ে যাবে? যাদের চোক আছে, তারা সেই জ্বলন্ত ইতিহাসের বলে এখনও সজীব আছে। তবে সেই ইতিহাসকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করে নিতে হবে। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার চোটে লোকের যে বুদ্ধিটা দাঁড়িয়েছে, ঠিক্ সেই বুদ্ধির মত উপযুক্ত করে ইতিহাসটাকে নিতে হবে।

প্রশ্ন। সে কেমন করে হবে?

স্বামীজি। সে অনেক কথা। আর সেই জন্যই "গুরুগৃহবাসম্" ইত্যাদি চাই। চাই Western scienceএর সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জানিস্, ছোট ছেলেদের গাধা পিটে ঘোঁড়া করা গোছ শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে।

প্রশ্ন। তার মানে?

স্বামীজি। ওরে, কেউ কাকেও শিখাতে পারে না। শিক্ষকে শিখাচ্চি মনে করেই সব মাটী করে। কি জানিস্, বেদান্ত বলে, এই মানুষের ভিতরেই সব আছে। একটা ছেলের ভিতরেও সব আছে। কেবল সেই গুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কায। ছেলে-গুলো যাতে আপনার আপনার হাত পা নাক কান মুখ চোক ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শিখে, এইটুকু করে দিতে হবে। তাহলেই আখেরে সমস্তই সহজ হয়ে পড়্বে। কিন্তু গোড়ার কথা ধর্ম্ম। ধর্ম্মটা যেন ভাত আর সবগুলা তরকারি। কেবল সুধু তরকারি খেলে হয় বদহজম; সুধু ভাতেও তাই। মেলা কতকগুলা কেতাব পত্র মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যি গুলোর মুণ্ডু বিগ্ড়ে দিচ্ছিল। এক্ দিক দিয়ে দেখ্লে তোদের বড় লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত—High education তুলে দিচ্চে বলে দেশটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্বে। বাপ! কি পাশের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখ্লেন কি, না, নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন যোটেনা।

"এমন High education থাক্লেই কি আর গেলেই বা কি? তার চেয়ে একটু Technical education পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পার্বে, চাকরী চাকরী করে আর চ্যাঁচাবে না।

প্রশ্ন। মারওয়াড়ীরা বেশ চাকরী করে না, আর প্রায় সকলেই ব্যবসা করে।

স্বামীজি। দুর, ওরা দেশটা উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। ওদের বড় হীন বুদ্ধি। তোরা ওদের চেয়ে অনেক ভাল—manufactureএর দিকে নজর বেশী। ওরা যে টাকাটা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে আর গৌরাঙ্গের পেট ভরায়, সেই টাকায় যদি গোটাকতক factory, workshop করে, তাহলে দেশেরও কল্যাণ হয় আর ওদের এর চেয়ে অনেক বেশী

লাভ হয়। চাকরী বোঝেনা কাবলীরা—স্বাধীনতা ভাব হাড়ে হাড়ে। ওদের এক জনাকে চাকরীর কথা বলে দেখিস্ না।

প্রশ্ন। মহারাজ, high education তুলে দিলে, সব মানুষগুলো যেমন গরু ছিল, তেমনি আবার গরু হয়ে দাঁড়াবে যে?

স্বামীজি। রাম কহ! তাও কি হয় রে? সিঙ্গি কি কখন শ্যাল হয়? তুই বলিস্ কি? যে দেশ জগৎকে চিরকাল বিদ্যা দিয়ে এসেছে, Lord Curzon high education তুলে দিলে বলে কি সে দেশ সুদ্ধ লোক গরু হয়ে দাঁড়াবে?

প্রশ্ন। যখন ইংরেজ এদেশে আসেনি, তখন দেশের লোক কি ছিল? আজও কি আছে?

স্বামীজি। বেড়ে কল কব্জা তয়ের করতে শিখলেই high education হল না। Life এর problem solve করা চাই (মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি, তা জানা চাই); যে কথা নিয়ে আজকাল সভ্য জগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন; আর যেটার আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন। তবে তোমার সেই বেদান্তও ত যেতে বসেছিল?

স্বামীজি। হ্যাঁ। সময়ে সময়ে সেই বেদান্তের আলো একটু নেব নেব হয়, আর সেই জন্যই ভগবানের আসবার দরকার হয়। আর তিনি এসে সেটাতে এমন একটা শক্তির সঞ্চার করে দিয়ে যান যে, আবার কিছু কালের জন্য তার আর মার থাকেনা। এখন সেই শক্তি এসে গেছে। তোদের বড় লাট high education তুলে দিলে ভালই হবে।

প্রশ্ন। মহারাজ, ভারত যে সমগ্র জগতকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, তার প্রমাণ কি?

স্বামীজি। ইতিহাসই তার প্রমাণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত Soul-elevating ideas বেরিয়েছে আর যত কিছু বিদ্যা আছে, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার মূল সব ভারতে রয়েছে।

এই কথা বলতে বলতে তিনি যেন মেতে উঠলেন। একে ত শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তাহার উপর দারুণ গ্রীষ্ম, মুহুর্মুহুঃ পিপাসা পেতে লাগল। অনেকবার জল পান করলেন। এবার বল্লেন "সিংহ, একটু বরফ জল খাওয়া। তোকে সব বুঝিয়ে বল্ছি"।

জল পান করে আবার বল্লেন,—"আমাদের চাই কি জানিস্" স্বাধীন ভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরাজি আর science পড়ান, চাই technical education, চাই যাতে industry বাড়ে। লোকে চাকরী না করে দু পয়সা করে খেতে পাবে।

প্রশ্ন। সেদিন টোলের কথা কি বল্‌ছিলে ?

স্বামীজি। উপনিষদের গল্প টল্প পড়েছিস্ ?

"সত্যকাম গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে গেলেন। গুরু তাঁকে কতকগুলি গরু দিয়ে বনে চরাতে পাঠালেন। অনেক দিন পরে যখন গরুর সংখ্যা দ্বিগুণ হল, তখন তিনি গুরুগৃহে ফের্‌বার উপক্রম কর্‌লেন। এই সময়ে একটী গরু, অগ্নি এবং অন্যান্য কতকগুলি জন্তু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। যখন শিষ্য গুরুর বাড়ী ফিরে এলেন, তখন গুরু তাঁর মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন, শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। এই গল্পের মানে এই, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস কর্‌লে তা থেকেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়।

"সেই রকম করে বিদ্যা উপার্জ্জন কর্‌তে হবে, শিরোমণি মহাশয়ের টোলে পড়্‌লে রূপী বাঁদরটী থাক্‌বে। একটা জ্বলন্ত Characterএর কাছে ছেলেবেলা থেকে থাকা চাই, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ পড়্‌লে কচু ও হবে না। Absolute ব্রহ্মচর্য্য করাতে হবে প্রত্যেক ছেলেটাকে; তবে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস আস্‌বে। নইলে যার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না ? আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগী লোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার। পণ্ডিত মশাইরা হাত বাড়িয়ে বিদ্যাটা টেনে নিয়ে টোল খুলেই দেশের সর্ব্বনাশটা করে বসেছেন। যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল।

প্রশ্ন। এর মানে কি মহারাজ? আর সব দেশে ত ত্যাগী সন্ন্যাসী নেই, তাদের বিদ্যার বলে যে ভারত জুতোর তলে রয়েছেন ?

স্বামীজি। ওরে বাপ্ চেল্লাস্‌নি, যা বলি শোন্। ভারত চিরকাল মাথায় জুত বইবে যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে। জানিস্ একটা নিরক্ষর ত্যাগী ছেলে তেরকেলে বুড়ো পণ্ডিতদের মুণ্ড ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা

পূজারী ভেঙ্গে ফেলে। পণ্ডিতরা এসে সভা করে পাঁজি পুঁথি খুলে বল্লে, এ ঠাকুরের সেবা চল্‌বে না, নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হবে। মহা হুল স্থূল ব্যাপার। শেষে পরমহংস মশাইকে ডাকা হল। তিনি বল্লেন, স্বামীর যদি পা খোঁড়া হয়ে যায়, তাহলে কি স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে? পণ্ডিত বাবাজীদের আর টীকে টীপ্‌পুনি চল্‌ল না। ওরে আহাম্মক, তা যদি হবে ত পরমহংস মহাশয় আস্‌বেন কেন? আর বিদ্যাটাকে এত উপেক্ষা কর্লেন কেন? বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর সেই নূতন শক্তি সঞ্চার চাই, তবে ঠিক ঠিক কায হবে।

প্রশ্ন। সে ত সহজ কথা নয়, কেমন করে হবে?

স্বামীজি। সহজ হলে তাঁর আস্‌বার দরকার হোতো না। এখন তোদের কত্তে হবে কি জানিস্? প্রতি গ্রামে প্রতি সহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস্ কিছু কত্তে? কিছু কর্। কোলকেতায় একটা বড় করে মঠ কর্। একটা করে সুশিক্ষিত সাধু সেখানে থাক্‌বে, আর তার তাঁবে practical science ও সব রকম art শিখাবার জন্য প্রত্যেক branchএ specialist সন্ন্যাসী থাক্‌বে।

প্রশ্ন। সে রকম সাধু কোথায় পাবে?

স্বামীজি। তয়ের করে নিতে হবে। তাই ত বলি কতকগুলি স্বদেশানুরাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীরা যত শীঘ্র এক একটা বিষয় চূড়ান্ত রকমে শিখে নিতে পার্‌বে, তেমন ত আর কেউ পার্‌বে না।

তারপর স্বামীজি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে তামাক খেতে লাগ্‌লেন। পরে বলে উঠ্‌লেন; "দেখ্ সিঙ্গি, একটা কিছু কর্। দেশের জন্য কর্‌বার এত কায আছে যে, তোর আমার মত হাজার হাজার লোকের দরকার। সুধু গপ্পিতে কি হবে? দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্ রে। ছোট ছেলেদের পড়্‌বার উপযুক্ত এক খানাও কেতাব নেই।

প্রশ্ন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ত অনেকগুলি বই আছে।

এই কথা বল্‌বামাত্র স্বামীজি উচ্চৈঃস্বরে হেঁসে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ; ভুবাল অতি সুবোধ বালক" ওতে কোন কায হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাঙ্গালাতে আর কতকগুলি ইংরাজিতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।

বেলা প্রায় ১১টা; ইতিপূর্ব্বে পশ্চিম দিকে একখানা মেঘ দেখা দিয়াছিল। এখন সেই মেঘ, স্বন্ স্বন্ শব্দে চলে আস্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ শীতল বাতাস উঠ্‌ল। স্বামীজির আর আনন্দের শেষ নাই, বৃষ্টি হবে। তিনি উঠে "সিঙ্গি আয় গঙ্গার ধারে যাই" বলে আমাকে নিয়ে ভাগীরথীতীরে বেড়াতে লাগলেন। কালিদাসের মেঘদূত থেকে কত শ্লোক আওড়ালেন। কিন্তু মনে মনে সেই একই চিন্তা কর্‌ছিলেন—ভারতের মঙ্গল। বল্‌লেন, "সিঙ্গি, একটা কায কত্তে পারিস্? ছেলেগুলোর অল্প বয়েসে বে বন্ধ কত্তে পারিস্?"

আমি উত্তর কর্‌লাম, "মহারাজ, বে বন্ধ করা চুলোয় যাক্, বাবুরা যাতে বে সস্তা হয়, তার ফিকির কচ্ছেন।"

স্বামীজি: ক্ষেপেছিস্, কার সাদ্দি সময়ের ঢেউ ফেরায়! ঐ হৈ চৈই সার। বে যত মাগ্‌গি হয় ততই মঙ্গল। যেমন পাশের ধুম তেমনি কি বিয়েয় ধুম! মনে হয় বুঝি আইবুড় আর রইল না। পরের বছর আবার তেমনি।

স্বামীজি আবার খানিক চুপ করে থেকে পুনরায় বল্‌লেন, "কতকগুলি অবিবাহিত graduate পাই ত জাপানে গিয়ে যাতে কারিগরি শিক্ষা (technical education) পেয়ে আসে, তার চেষ্টা করা যায়, তা হলে বেশ হয়।

প্রশ্ন। কেন মহারাজ, বিলেত যাওয়ার চেয়ে কি জাপান যাওয়া ভাল?

স্বামীজি। সহস্র গুণে! আমি বলি, এদেশের সমস্ত বড় লোক আর শিক্ষিত লোকে যদি একবার করে জাপান বেড়িয়ে আসে ত লোকগুলোর চোক্ ফোটে।

প্রশ্ন। কেন?

স্বামীজি। সেখানে এখানকার মত বিদ্যার বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয় নাই। তোদের দেশে সাহেব হওয়া যে একটা বিষম রোগ দাঁড়িয়েছে।

আমি বল্‌লাম, "মহারাজ, আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক্ হতে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারও নকল কর্‌বার যো নেই।

স্বামীজি। ঠিক্। ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic। আমাদের দেখ্‌ছিস্ না সব গেছে তবু যা আছে তাহা অদ্ভুত। Asiatic-এর জীবন artএ মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাক্‌লে Asiatic তাহা ব্যবহার করেনা। ওরে আমাদের আর্টও যে একটা ধর্ম্মের অঙ্গ। যে মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কত বড় artist (শিল্পী) ছিলেন।)

প্রশ্ন। সাহেবদেরও ত art বেশ।

স্বামীজি। দূর মুর্খ! আর তোরেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশ সুদ্ধ লোক নিজের সোণা রাঙ, আর পরের রাঙটা সোণা দেখ্‌ছে। এইটা হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেল্‌কি। ওরে, ওরা যতদিন এসিয়ায় এসেছে, ততদিন ওরা চেষ্টা কচ্ছে জীবনে art ঢোকাতে।

আমি বল্লাম, "মহারাজ, এরকম কথা লোকে শুন্‌লে বল্‌বে, তোমার সব Pessimistic view।"

স্বামীজি। কাযেই তাই বই কি! আমার ইচ্ছে করে, আমার চোক্ দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়ীগুলো দেখ্, সব সাদা মাটা। তার কোন মানে পাস্? দেখ্‌না এই যে এত বড় বড় সব বাড়ী governmentএর রয়েছে, বাইরে থেকে দেখ্‌লে তার কোন মানে বুঝিস্ বল্‌তে পারিস্? তার পর তাদের খাড়া প্যাণ্ট, চোস্ত কোট, আমাদের হিসাবে এক প্রকার ন্যাংটো না? আর তার কিবে বাহার! আমাদের জন্মভূমিটা ঘুরে দেখ্। কোন্ Buildingটার মানে না বুঝতে পারিস্, আর তাতে কিবা শিল্পি! ওদের জল খাবার গেলাস, আমাদের ঘটী, কোন্‌টায় আর্ট আছে? ওরে, এক টুকরা Indian silk চায়নায় নকল কত্তে হার মেনে গেল। এখন সেটা Japan কিনে নিলে ২০০০০৲ টাকায়, যদি তারা পারে চেষ্টা করে। পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ী দেখেছিস?

উত্তর। হ্যাঁ।

স্বামীজি। কি দেখেছিস্?

আমি চুপ। কি দেখেছি কি বল্‌ব? বল্লাম, "মহারাজ, বেশ নিকন চিকন পরিষ্কার।"

স্বামীজি। তাদের ধানের মরাই দেখেছিস্? তাতে কত আর্ট। মেটে

ঘরগুলোয় কত চিত্তির বিচিত্তির! আর সাহেবদের দেশে ছোট লোকেরা কেমন থাকে তাও দেখে আয়। কি জানিস্, সাহেবদের utility আর আমাদের আর্ট। ওদের সমস্ত দ্রব্যেই utility, আমাদের সর্ব্বত্রে আর্ট। ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকী ঘটী ফেলে এনামেলের গেলাস এসেছেন ঘরে। ওই রকমে utility এমন ভাবে আমাদের ভিতর ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চাই art এবং utilityর combination। জাপান সেটা বড় চট্ নিয়ে ফেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হয়ে পড়েছে। এখন আবার ওরা তোমার সাহেবদের শিখাবে।

প্রশ্ন। মহারাজ, কোন্ দেশের কাপড় পরা ভাল?

স্বামীজি। আর্য্যদের ভাল। সাহেবরাও এ কথা স্বীকার করে। কেমন পাটে পাটে সাজান পোষাক্। যত দেশের রাজপরিচ্ছদ এক রকম আর্য্য জাতিদের নকল, পাটে পাটে রাখ্‌বার চেষ্টা; আর তাহা জাতীয় পোষাকের ধারেও যায় না।

দেখ্ সিঙ্গি, ঐ হতভাগা সার্টগুলো পরা ছাড়্।

প্রশ্ন। কেন মহারাজ?

স্বামীজি। আরে, ওগুলো সাহেবদের underwear। সাহেবরা ঐগুলো পরার উপর বড় ঘৃণা করে। কি হতভাগা দশা বাঙ্গালীর! যা হোগ একটা পর্‌লেই হল? কাপড় পরার যেন মা বাপ নেই! কারুর ছোঁয়া খেলে জাত যায়, বেচালের কাপড় চোপড় পর্‌লেও যদি জাত যেত ত বেশ হত। কেন, আমাদের নিজের মত কিছু করে নিতে পারিস্ না? কোট shirt গায় দিতেই হবে, এর মানে কি?

বৃষ্টি এল; আমাদেরও প্রসাদ পাবার ঘণ্টা পড়্‌ল। স্বামীজি "চল্ ঘণ্টা দিয়েছে" বলে আমায় সঙ্গে লয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। আহার কর্‌তে কর্‌তে স্বামীজি বল্‌লেন, "দেখ্ সিঙ্গি, concentrated food খাওয়া চাই। কতকগুলো ভাত ঠেশে খাওয়া কেবল কুড়েমির গোড়া।" আবার কিছু পরেই বল্‌লেন, "দেখ্ জাপানীরা দিনে দুবার তিনবার ভাত আর দালের ঝোল খায়। কিন্তু খুব যোয়ান লোকেরাও অতি অল্প খায়, বারে বেশী। আর যারা সঙ্গতিপন্ন, তারা মাংস প্রত্যহই খায়। আমাদের যে দুবার আহার কঁচকি কণ্ঠা ঠেশে। এক গাদা ভাত হজম কর্‌তে সব energy চলে যায়।

প্রশ্ন। আমাদের মাংস খাওয়াটা সকলের পক্ষে সুবিধা কি?

স্বামীজি। কেন, কম করে খাবে। প্রত্যহ এক পোয়া খেলেই খুব হয়। ব্যাপারটা কি জানিস্? দরিদ্রতার প্রধান কারণ আলস্য। এক জনের সাহেব রাগ করে মাইনে কমিয়ে দিলে, কি একটা সংসারে ৩।৪ টা রোজ-গারী ছেলে আছে, তার একটা হয়ত মা নিয়ে নিলেন, বাকীগুলো অমনি কি কর্‌লে? না, ছেলেদের দুধ কমিয়ে দিলে, এক বেলা হয়ত মুড়ী খেয়ে কাটালে।

প্রশ্ন। তা নয়ত কি করবে?

স্বামীজি। কেন, আরও অধিক পরিশ্রম করে যাতে খাওয়া দাওয়াটাও বজায় থাকে, এটুকু কর্‌তে পারে না? পাড়ায় যে ২ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া চাইই চাই। সময়ের যে কত অপব্যয় করে লোকে, তা আর কি বল্‌ব!

আহারান্তে স্বামীজি একটু বিশ্রাম করতে গেলেন।

*　　*　　*　　*

একদিন স্বামীজি বাগবাজারে ৺ বলরাম বসুর বাটীতে আছেন, আমি তাঁকে দর্শন কর্‌তে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক কথা হবার পর, আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—

প্রশ্ন। স্বামীজি, আমেরিকায় কতগুলি শিষ্য করেছ?

স্বামীজি। অনেক।

প্রশ্ন। ২।৪ হাজার?

স্বামীজি। ঢের বেশী।

প্রশ্ন। কি, সব মন্ত্রশিষ্য?

স্বামীজি। হঁ্যা।

প্রশ্ন। কি মন্ত্র দিলে স্বামীজি, সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়াছ?

স্বামীজি। সকলকে প্রণবযুক্ত দিয়াছি।

প্রশ্ন। মহারাজ, লোকে বলে, শূদ্রের প্রণবে অধিকার নাই, তায় তারা ম্লেচ্ছ, তাদের প্রণব কেমন করে দিলে? প্রণব ত ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহা-রও উচ্চারণে অধিকার নাই?

স্বামীজি। যাদের মন্ত্র দিয়েছি, তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন করে জান্‌লি?

প্রশ্ন। ভারত ছাড়া সব ত যবন ও ম্লেচ্ছের দেশ, তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথায়?

স্বামীজি। আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা কিন্তু না হতেও পারে। বাগ-বাজারে অঘোর চক্রবর্ত্তীর ভাইপো যে ম্যাথর হয়েছে। মাথায় করে গুয়ের হাঁড়ী নে যায়। সেও ত বামুনের ছেলে?

প্রশ্ন। তাই তুমি আমেরিকায় ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে?

স্বামীজি। ব্রাহ্মণ জাতি আর ব্রাহ্মণ্য গুণ দুটো আলাদা জিনিষ। এখানে সব জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্ব, রজ, তম তিনটে গুণ আছে জানিস্, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয় গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণত্ব গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।

প্রশ্ন। তার মানে সেখানকার সাত্ত্বিক ভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ বল্‌ছ?

স্বামীজি। তাই বটে, সত্ত্ব রজ তম যেমন সকলের মধ্যেই আছে, কোনটা কাহার মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশী, তেমনি ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরী করে, তখন সে শূদ্রত্ব পায়। যখন দু পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্য, আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবান্ চিন্তা বা ভগবৎ প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ। এক জাতি থেকে আর এক জাতি হয়ে যাওয়াও স্বাভাবিক। বিশ্বামিত্র আর পরশুরাম একজন ব্রাহ্মণ ও অপর ক্ষত্রিয় কেমন করে হল?

প্রশ্ন। এ কথা ত খুব ঠিক বোলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়েরা সে রকম ভাবে দীক্ষা শিক্ষা কেন দেন না?

স্বামীজি। ঐটী তোদের দেশের একটী বিষম রোগ। যাক্। সেদেশে যারা ধর্ম্ম কর্ত্তে সুরু করে, তারা কেমন নিষ্ঠা করে জপতপ, সাধনভজন করে।

প্রশ্ন। মহারাজ, তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি সকলও অতি শীঘ্র প্রকাশ

পায় শুন্‌তে পাই। সে দিন শরৎ মহারাজের নিকট তাঁর একজন শিষ্য মোটে চার মাস সাধন ভজন করে তার যে সকল ক্ষমতা হয়েছে, তার বিষয় লিখে পাঠিয়েছে, শরৎ মহারাজ দেখালেন।

স্বামীজি। হ্যাঁ? তবে বোঝ তারা ব্রাহ্মণ কি না—তোদের দেশে যে মহা অত্যাচারে সমস্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন, সেটা তার একটা ব্যবসা। আর গুরু শিষ্যের সম্বন্ধটাও কেমন! ঠাকুর মহাশয়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নি বল্লেন, "ওগো, একবার শিষ্য বাড়ী টাড়ী যাও, পাশা খেল্লে কি আর পেট চলে"? ব্রাহ্মণ বল্লেন, "হ্যাঁ গো, কাল মনে করে দিও, অমুকের বেশ সময় হয়েছে শুনচি আর তার কাছে অনেক দিন যাওযাও হয়নি"। এই ত তোদের বাঙ্গলার গুরু! পাশ্চাত্যে আজও এপ্রকারটা হয় নাই। সেখানে অনেকটা ভাল আছে।

কাল।

(৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।)

নৃত্য গীত বাদ্য ভাণ্ড প্রমোদ ছাড়িয়া
বসি কোন তটিনীর তটে,
অস্তাচলচূড়াগামী মিহির চাহিয়া,
চিন্তার সময় এই বটে।
বর্ষ-নদী ভীম বলে, কালের সাগরে চলে,
গুপ্ত কোন ফল্গুর প্রকার,
ধ্যানকর্ণে শ্রুতমাত্র কলনাদ তার॥

আছে শিল্পী হেন কি, রোধিতে গতি তার,
পারে কোন সেতু বিরচিয়া ?
আছে হেন, নয় চিত বিচলিত যার
হেন তার গতি বিচারিয়া ?
অদৃশ্য সে নদী ধায়, স্রোতে তার ভেসে যায়
দৃশ্য যত আছে সংসারের,
আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য আরও মতি মানবের!!

তথাচ এভাব মনে স্থান নাহি পায়,
ধন, জন, জীবন, যৌবন,
সে নদীর তৃণ কাষ্ঠ বুদ্বুদের প্রায়
“মম” শব্দে বুঝায় মিলন।
যে স্রোতে মিলায় আনি, সেই পুন লয় টানি,
সম্পদ্, জীবন আগে ধায়,
কভু বা সম্পদ্ ফেলে জীবন পালায়॥

অনাদি অনন্ত সিন্ধু অগাধ অপার,
(মোহকর-মাদক চিন্তার)
ইতস্ততঃ বিকীর্ণ বিশাল গর্ভে যার
ভুবন নিকর দ্বীপাকার।
চাহিয়া তোমার প্রতি, হেরিয়া তোমার গতি,
হে কাল! হৃদয়ে যাহা রটে
ধায় সে আকাশে, না ধরায় ধরা ঘটে॥

কি মোহন প্রলোভন না পারি রোধিতে,
আকণ্ঠ করিব ধ্যান পান,
নাহি পারি চিরন্তন অভ্যাস ভুলিতে,
জানি তায় হারাইব জ্ঞান।
ঘোর মোহে অচেতন, নিমীলিয়া দুনয়ন,
পরীক্ষায় জানি কতবারে
আন্ধার হেরিব মাত্র রবি-শশি-পারে!

—

সাবিত্রী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

হেরি দূরে ফণী, লোক শিহরে যেমতি,
ঋষির আপৎসূচী বচনে তেমতি,
নরপতি সশঙ্কিত কন তনয়ায়
"জানিও মা! (না জান কি? সরস্বতী তুমি)
পরহিত-ব্রতে ব্রতী ঋষি-কুল সদা,
কহেন অনৃত-কথা অপ্রিয় যদ্যপি,
মোহান্ধ মানবে শুদ্ধ আসন্ন বিপদে
রাখিতে; আমরা সবে এ ভব-সাগরে
বহিত্রী; সু-পথে গতি কর্ণধার-গুণে।
তেঁই তোমা কহি ঋষি-বাক্য বহু মানি
ফিরাও মানস তব। নির্গুণে, কুরূপে,
আয়ুহীন জনে কিম্বা, কন্যা সম্প্রদান
নহে ধর্ম্ম জনকের। ভাবি দেখ মনে,
(অহো ধিক্, এ ভাবনা ভাবিতে হইল)
গতে দিব্যলোকে পতি, দীনবেশে যবে,
সম্মুখে দাঁড়াবে আসি জলপূর্ণ আঁখি,
বদন সুধাংশু যেন রাহুর কবলে,
সীমন্তে সিন্দুর মুছা কেমনে তখন
জনক জননী তোর রবে প্রাণ ধরি?
"আমি কন্যা তব দেব," উত্তরিলা সতী
"ক্ষমিবেন প্রগল্ভতা, বুঝিনু জগতে
দুরন্ত অপত্যস্নেহে ভবাদৃশ জনও
অভিভূত; ভুলি যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম হায়!
হা বিধি, কতই মতে পরীক্ষিছ নরে!
ভবিষ্য আপদে ডরি, বিজ্ঞ কোন্ জন,
ছাড়ে ধর্ম্ম, ভুলে পণ জীবন রহিতে?

পণ্যদ্রব্য ক্রয় নহে এই পরিণয় ;
আজি ক্রয় করি যাহা মনোনীত বলি,
ফিরাই দু-দিন পরে নূতনের লোভে।
নির্গুণ কুরূপ কিম্বা আয়ুহীন যদি,
চণ্ডাল হতেও যদি হীন সেই জন,
বারেক বরেছি যাঁরে সেই মোর পতি।
কি কায বিচারি মোর গুণাগুণ তাঁর,
অর্পিয়াছি যাঁর করে জনমের মত
দেহ মন প্রাণ মম। এ সকলে আর
নাহি অধিকার মম। কে কোথায় কবে
দান করি ফিরি লয়ে করে ধর্ম্মনাশ ?
জানি স্থির সত্য ধর্ম্ম অসত্য তাবৎ।
সতীত্ব পরম নিধি, ইহার বিহনে,
রাজরাজেশ্বরী যেই চণ্ডালের হেয়।
তুচ্ছ খেলনক হেন, হেন ধনে হায়
যে নারী বিক্রয় করে, পামরী তেমন,
ধরে কি ধরণি আর ? অসতী নারীর
অসাধ্য নাহিক পাপ, আত্মদ্রোহী সেই ;
ঈশ্বরের কাছে তার নাহি পরিত্রাণ।
এ হেন অধর্ম্মে দেব কেন চাহ মোরে
ডুবাইতে ? খ্যাতি তব ধার্ম্মিক বলিয়া,
চরাচরে। মুক্ত করি মোহ-আবরণ
উন্মীলিয়া দিব্য চক্ষু কর দরশন
কোন্ পথে এ দাসীরে আদেশিছ যেতে।"
নীরবিলা মালবেয়ী, নীরবিলা যেন
বাদ্যমান বীণাযন্ত্র মোহি সভাস্থল।
উদারার্থসমন্বিত, বিচিত্রবিন্যাস
বাক্যাবলী, স্তম্ভিত করিলা ঋষিবরে।
মনে মনে শতবার বাখানি কন্যায়,
কহিলা "হে সাধ্বী, তুমি নারীকুলমণি,

রমণী সমাজ ধন্যা জনমে তোমার।
সুলক্ষণা এ আকৃতি করিলে দর্শন,
কমলা বলিয়া ভ্রম জনমে তোমায়।
পুণ্য ইব পূত পুনঃ হেরি চিত্তখানি
ঘুচে ভ্রম, দ্বিধা; মানে কমলা এ বটে।
"হে রাজন্" কন পরে রাজেন্দ্রে সম্ভাষি
"মহতী এ কন্যা তব, আজি বংশ তব
সমুজ্জ্বল, এ নন্দিনী সাবিত্রী আপনি।
ধর্ম্মময় যুক্তিযুক্ত বচন এমতি
সম্ভবে অপরে কভু? অহর্নিশি হৃদে
জাগ্রত সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, থাকে অমঙ্গল,
ধর্ম্মবলে সুমঙ্গলে হবে পরিণত।
সত্যবান্ সাবিত্রীর শুভ পরিণয়ে
বিঘ্ন না আচর কভু। কহিলা ভূপতি,
" যথা আজ্ঞা কর দেব লই শির পাতি।
পরে উঠি তপোধন, নৃপদুহিতার
সাদরে আঘ্রাণি শিরঃ, আশীর্ব্বাদ করি,
আমন্ত্রিয়া নরবরে বিদায় লইয়া
চলিলা অমরাপুরী, দিগঙ্গনাগণে
জাগায়ে সঙ্গীত স্বরে অতুল ভুবনে॥
　সমার্পিয়া রাজকায দিব্য যানে চড়ি,
চলিলা রাজেশ, যথা নর্ম্মদার কূলে
তপোবন মহীতলে স্বর্গের সমান।

ক্রমশঃ।

শ্রীহা—

তিব্বতে তিন বৎসর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আমি মন্দাকিনী ও কালীনদীর এই পবিত্র সঙ্গমে অবগাহন করিয়া কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিলাম। এই মন্দাকিনী ও কালীগঙ্গা সঙ্গম দর্শন করিলে মনে হয় যেন ইঁহারা হিমাদ্রির দুই যমজা কন্যা, দেবভূমি পিত্রালয় পরিভ্রমণ কামনায় পিতার সুরম্য নিভৃত ও মর্ত্ত্য চক্ষুর অগোচর, মণিময় প্রাসাদ হইতে পরস্পর বিযুক্তা হইয়া নানা বন ও উপবন সমূহ প্লাবিত করিতে করিতে, পুনরায় আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছেন; কালিন্দী যমুনা যেন ইঁহাদেরই জ্যেষ্ঠা, কোনও বিশেষ কার্য্যসাধনোদ্দেশ্যেই অভিন্নহৃদয়া ভগিনীদ্বয়ের সংসর্গসুখ ও পিত্রালয়ের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সুদূরদেশান্তরপ্রবাহিনী হইয়াছেন।

পূতসলিলা ভাগীরথী গঙ্গা, যমুনা, মন্দাকিনী ও অলকনন্দা, গিরিরাজ হিমালয়ের সেই একই দিব্য মণিময় কক্ষ হইতে বিনির্গত হইয়া অসংখ্য নদ, নদী, নির্ঝরিণী ও প্রস্রবণের সহিত মিলিতা, বিপুলায়তনা, স্রোতস্বিনী, স্বীয় বীচিবিস্ফারিত বক্ষে পরস্পর বিরোধী বিবিধ ভাব সমুদয় ধারণ করিয়া নানা রঙ্গে, অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে তর তর বেগে প্রবাহিতা হইয়াছেন; কোথাও বিবিধ রাগ রাগিণী সমন্বিত তরঙ্গভঙ্গে উচ্ছলিতা তানতরঙ্গিনী, তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে অবিশ্রান্ত, সুমধুর কলধ্বনিতে মহানির্জ্জন ও নিস্তব্ধ গিরিপ্রান্তর চিরমুখরিত করিয়া বিশ্বস্রষ্টার অপার অনন্ত মহিমাগীতি প্রচার করিতেছেন এবং রসজ্ঞ, ভাবুক ভক্তের হৃদয়কে ভাবসমুদ্রে ডুবাইতেছেন, কোথাও ঘোর আবর্ত্তময়ী প্রবাহিনী, প্রবল বেগে স্বীয় ভীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া ধরাতলকে যেন রসাতলে দিবার জন্য উদ্যত, তাঁহার দিগন্ত-বিশ্রুত মহাভীতিপ্রদ ঘোরারাবে এবং শতাশনিসম শক্তিবিশিষ্ট দশনে দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ বিদীর্ণ করিতে করিতে, অত্যুচ্চ গিরিসঙ্কট হইতে নিপতিত হইয়া জীবকুলকে সন্ত্রস্ত করিতেছেন; মহাকাল রুদ্রের প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্যাভিনয় শেষ না হইতে হইতেই আবার সেই ভীষণ কল্লোলকোলাহলময়ী ভৈরবী, আপন সংহারমূর্ত্তি সংবরণ করিয়া বিমলপ্রফুল্লসলিলা, যেন বিশ্বপ্রেমে ঢল ঢল এবং ভীষণ গর্জ্জনকারী মহাত্রাসজনক রুদ্রাস্যে মহোল্লাসে খল খল হাস্য করিতে করিতে,

আপন ভাবে আপনি বিমোহিতা হইয়া তরঙ্গায়িত হইতেছেন, যেন অপার আনন্দে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আপন সহস্র বাহু প্রসারিয়া অসংখ্য জীব-সমূহকে সুশীতল বক্ষে ধারণ করিবার জন্য অদ্ভুত কল কল স্বরে অবিরাম আহ্বান করিতেছেন এবং হৃদ্য মাতৃস্তন্যদুগ্ধের ন্যায় আপন সুশীতল বারিধারায় ধরাবাসিগণের জীবন দান করিতেছেন; কোথাও স্বয়ং অতি প্রাচীন তীর্থ সমুদয়ের দর্শন এবং বহুতর নূতন তীর্থের পত্তন করিয়া, মহর্ষি-গণসেবিত শান্তিময় আশ্রম সকল বিবিধ নয়নরঞ্জন, প্রাণারাম, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, ফুল ও কন্দমূলে চিরসুভিক্ষ ও সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, পুণ্যদর্শন আশ্রমসমূহের পাদমূল সুষিক্ত না করিতে করিতেই প্রবল বেগ-বতী স্রোতস্বতী এমনি শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছেন, কোথাও এমনি সুপ্রশস্ত গভীর জলাশয়ের ন্যায় হইয়া বিপুল আবর্ত্তময়ী সুমধুর কুলু কুলু স্বরে তান ধরিয়া বহিয়াছেন যে, তাহা দেখিলে মনে হয় বুঝি আশ্রমবাসী মহর্ষিগণ-কণ্ঠবিনিঃসৃত সুললিত বেদধ্বনি শ্রবণে মুগ্ধা প্রবাহিনী, সেই সকল পরম পবিত্র শান্তিময় স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না; পরম রমণীয় পবিত্র আশ্রম সমূহের সন্দর্শনে পরমোল্লাসিতা প্রবাহিনী, সমুদয় উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া পরমোদার আশ্রমবাসিগণের সর্ব্বতোভাবে মনো-রঞ্জন করিবার জন্যই বুঝি স্বীয় অনিবার্য্য গতি রুদ্ধ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন; কোথাও কঠিন পার্ব্বত্য ভূমিকে চির উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া পার্ব্বতীয় জন সাধারণের জীবন স্বরূপ বহুবিধ শস্যে স্বীয় উভয় কূল পূর্ণ এবং নানা বর্ণের কুসুমস্তবকে খচিত চিরনবীন, সুকোমল, বিচিত্র অত্যুজ্জ্বল শ্যামল বসনে পিতার পাষাণময় দেহ আবরণ করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কান্তি সম্পাদন করিতেছেন, এবং গিরিরাজ হিমালয়ের বাহ্য কঠিন ভাব যে অলীক, তাহাই যেন সকলকে বুঝাইতেছেন। পরমকরুণাময়ী, জগজ্জননী গৌরী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মচারিস্বরূপিণী শান্তবীগঙ্গা এবং প্রেমময়ী যমুনা যাঁহার আত্মজা, তাঁহার সুবিশাল হৃদয় যে কি ধাতুতে নির্ম্মিত, তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই এবং তাহা যে অপার করুণায় পূর্ণ, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সেই পরম গুহ্য স্থানকে চিরকাল মর্ত্ত্যচক্ষুর অগোচর ও জীবের অগম্য করিয়া রাখিবার জন্যই বুঝি মহাভাগ হিমালয় মহাকঠিন দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত।

সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নগতনয়াগণ নগাধিপের বাহ্য কঠিন নীরস ও নির্জীব ভাবকে

সুকোমল, সরস ও সজীব করিয়া একে একে সকলেই সুপবিত্র গঙ্গাসঙ্গমে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। শতধা বিভক্ত শক্তির যেন একই মহাশক্তিতে লয় হইয়াছে।

উত্তরাখণ্ড-বাহিনীগুলি সকলেই হিমালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন শোভা ও সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াই পতিতপাবনী ভাগীরথীগর্ভে নিমজ্জিতা হইয়াছেন। কেবল সুরাপগা গঙ্গা ও যমুনাই সুবিমল পীযূষধারায় ধরা সুশীতল করিয়া বহুদেশ-দেশান্তর প্রাবিত করিতে করিতে বিভিন্ন পথে পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব মর্ত্ত্যলীলার চরম স্থানে উপনীত হইবার জন্যই বহুনিম্নগা হইয়াছেন। ভগীরথাভীষ্টদায়িনী ও স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণী গঙ্গা যেমন সগররাজতনয়-গণের উদ্ধার কামনায় অসংখ্য জীবের সদ্গতি বিধান করিতে করিতে এই মর্ত্ত্যে স্বর্গীয় সুখ ও শান্তি বিতরণ করিয়া সাগরাভিমুখিনী হইয়াছেন, কালিন্দী যমুনাও বুঝি তেমনি শ্রীলীলারসময় হরির নিরুপমা ব্রজলীলার সহচরী হইবার জন্যই শ্রীবৃন্দারণ্যাভিমুখিনী হইয়াছেন। মুরলীমনোহরের অমৃতস্রাবী হৃদয়োন্মাদ-কারী বিশ্ববিমোহন বংশীধ্বনি শুনিবার জন্যই বুঝি শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা গোপবধূর ন্যায় স্বীয় পিত্রালয় ও পরমাত্মীয় স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্রীহরির পরম প্রিয় লীলানিকেতন সেই ব্রজের দিকেই ধাবিতা হইয়াছেন, বহুভাগ্যবতী যমুনা চিরশুভ্র তুহিনরাশিসমুদ্ভবা হইয়াও বুঝি কেবল ত্রিভঙ্গ-মুরারি শ্যামসুন্দরের শ্যাম অঙ্গে আপন অঙ্গ মিশাইয়া অভিন্ন ভাবে তাঁহার ভজনা করিবার জন্যই সেই পরমধাম ব্রজের দিকেই আপন দ্রবময়ী শ্যামল তনু ঢালিয়া দিয়াছেন অথবা শ্রীযমুনার হৃদয়কন্দরে লুক্কায়িত কালাচাঁদের সুনীল, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে; তপনতনয়া হই-য়াও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধুরা গোপবালাগণের শ্রীকৃষ্ণবিয়োগজ হৃদ্গত মহত্তাপ শমন করিবেন বলিয়াই বুঝি যমুনা শ্রীব্রজধামাভিমুখিনী হইয়াছেন: আর সেই জন্যই বুঝি যমুনার আর একটী নাম তাপ-শমনী; শ্রীকৃষ্ণবির-হাকুলা, ব্রজবালাগণ, নীলকান্তমণি-প্রভ যমুনার শ্যামল কান্তিতে কালা-চাঁদের সাক্ষাৎকার-সুখ অনুভব করিয়া ক্ষণেকের জন্যও আশ্বস্তা হইবেন এবং মাধব-তোষিণী যমুনা, মাধব-প্রিয়া ব্রজবধূগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যধামে নিজ অবতরণ সার্থক করিবেন বলিয়াই বুঝি একাকিনী সেই ব্রজের দিকে ছুটিয়াছেন; বংশীধারীর বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই ব্রজনারীগণ যেমন আপন আপন পতি, পুত্র ও আত্মীয় স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া

উন্মাদিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া সেই কিশোর মনোচোরকে ধরিয়া ফেলিতেন, শ্রীযমুনাও বুঝি তেমনি সেই দেবাদি-মহর্ষিগণ-বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-চুম্বিত বেণুবাদন স্বরশ্রবণে আত্মহারা, উজানবাহিনী হইয়া তাহার অলৌকিক মোহিনীশক্তির বিচিত্র বার্ত্তা চির-স্মরণীয়া করিবার জন্যই অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারগণের ন্যায় চির-নিভৃত গিরিগুহাভ্যন্তরস্থা হইয়াও আপন লজ্জা, ভয়, মান ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া লম্ফে ঝম্পে বহু দুর্গম গিরিপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া সেই ব্রজ-বিপিন-বিহারীর উদ্দেশে চলিয়াছেন; ভগবল্লীলা-রস-মাধুরী-পানাসক্ত-চিত্তা, মধুবন-চারিণী যমুনা, যথার্থই শ্রীভগবানের লীলা-সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার সম্যক্ মনোরঞ্জন করিবার জন্য এবং কুরঙ্গনয়না গোপাঙ্গনাগণের প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্তা হইয়া, পরমামৃতবাহিনী নাম ধারণ করিবার জন্যই জাহ্নবী-সঙ্গিনী হইয়াও তাঁহাকে কিছুকাল জাহ্নবীবিযুক্তা হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ভগবল্লীলারসাভিষিক্ত শ্রীযমুনা নামে যথার্থই অমৃতের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোরারায়ের মধুময় জীবনে সেই বন্যা আসিয়া একদিন এই পবিত্র বঙ্গভূমকে প্লাবিত করিয়াছিল। রত্নাকরের কেবল মাত্র শ্যাম অঙ্গ দেখিয়াই যখন তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তখন না জানি শ্রীযমুনার মধুময় নামে কি মহাভাবসমুদ্রই তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিত!

সুরধুনী গঙ্গা ও যমুনার সুবিমল ধারা আমাদের অন্তঃকরণে প্রকৃতই সুমহতী স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের যাবতীয় গৌরবাস্পদ, বরণীয় সুমহৎ ঘটনাই আর্য্যাবর্ত্তের এই দুই বিচিত্ররূপা স্রোতস্বিনীর বিমলতটে সুসম্পন্ন হইযাছে। এই দুই অপূর্ব্ব ধারার উভয়কুল যে সকল অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা সমূহের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া আছে, তাহার তুলনা এ জগতে আর কোথাও নাই, বলিতে আমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিনা। আমাদিগের শাস্ত্রে পুণ্যসলিলা গঙ্গা ও যমুনার যে অতুলমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা যে কতদূর সঙ্গত, একটু পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। জগৎপূজ্য মহর্ষিগণ কথিত শাস্ত্রের প্রতি কথাই যেন আজও গঙ্গা ও যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গাভিঙ্গাতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; এই গঙ্গা ও যমুনার মহামহিমময় তীরে শ্রীভগবান্ স্বযং যুগে যুগে আসিয়া যে লীলারসামৃতধারা বহাইয়াছিলেন, ত্রিভুবনেও কেহ তাহার উপমা পাইবেন না। তাহার পর অনন্ত-ভাবময়ী-ভাগীরথী

গঙ্গা ও ভারতের ভাগ্যনিয়ামিকা যমুনার বিচিত্র উভয়কূলে এই ভারত আকাশের কত শত সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়াস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই বা কে করিবে?

হিমালয়ের চরমশিখরবাসিনী, শৈলবিদারিণী যমুনা, সম্পূর্ণ করুণাবিগলিত হইয়াই ভারতমাতার পবিত্র অঙ্গে অসংখ্য ফলপুষ্পে খচিত বিবিধ শস্যশ্যামল বিচিত্র বসন ও ভূষণ পরাইয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রী, শোভা ও সম্পদে জগৎকে নিতান্ত মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করিয়া এবং ঐশ্বর্য্যের মেরু-গিরি-চূড়াসম বহু প্রাচীন নগর নগরীর বিপুল ধ্বংসাবশেষে ভারতের অতুল গৌরব ও অক্ষয় কীর্ত্তি দেখাইয়া সমগ্র সভ্য জগৎকে বিস্ময়াভিভূত করিতেছেন এবং ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ভাবিয়া পরমাকুলা, বিষাদ-কালিমা-মাখা, অতি-ক্ষীণ-তনু-ভারেম্রিয়মানা যমুনা, সকরুণ কুলু কুলু রবে ভারতের অসীম ভাগ্যবিপর্য্যয় ও তাহার অতীতের যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদোৎপাদক বিচিত্র সুখ ও দুঃখ কাহিনী শুনাইয়া বিলাপ করিতে করিতে তীর্থরাজ প্রয়াগে জাহ্নবীসঙ্গিনী হইয়া আপন লীলা শেষ করিয়াছেন। মধুরিপুভূষিণী যমুনার আদি ও মধ্য লীলার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, এক্ষণে একটু দেখা যাউক, তাঁহার সীমান্ত স্থানেরই বা বিচিত্রতা কি!

ক্রমশঃ।

পদুকোটায়

বেদান্তপ্রচার।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ত্রিচিনপল্লী জেলাস্থ পডুকোটাসহরনিবাসী ব্যক্তিগণের আগ্রহে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিগত ২৪শে এপ্রেল তারিখে তথায় গমন করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও ছাত্রগণ তাঁহাকে উৎসাহসহকারে অভিনন্দন প্রদান করেন। এখানে তিনি পাঁচ দিন অবস্থিতি করেন। অনেক গণ্য মান্য প্রাচীন তন্ত্রের পণ্ডিত এবং অনেক ইংরাজীশিক্ষিত ভদ্রলোক ধর্ম্মসম্বন্ধে ইঁহার সুগভীর উপদেশ শুনিতে আসিতেন। ইনি এখানে ধর্ম্মের আবশ্যকতা, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে পাঁচটী

সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। একদিন নিজগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্বন্ধে কিছু বলেন ও একদিন ছাত্রবর্গকে সম্বোধন করিয়া কতকগুলি উপদেশ দেন। নিম্নে তাঁহার কথোপকথনের মধ্য হইতে কতকগুলি কথা এবং তাঁহার বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দেওয়া গেল।

"বাক্য যেন ফুলের মত আর কার্য্য ফলস্বরূপ"; ধর্ম্মচর্চ্চার উদ্দেশ্য শুধু—আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি চরিতার্থ করা নহে, ধর্ম্ম সাধন করাই উদ্দেশ্য। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমাদের শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী অনধিকারীর ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। যেমন কোন বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র একক্লাসে পড়ে না, তাহাদের জ্ঞানের উন্নতির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, ধর্ম্ম-তত্ত্বশিক্ষা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বৌদ্ধগণ অবারিত ভাবে সকলকেই তাঁহাদের ধর্ম্মে গ্রহণ করিলেন কিন্তু সাধারণে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" উচ্চভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া বুদ্ধের ধর্ম্মকে ক্রমশঃ কলঙ্কিত করিয়া ফেলিল। সাধনচতুষ্টয় ব্যতীত বেদান্তের অধিকারী কেহই হইতে পারে না, তন্মধ্যে প্রধান মুমুক্ষা—মুক্তি-লাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা। পাশ্চাত্য প্রণালীতে অভিনন্দন প্রদানের রীতি সম্বন্ধে স্বামীজি বলেন,—বিনাপ্রয়োজনে পাশ্চাত্য প্রণালীর যখন তখন অনু-সরণ করা ভাল নহে—কারণ, অনুকরণ মৃত্যুস্বরূপ। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে বড় কোন্‌টী এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন, জ্ঞানী ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে নানা দিকে ধাবিত হন কিন্তু ভক্তের নিকট ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া থাকেন। বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দেওয়া গেল।

ধর্ম্মের আবশ্যকতা—মানুষ স্বভাববশে সুখচেষ্টায় ধাবমান। এই সুখচেষ্টায় অন্যান্য মানবের সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ক্রমশঃ ঠেকিয়া সে এই নীতির অনুসরণ করে, "অন্যে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যব-হার করিবে ইচ্ছা কর, তুমিও অপরের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার কর"। কিন্তু সে শীঘ্রই দেখিতে পায়, সে যতই নীতিপরায়ণ হউক, মৃত্যু অনিবার্য্য। এই মৃত্যুচিন্তা হইতে সে জগতের অসারতা বুঝিতে পারে এবং পরমসুখলাভের জন্য জগতের বাহিরে যাইতে চায়। ইহা হইতেই জগতের পরম আশ্রয়-স্বরূপ পরমপুরুষের সত্তায় তাহার বিশ্বাস আসে। অবশেষে সে নিজেরও স্বরূপ দর্শন করে, তখন সমুদায় সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়।

কর্ম্মযোগ—মানুষ স্বভাবতঃই কর্ম্মপ্রবণ। কর্ম্ম করিতে করিতে সে শীঘ্রই দেখিতে পায়, কোন উচ্চতর শক্তি তাহার সমুদায় কার্য্যের নিয়ামক। সুতরাং সে সাংসারিক সুখলাভের জন্য নানারূপে তাহার উপাসনা করে। তখনও সে পূর্ণ সুখলাভ করিতে পারে না, পরিশেষে সে বুঝিতে পারে, জাগতিক অনিত্যসুখের অন্বেষণ ছাড়িয়া নিত্য সুখের অন্বেষণই শ্রেয়ঃ। তখন সে যে প্রবৃত্তিবশে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাকে সংযত করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।

সসীম সুখের অন্বেষণেই কর্ম্মপ্রবৃত্তি। বাসনাবশে পরিচালিত না হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মবন্ধন দূর হয়। অতএব ঈশ্বরার্থে সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, সবই সেই পরম প্রভুর বলিয়া জান, তাহা হইলেই কালে মুক্তি ও জ্ঞান লাভ করিবে। ইহাই কর্ম্মযোগ।

রাজযোগ—এই বক্তৃতায় স্বামীজি কাঁচা আমি হইতে পাকা আমি অর্থাৎ সকলের মূলস্বরূপ সেই অনন্ত পুরুষে কিরূপে গমন করিতে হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী বর্ণনা করিলেন। কিন্তু বলিলেন, প্রথমে মনকে জয় করিতে হইবে নতুবা রাজযোগের অভ্যাস বড় বিপৎসঙ্কুল। যে ব্যক্তি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও নিঃস্বার্থভাবাপন্ন করিতে পারিয়াছে, এক মাস কুম্ভক (চিত্তস্থৈর্য্যের অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসের যে অবস্থা হয়) অভ্যাস করিলে তাহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া সে সমাধিস্থ হইতে পারে এবং তদবস্থায় সে অনন্ত সুখস্বরূপকে যেরূপে ইচ্ছা সাক্ষাৎ করিতে পারে। এই সমাধি লাভ হইলে সে জন্ম মৃত্যু বন্ধনের অতীত হয়, সুখ বা দুঃখ তাহাকে অভিভূত করিতে পারেনা, সংশয়জাল ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমাধিলব্ধ এই সুখ সে অনন্ত কালের জন্য সম্ভোগ করিতে থাকে।

ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ—স্বামীজি ছাত্রগণকে অর্থের জন্য বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতে বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, শিক্ষকের প্রতি অগাধবিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে। তাঁহার হস্তে যন্ত্রস্বরূপ হইতে হইবে। শিক্ষকের প্রতি ভালবাসা থাকিলেই ছাত্রের সমুদায় জ্ঞান লাভ সম্ভব। যে সকল গ্রন্থ পাঠে কুৎসিৎ ভাবের উদ্দীপনা হয়, সেই সমস্ত পুস্তক পাঠ ত্যাগ করিতে হইবে, রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠেই আমাদের প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতে পারে। অপর্য্যাপ্ত গুরুপাক স্বাদুদ্রব্য খাই-

লেই শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না, নিয়মিত ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর সুপাচ্য খাদ্য দ্বারাই শরীরের পুষ্টিবিধান করিতে হইবে। জীবনধারণের জন্যই আহার। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। পড়াশুনা করিতে হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার সময় হয় না এই অছিলায় নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শৈথিল্য প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ, এতদ্রূপ অনুষ্ঠানেই চিত্তের স্থৈর্য্য ও পবিত্রতা আসিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই শিক্ষার যথার্থ সহায়তা হয়। তিনি ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগকে রীতিমত উচ্চারণে লক্ষ্য রাখিয়া বেদপাঠ করিতে উপদেশ দিলেন।

জ্ঞানযোগ—জগৎকে যদিও আপাততঃ মনোনিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। সুতরাং উহার বাস্তব সত্তা নাই। এক অনন্ত পদার্থই বিদ্যমান। নেতি নেতি বিচারের দ্বারা আপাতপ্রতীয়মান বিষয়সমূহ—রূপ রসাদি বিষয়, দেহ, মন, এমন কি, বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত নিরাস কর, তাহা হইলে সেই একমাত্র সত্তারই উপলব্ধি হইবে এবং সকল ভয় ও দুঃখের অবসান হইয়া তুমিও সেই একস্বরূপ হইবে। কেবল দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই ইহা সম্ভব। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিবলে মনের এই ভ্রান্তিময়ী প্রপঞ্চউৎপাদিনী শক্তিকে নিবারণ করিতে হইবে, তবেই সেই প্রকৃত সত্তা আপন স্বরূপে প্রকাশিত হইবেন।

মদীয় আচার্য্যদেব—মদীয় আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব পঠদ্দশায় শুষ্ক জ্ঞানবিচারের অসারতা বুঝিয়া পাঠে একেবারে অমনোযোগী হন এবং যাহা দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর দর্শন হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু শিখিবেন না, এই সঙ্কল্প করেন। যখন তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মায়ের পূজারী ছিলেন, তখন জগদম্বার দর্শনের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠেন যে, অনেক সময় ক্রমাগত রোদন করিতেন, অনেক সময় কিছুমাত্র খাইতে পারিতেন না। অবশেষে তাঁহার কাতর প্রার্থনা সফল হইল, তিনি জগদম্বার দর্শন লাভ করিলেন। এই অবধি তিনি সর্ব্বদা জগজ্জননীকে দর্শন করিতেন, এমন কি, সামান্য ভিক্ষুকে পর্য্যন্ত তিনি মায়ের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেন না। জগদম্বার সর্ব্বভূতে ভালবাসা উপলব্ধি করাতে তাঁহার ধারণা হইল, কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নহে। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার ভালবাসা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলেন। কুম্ভকাদি

যোগের দ্বারাও তিনি সমাধি অবস্থা লাভ করিলেন। নানাপ্রকার সাধনের দ্বারা তিনি কাম, লোভ ও অহঙ্কারকে সমূলে বিনাশ করিলেন। সহস্র সহস্র ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিল। রোগে কাতর হইয়াও তিনি লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। অবশেষে তিনি শান্তভাবে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে গমন করিলেন।

ভক্তিযোগ—ভক্তের প্রথমে এই ধারণা থাকে যে, সে দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় সে কিছুই নহে এবং ঈশ্বর অনন্তশক্তিমান সুতরাং তিনি তাঁহার ভক্তকে উদ্ধার করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ। তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় প্রেম। ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই ভক্তের আদর্শ। তিনি তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় ভাবগুলি ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করেন। প্রভু বলিতেন, ঈশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যই ভক্তের আকর্ষণ স্বরূপ। এমন প্রেমস্বরূপ ভগবান্‌কে আলস্য ও উদাসীনতা বশতঃ কেন ভালবাসিতে পারিতেছিনা, এই-ভাবিয়া ভক্ত আপনিই আপনার উপর ক্রোধ করেন এবং নিজ পাপ ও দুর্ব্বলতার জন্য আপনাকে অতি হীন জ্ঞান করেন। আর ব্যাকুলভাবে ভগবৎপ্রেমরূপ অক্ষয় ধন লাভের জন্য সতত উদ্গ্রীব থাকেন। যখন সৌভাগ্যক্রমে তিনি ভগবৎসাক্ষাৎকার করেন, তখন সেই আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হন। তিনি আপনাকে ঈশ্বরতনয় বলিয়া গৌরব করেন এবং যে সকল সাধু ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মত সৌভাগ্য এখনও কেন তাঁহার হইল না, এই ভাবিয়া ব্যাকুল হন। এইরূপে ব্যাকুলভাবে ভগবদন্বেষণপরায়ণ হইয়া যে অহংভাব জলমধ্যস্থ যষ্টিখণ্ডবৎ ভগবান্ হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, একেবারে সেই অহংভাবপরিশূন্য হন এবং পরিশেষে সেই আনন্দময় স্বরূপে একেবারে তন্ময় হইয়া যান।

—

সমালোচনা।

ভাষাপরিচ্ছেদ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামক গ্রন্থকাররচিতটীকাসমেত। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত। শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অর্থব্যয়ে সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ম খণ্ড মূল্য ১৲ টাকা।

'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থ প্রশস্তপাদ মুনিপ্রণীত বৈশেষিক সূত্রভাষ্য অবলম্বনে রচিত। কিন্তু বৈশেষিক নিবন্ধ হইলেও উহাতে বহুস্থানে ন্যায় দর্শনের মতও পরিগৃহীত হইয়াছে।' বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইহার প্রণেতা। 'গ্রন্থে বৈশেষিক দর্শনোক্ত "ভাষা" অর্থাৎ সপ্ত পদার্থের পরিচ্ছেদ বা নির্ব্বচন আছে বলিয়া উহার নাম ভাষাপরিচ্ছেদ।' এ পর্য্যন্ত এই কঠিন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয় নাই। পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙ্গালীর যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। অনেকগুলি বাঙ্গালা টীকা সংযোজিত হওয়াতে গ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইযাছে।

বঙ্গলক্ষ্মী—১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। কৃষি-শিল্প-সংবাদাদি বিষয়ক নূতন মাসিক পত্র। কাশীপুর কৃষিশালা হইতে প্রকাশিত। স্বদেশীয় কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধন বঙ্গলক্ষ্মীর প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার একতৃতীয়াংশ ভিন্ন অবশিষ্ট কলেবর কাশীপুর কৃষিশালার উদ্ভিদ্ বীজাদির ও অন্যান্য বিজ্ঞাপনে সুশোভিত। সম্পাদকীয় মন্তব্যাস্তন্ত শিক্ষাপ্রদ, কিন্তু কয়েকটী সূচনাতেই সমাপ্ত। এই-খানি প্রথম সংখ্যা। উদ্দেশ্য উচ্চ পরে অধিকতর শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের আশা করা যায়। এরূপ সংবাদপত্রের স্থায়িত্ব কামনা করি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা দেওঘর রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের ১৯০৪ সালের বার্ষিক বিবরণী পাইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। এই আশ্রম হইতে সকল প্রকারের কুষ্ঠ-রোগীই অতি যত্নের সহিত হোমিওপ্যাথিক মতে এবং নিম তৈলাদি প্রয়োগের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে রোগীর সংখ্যা মোট ৮৯ জন, ইহাদের মধ্যে ২১ জন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, বক্রী রোগী-দের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা ২ জন মাত্র। রোগের প্রকৃতি বিচারে শতকরা প্রায় ২৫ জনের আরোগ্য লাভ বেশ উন্নতির লক্ষণই বটে। বৈদ্যনাথের মোহান্ত মহাশয়ের দৃষ্টি এখনও হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীদের উপর ভাল রূপ নিপতিত হয় নাই এবং আশ্রমগৃহের উন্নতির জন্য রাজামহারাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নাই।

কতকগুলি ভদ্রলোক নিঃস্বার্থভাবে স্থানে স্থানে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন। আমাদের ধারণা—আশ্রমের জন্য রাজামহারাজদিগের নিকট আবেদন নিবেদন অপেক্ষা এইরূপ ভাবে বিভিন্ন স্থানের মহোদয়গণ চেষ্টা করিলে যদিও ধীরে ধীরে তথাপি নিশ্চিতরূপে আশ্রমের উন্নতি হইতে থাকিবে।

বিগত ৩০শে বৈশাখ শনিবার বহুবাজার রামকৃষ্ণ সমিতি এক উৎ-সবের অনুষ্ঠান করেন। পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় কঠোপ-নিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত পূজাকীর্ত্তনাদি হয়।

বিগত ধর্ম্মশালার ভূমিকম্পের সাহায্যার্থ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে একজন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাঠক-বর্গকে পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত তিনটি ঠিকানার মধ্যে যে কোন ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করিতে পারেন।

১। স্বামী নির্ভয়ানন্দ C/o পোষ্টমাষ্টার, কোতোয়ালি বাজার, ধর্ম্মশালা, (পঞ্জাব)।

২। স্বামী স্বরূপানন্দ, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া)।

৩। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, মঠ, বেলুড়,—

(হাওড়া)

এ পর্য্যন্ত কার্য্যের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া যাইতেছে;—

২৮শে এপ্রেল ইহাঁরা ধর্ম্মশালায় পঁহুছেন। ২রা মে হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত ধর্ম্মশালার নিকটবর্ত্তী কানাযড়া, সিধপুর, ইয়ুল, সারা, ধারী, গাংবেরু, বগৌলি, আংস্থলি, মোতায়ুর প্রভৃতি গ্রামবাসিগণের নিকট যাইয়া খাদ্য, বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়। লোকের অবস্থা অতি শোচনীয়। শুনিয়া সুখী হইলাম, আরও দুই জন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ইহাঁদের সাহায্যার্থ গিয়াছেন। আর্য্যসমাজ খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে বিতরণ করিতে দিয়া বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

বিগত ১৫ই বৈশাখের উদ্বোধনে কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯০৪ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একটী ভ্রম আছে। "বাবু ভজন লাল লোহিয়া প্রমুখ কয়েকটী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ৬১০৭৲ টাকা ব্যয়ে দুইটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন"। এই স্থলে ৬১০৭৲ টাকার পরিবর্ত্তে ৬০১৭৲ টাকা হইবে।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বিগত এপ্রেল মাসের কার্য্যবিবরণী দেওয়া গেল।

সমাগত সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা ১৩৪ জন এবং দরিদ্র গৃহস্থ রোগীর সংখ্যা ১৮৯ জন। সাধু সন্ন্যাসী রোগীদের মধ্যে ৬ জন চিকিৎসা পরিত্যাগ করেন, ২৮ জন এখনও আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতেছেন, এবং অবশিষ্ট সকলে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। দরিদ্র গৃহস্থ রোগীদের মধ্যে ১৩ জন চিকিৎসা পরিত্যাগ করেন আর ৭২ জন এখনও চিকিৎসিত হইতেছেন এবং অবশিষ্ট রোগিগণ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, আর যে ১০ জন রোগীকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল,

তাঁহাদের মধ্যে ২ জন চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ১ জন এখনও চিকিৎসিত হইতেছেন এবং অবশিষ্ট সকলে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

জমা		খরচ	
গত মাসের জমা ···	২৪৭।৵৳ পাই	খাদ্য ··· ···	৬৩।৯ পাই।
বাবু নিকুঞ্জবিহারী মল্লিক	৫৲	কাপড় ···	২।৯
লালা রাম সহায়	৫৲	ঔষধ ··· ···	৪।/৬
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ঝাড়ুদার*	২০৲	আশ্রম সরঞ্জাম ··	৭॥৬
জনৈক বন্ধু	২৫৲	ডাক ···	৭।০
জনৈক সহৃদয় বন্ধু	১০৲	পারিশ্রমিক ···	১৶৬
বাবু রামকৃষ্ণ বসু	৫৲	আলো ···	২।৯
,, ষষ্ঠীবর ভট্টাচার্য্য	১০৲	৩ টি গৃহ পরিবর্ত্তন এবং মেরামত খরচা ···	৪১৸৵৯
মিঃ, এস, লালতা প্রসাদ	২৫৲	চাকরের বেতন ···	৬।৵০
এস, এন্, পণ্ডিত	৫০৲	১৯০৪ সনের বার্ষিক বিবরণী ছাপাইবার খরচ ··· ···	২৯৵০
	৪০২।৵৳ পাই।		১৬৫॥/৬ পাই।

সর্ব্বশুদ্ধ জমা ———— ৪০২ ৵৳ পাই।

সর্ব্বশুদ্ধ খরচ ———— ১৬৫॥/৬ পাই।

হস্তে ২৩৬৸৬৳ পাই।

ইহা ছাড়া আরও ২/১ সের ময়দা, ১॥৩ সের চাল, ।৫ সের ডাল, জনৈক বন্ধু দয়া করিয়া দিয়াছেন তাহাও সমুদয় খরচ হইয়া গিয়াছে।

যাঁহারা এই সেবাশ্রমে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বামী কল্যাণানন্দ, রামকৃষ্ণসেবাশ্রম, কনখল (সাহারাণপুর) অথবা সম্পাদক, প্রবুদ্ধভারত, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবুদ্ধভারত পত্রে উক্ত দান স্বীকৃত হইবে।

---

* এই নাম স্বাক্ষর করিয়া জনৈক সহৃদয় বন্ধু কয়েকমাস হইতে সেবাশ্রমে সাহায্য করিতেছেন।

নূতন জাপান।

স্বামী সদানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন কোরে ইউরোপীয় বিজ্ঞান জাপান কিরূপে নিজস্ব করতে চেষ্টা কোরেছে, তা কতকটা আগে বলেছি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন জাপানের নূতন জীবনস্রোত বইতে আরম্ভ হল, উনপঞ্চাশজন জাপানের বীর সন্তান, পাশ্চাত্য সভ্যতার গূঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত হবার জন্যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, অভিনব জ্ঞানার্জ্জনে দৃঢ় অধ্যবসায়ে আত্মসমর্পণ করলে। এই সময় হতেই দলে দলে জাপানী যুবক মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে স্বদেশ পরিত্যাগ কোরে, ঘোর কষ্টে,ঐসকল দেশে মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন প্রতিজ্ঞায় বিবিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হতে লাগল। এই মহতী চেষ্টার ফলে, জাপান সমস্ত পাশ্চাত্য শিল্প ও বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, কৃষি, বাণিজ্য, কল কারখানা, যে দেশে যা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়েছে, নিজের অবস্থার উপযোগী কোরে আয়ত্ত কোরেছে। আজ জাপানের নৌবল ব্রিটিশ অনুকরণে গঠিত, জাপানের বাহিনীদল জার্ম্মান আদর্শে শিক্ষিত, আর জাপানী বালক বালিকা মার্কিনের পদানুসরণে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভে দৃঢ়ব্রত। দীন, অনাথ, অন্ধ, খঞ্জ, জাতীয় শিক্ষা সকলেরই জন্য অবারিত। ছেলে মেয়ে বিদ্যা শিক্ষা না কোরলে, বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হলে, বাপ মাকে জবাবদিহি হতে হয়। অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী যাহাতে কেহ সাহিত্য, কেহ বিজ্ঞান, কেহ শিল্প, কেহ ব্যবসায় কেহ বা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব সকল শিক্ষা কোরতে পারে, জাপানে এরূপ ব্যবস্থা প্রতি গ্রামে বর্ত্তমান। সাধারণ ও উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্বন্ধে জাপানে কিরূপ বন্দোবস্ত, তাহা পূর্ব্বে বলেছি। এখন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলবার ইচ্ছা আছে।

ভারতের মত জাপানের প্রজাকুল কৃষিজীবী। শতকরা ষাটজন লোকের জীবিকা চাষের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান রাজ আইনে জমির সত্ত্বাধিকারী প্রজা। ধানের চাষই প্রধান। যব, গম, রাই, কলাই, আলু, তুলা, নীল, তামাক, সরসে অল্পই উৎপন্ন হয়। এক একটী চাষী পরিবার গড়ে ৭।৮ বিঘা মাত্র জমি চাষ করে। এতেই তাদের সমস্ত সঙ্কুলান হয়। একথায় অনেকের আশ্চর্য্য বোধ হতে পারে কিন্তু জাপানী কৃষক ৭।৮ বিঘায় যে ফসল উৎপন্ন কোরতে পারে, অপর দেশে তা ২৫ বিঘা জমিতে হয় না।

এতেই বুঝা যায়, জাপানে কৃষিকার্য্য কত উন্নতি লাভ করেছে। এদেশের চাষীরা চাষ ছাড়া অনেক অন্য কায করে। কায—কায—কায—এদের জীবনের মূলমন্ত্র। জাপান কর্ম্মযোগী। শীতকালে যখন মাঠের কায বন্ধ থাকে, অথবা যখন ক্ষেতের কায শেষ করে অবসর পায়, সে সময় কেহ কেহ রেশমের চাষ, গুটি তৈরি, সুতকাটা, দড়ি ও জাল বোনা, মোটা কাপড় বোনা, খড়ের টুপি, খড়ের জামা, বাঁশের রেকাব, বাটী, ঝুড়ি, চুবড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত, মাছ ধরা, লবণ ও কর্পূর পরিষ্কার করা প্রভৃতি কোন না কোন কাযের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন কোরে থাকে। চাষাদের এই সকল বিষয় বৈজ্ঞানিক মতে শিক্ষা দিবার জন্য নানাবিধ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। অতি নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে সাধারণ বা জাতীয় শিক্ষা শেষ কোরে, চাষ বাস সম্বন্ধে মোটামুটি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া স্থানবিশেষের উপযোগী ফসলবিশেষ সম্বন্ধে অনেক কথা শিখান হয়ে থাকে। ইহা অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে কৃষিকার্য্য, জরিপ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবৃত্তান্ত, ঋতুবিজ্ঞান প্রভৃতি বিস্তারিত শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। ইহা ব্যতীত রেশমের চাষ, বনরক্ষ রক্ষা, পশুচিকিৎসা প্রভৃতিও শিখান হয়। কেবল বই পড়া নয়—কি করে চাষ করতে হয়, ফসলের উপযোগী জমি চেনা, সারপরীক্ষা, বীজচেনা, ফসলের ব্যাধি ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতি হাতে হাতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইসকল বিদ্যালয় কেবল কৃষক পরিবারদিগের শিক্ষার জন্য। যারা কৃষিশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে চায়, তারা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে, কৃষিকলেজে প্রবেশাধিকার পায়। জাপানে এইরূপ দুইটি কৃষিকলেজ আছে। এই কলেজে কৃষিশিক্ষার উপযোগী বিষয় সকল দুই বৎসর অধ্যয়নের পর প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় ও চার বৎসর ধোরে এই শিক্ষা চলতে থাকে। ইহাতে কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং (Engineering) ও বনরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ কোরতে হয়। এই কলেজের সঙ্গে প্রায় ৪৫ হাজার বিঘা উর্ব্বর ক্ষেত্র, বিস্তৃত বনভূমি, উদ্ভিদুদ্যান, মিউজিয়াম (Museum), পশুচিকিৎসা শিক্ষার জন্যে অশ্বগবাদি জন্তর চিকিৎসালয় সংযুক্ত আছে। ছাত্রেরা এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা লাভ কোরে, কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে থাকে।

এই ত গেল কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য অনেকগুলি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র আছে। ইহার মধ্যে একটী প্রধান, নয় দশটি শাখাক্ষেত্র ও প্রায় চল্লিশটি প্রাদেশিক পরীক্ষাক্ষেত্র রাজা স্থাপন করেছেন,

এছাড়া আরও শতাধিক ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম্য সমিতির দ্বারা স্থাপিত। এই সকল আদর্শ ক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, বহুদর্শী বিশেষজ্ঞেরা বিশেষ পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। কোন বিভাগে বীজ ও চারার উৎকর্ষ সাধন, কোন বিভাগে ভূমির রাসায়নিক উপাদান ও কিরূপ সারে তার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হতে পারে, কোন প্রদেশে ফসলের কত প্রকার পীড়া আছে ও তাহার কারণ নির্দ্ধারণ, কোথাও উদ্ভিদের অনিষ্টকর কত প্রকার কীট পতঙ্গ আছে, তাহাদের নিবারণোপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা হচ্চে। এই সকল পরীক্ষা লব্ধ জ্ঞান, কার্য্যে পরিণত করবার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা এই সকলের উপযোগিতা ও নবাবিষ্কৃত উপায়ে শস্যাদির কিরূপ উন্নতি হয়েছে, কৃষকদিগের সুবিধার জন্য আদর্শক্ষেত্রে তাহা কার্য্যতঃ দেখিয়ে থাকেন। বারমাস এই সকল পরীক্ষাক্ষেত্র জিজ্ঞাসুদের জন্য উন্মুক্ত। ইহা ছাড়া কৃষিনিপুণ শিক্ষকেরা মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ফসলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে বেড়ান ও কৃষকের ঘরে ঘরে ফসল সার প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা ও পরামর্শ দিয়ে আসেন। এই প্রকার প্রায় তিনশত শিক্ষক গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্চেন। চাষের উপযোগী সার ভাল কি মন্দ, আদর্শ ক্ষেত্রে পরীক্ষা হলে, তবে বাজারে বিক্রয় হতে পারে সুতরাং প্রবঞ্চক মহাজনের কাছে কৃষকদের ঠক্‌বার ভয় নেই।

সাধারণ কৃষিকার্য্য ছাড়া রেশম চাষের উন্নতি বিষয়ে জাপান বিশেষ চেষ্টা কোরছে। কেবল রেশম চাষ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ বিদ্যালয় আছে। রাজা যে দুটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাহাতে উন্নত বৈজ্ঞানিক মতে রেশম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। কি উপায়ে গুটি ভাল হয়, অধিক ও উৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন হয়, কি করলে ডিমের অবনতি না হয়, রেশমের ব্যাধি নিবারণ, চাষাদের উৎকৃষ্ট ডিম যোগান, তাদের এ সম্বন্ধে শিক্ষা পরামর্শ ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এই বিদ্যালয়ের কায। ইহা ব্যতীত প্রায় শতাধিক শিক্ষালয়ে, কি করে রেশম চাষ কোর্‌তে হয়, চাষারা হাতে হাতে শিক্ষা করে।

নীল ও তামাকের উন্নতি সম্বন্ধে আজ কাল জাপানে খুব নজর পড়েছে। এক জন জাপানী রাসায়নিক, কোন জর্ম্মান অধ্যাপকের ল্যাবরেটরিতে (Laboratory) পরীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে, নূতন উপায়ে নীলরং প্রস্তুত আবিষ্কার কোরে নীলের চাষে বিষম যুগান্তর উপস্থিত করেছেন। কৃষিকর্ম্মের সঙ্গে অশ্বগবাদি পশুপালন কৃষকদের একটী প্রধান কায। সংক্রামক রোগে

মড়ক উপস্থিত হলে ইহাদের অভাবে সমাজে মহাক্ষতি হযে থাকে। এই সকল রোগ নিবারণের জন্য জাপানে বিশেষ ল্যাবরেটরি (Laboratory) আছে। এখানে যে সকল পণ্ডিত সংক্রামক রোগের কারণ নির্দ্ধারণে নিযুক্ত, তাঁরা ইউরোপের বিখ্যাত অধ্যাপকদিগের শিষ্য। ইঁহাদের মধ্যে বীজাণুশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক কিতাসাতো (Kitasato) একজন। ইনি প্লেগ রোগের বীজাণু প্রথম আবিষ্কার করেন এবং ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধির ঔষধ (Anti-toxin) ও বাহির করেছেন।

কৃষিকর্ম্ম ছাড়া মৎস্যজীবীর ব্যবসায়ে জাপানে যত লোক নিযুক্ত আছে, এরূপ আর কোনও ব্যবসায়ে নাই। মৎস্য ব্যবসাযের কথা পূর্ব্বে কিছু বলেছি। জাপানীর প্রধান আহার ভাত আর মাছ, তরি তরকারি অতি সামান্য, ঘি দুধের সম্পর্ক মাত্র নাই। কাযেই যাহাতে মাছের অসদ্ভাব না হয়, তাব জন্য রাজার বিশেষ দৃষ্টি। মাছের চাষ শিক্ষা দিবার জন্য, বিশেষ বিদ্যালয় আছে। ইহাতে কিসে মাছের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, মাছের উৎকর্ষ, মাছ হতে নানাবিধ সার প্রস্তুত, লোনা মাছ তৈয়ারি, মাছধরার উপযুক্ত জাল, নৌকাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষা হয় আর জেলেদেব এবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হযে থাকে। জাপানে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক ও চার লক্ষ জেলে বোট, মাছের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

জাপানী জাতটায় দুটি ভাব স্বাভাবিক প্রবল; একটী সৌন্দর্য্যস্পৃহা অপরটী স্বদেশপ্রেম। জাপানীর শরীর, পরিধেয়, বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধবর্জ্জিত। জাপানে কুটীরবাসীর ঘরটীও সুন্দর পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। জাপানী হরিৎপত্রসুশোভিত গাছপালা দেখ্‌লে বিভোর হয়, ফুটন্ত ফুল দেখে উন্মত্ত হয। যখন লাল লাল চেরি ফুল ফুট্‌তে থাকে, জাপানী মেয়ে মদ্দে বাড়িঘর ছেড়ে, দল বেঁধে গাছতলায় ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্রমল্লিকে প্রস্ফুটিত হলে জাপানে মহোৎসব পড়ে যায়। জাপানীর দেবমন্দিব শিল্পচাতুর্য্যের অমরাবতী। জাপানের শ্মশানভূমি মর্ত্ত্যে নন্দনকানন। আর জাপানীর স্বদেশপ্রেমের কি তুলনা আছে? দেশের জন্য জাপানীর অদেয় কিছুই নাই। এসম্বন্ধে সম্রাট্‌ থেকে অতি দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত একপ্রাণ, একমন। এই সৌন্দর্য্যের জন্য আত্মহারা ভাব এই দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগ জাপান কার কাছে শিখ্‌লে? জাপানের বনভূমিই এই জাতীয় প্রকৃতির গঠনের বিশেষ সহায। সৌন্দর্য্য ও স্বাধীনতা চিরকালই নিবিড় কাননে বিরাজ

কোরে থাকেন। এখনো সমস্ত দেশের অর্দ্ধেকেরও অধিক অরণ্যে পরিপূর্ণ; এই বনবৃক্ষ রক্ষার জন্য রাজা বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। জাপানে সমস্ত কাটের বাড়ি সুতরাং কাটের দরকার বেশী, তা ছাড়া রাঁধ্‌বার কয়লা, কল কারখানা, রেলপথ, টেলিগ্রাফের খুঁটি প্রভৃতিতে কাটের কাজ দিন দিন বাড়্‌চে। পাছে অনিয়মে বন কাট্‌লে, গাছের অভাব হয়, সেই জন্য বনবিভাগের হাতে ইহার ভার ন্যস্ত হয়েছে। শিক্ষিত লোকে, গাছ পোতা, গাছ কাটা, গাছ রক্ষার তত্ত্বাবধারণ করেন; আর এই সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য রাজা তিনটি কলেজ ও পাঁচটি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষালয় স্থাপন করে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কৃষিকর্ম্ম রেশম ও মাছের চাষ এবং বন রক্ষা সমস্তই পাশ্চাত্য উন্নতমতে নানাবিধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে জাপান লোকেদের শিক্ষা দিচ্চে; শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শস্থানীয়।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন বিলাতী কলকারখানা দেশে প্রবেশ করে নাই, তখন জাপানীরা রেশম, রেশমী কাপড, সুতির কাপড়, পোর্সলেন (Porcelain) বার্ণিস কাজ (Lacquer work) কাগজ, অস্ত্রাদি, নানাবিধ খোদাই কাজ, কাট, বাঁশ ও চামড়ার জিনিষ সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত কোরে দেশবিদেশে অল্পাধিক ব্যবসা চালাত। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ লাগার দিন থেকে, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়েছে। ঘরে ঘরে আগে যে সকল শিল্প কাষ চল্‌ত, অল্পায়াসে সহস্র সহস্র লোকের অন্নসংস্থান হত, তা পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতায় লোপ হবার সূত্রপাত হয়েছে। এখন বাধ্য হয়ে বড় বড় কল কারখানা স্থাপন কোরে, অনেক নূতন শিল্পকাষ জাপানীরা আরম্ভ কোরেছে। রেশম ও সুতির কাপড় এখন কলেই বোনা হয়। ষ্টিমার ও জাহাজ নির্ম্মাণ, লোহা ও সিমেণ্টের কাষ, কাচ, কাগজ, চামড়ার দ্রব্য, দেশালাই, রবারের জিনিষ, জমির সার, চিনি, চুরুট প্রভৃতি প্রস্তুত আধুনিক কলের সাহায্যে হচ্চে। যদিও এই সকলের এক একটী কারখানা বৃহৎ ব্যাপার, কোটি কোটি অর্থব্যয়ে প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু ইহার সংখ্যা এখনও অল্প। আমি মনে করেছিলাম, জাপানে কেবল আকাশস্পর্শী কলের চিমনি দেখ্‌ব। কিন্তু এখনো জাপানের নীল আকাশে সুদূরব্যাপী ধূমচিহ্ন দেখা যায় না। জাপান এখনো ঘরে ঘরে সুকৌশলনির্ম্মিত পরিপাটি হাতকলের সাহায্যে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত কোর্‌ছে। জাপানের যে কোন বাজারে যাও, দেখ্‌বে

ঠিক ইউরোপীয় প্রস্তুত জিনিষ কিন্তু মূল্য অনেক অল্প। কারণ, জাপানী গৃহস্থ পরিবার অবকাশ কালে নিজ হস্তে উৎকৃষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল দ্রব্য তৈয়ারি করে। তবে জাপানী এসম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। পুরাতন চরকা তাঁত প্রভৃতির পরিবর্ত্তে নবাবিষ্কৃত আধুনিক চরকা ও তাঁত (Hand loom) অবলম্বন কোরেছে। এখনও ঘরে ঘরে মোটা কাপড়, মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, কাপড় রং, চিনে মাটির বাসন, বার্ণিস, সাবান তৈয়ারী প্রভৃতি কায কোরে জাপানী স্ত্রীলোকেরা অর্থোপার্জ্জন কোরে থাকে। জাপানে ইঞ্জিনে চালান কারখানা অপেক্ষা হাতে চালান কল কারখানার সংখ্যা অনেক অধিক। রেশমের কায,সুতকাটা,ষ্টিমার ও জাহাজ নির্ম্মাণ, যন্ত্র তৈয়ারী, সিমেণ্ট, কাগজ, চিনি পরিষ্কার, মদ চোলাই, বই, কাগজ ছাপা, ঢালাই ও গড়ন প্রভৃতির কারখানা ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে। বাকি প্রায় সমস্ত শিল্পকর্ম্ম হাতকলে সম্পন্ন হয়।

জাপান গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত শিল্পকায ইউরোপীয় ধরণে শিক্ষা দিবার জন্য টকিও ও কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করেছেন। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাষ্পীয় কল, জাহাজ, সেতু, রেলপথ, পয়ঃপ্রণালী, অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত, খনি হতে ধাতু বহিষ্করণ প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত রাজা তিনটি উচ্চ শ্রেণীর শিল্পবিদ্যালয় (Polytechnic) প্রতিষ্ঠা কোরেছেন। প্রত্যেক উচ্চ শ্রেণীর শিল্পবিদ্যালয়ে ছয়টি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগের শিক্ষার বিষয়, রেশমি, সুতি, ও পশমি বস্ত্রাদি কিরূপে বুনতে হয় ও তাহাদের রং করবার প্রণালী, উদ্ভিদ্, ধাতু ও পাথরে কয়লা হতে কিরূপে নানাবিধ রং প্রস্তুত করা যায় ; রং করবার আগে সুত ও কাপড় কি করে শাদা (Bleaching) করা যায় ইত্যাদি ; দ্বিতীয় বিভাগে পোরসিলেন (Porcelain) এনামেল (Enamel) চিনে মাটির দ্রব্য প্রস্তুত, নানাবিধ মাটি চেনা, ছাঁচ ও গড়ন তৈয়ারি করা প্রভৃতি; তৃতীয় বিভাগের শিক্ষা ফলিত রসায়ন, নানাবিধ শিল্পকাযে যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি আবশ্যক সেই সকলের প্রস্তুত প্রণালী, খনিজ ধাতু আবিষ্কার ও নিখাদ করা প্রভৃতি ; চতুর্থ বিভাগে ইঞ্জিন, যন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় ; পঞ্চম বিভাগে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ও যন্ত্র, টেলিগ্রাফ ও তৎসম্বন্ধীয় কল প্রস্তুত ও চালান ; ষষ্ঠ বিভাগে শিল্প দ্রব্যাদির নক্সা প্রস্তুত, ছাঁচ তৈয়ারি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিভাগে তিন

বৎসর ধরে শিক্ষা পেতে হয়। ইহা শেষ হলে ছাত্রদিগকে কোন কারখানায় বা কোন বিশেষ পারদর্শী কারিগরের অধীনে দুই বৎসর হাতে হাতে কায শিখ্‌তে হয়। এই তিনটী বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের খাস। ইহা ছাড়া অনেক শিল্পবিদ্যালয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডদ্বারা স্থাপিত। এই সকল বিদ্যালয়ে মধ্য-শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয়। নীতি, সাহিত্য, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিত্র-বিদ্যা, ব্যায়াম প্রভৃতির সহিত ছাত্রের উপযোগিতা অনুযায়ী বাষ্পীয় ইঞ্জিন, কল, জাহাজ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ, খনি হতে ধাতুবহিষ্করণ (Mining) কাপড় বোনা, রং করা, নানাবিধ কাটের কায, ঢালাই, ধাতুর গঠন, চিনে মাটির (Porcelain) দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রভৃতি শিখান হয়। এই সকল বিদ্যালয় ব্যতীত আর এক নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, তাহাকে শিক্ষানবিশি (Apprentice) বিদ্যালয় বলে। ইহাতে নীতি, অঙ্ক, জ্যামিতি, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, চিত্রবিদ্যা ছাড়া এক বা অধিক শিল্পকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া আর কতকগুলি শিল্পবিদ্যালয়ে, দশবৎসরের অধিকবয়স্ক বালক বালিকারা জাতীয় শিক্ষা শেষ কোরে, মোটামুটি কৃষি, বাণিজ্য, মৎস্যজীবীর ব্যবসায় বা কোন বিশেষ শিল্প শিক্ষা লাভ করে। জাপানে এইরূপ এক সহ-স্রেরও অধিক বিদ্যালয়ে শিল্প সম্বন্ধে অল্পাধিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং জাপানে গ্রামে গ্রামে শিল্পবিদ্যালয় আছে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত নূতন শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিবার উপযোগী শিক্ষক যতদিন জাপান সুশিক্ষিত কোর্‌তে না পেরেছিল, ততদিন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে কার্য্যোদ্ধার করেছিল। যখন এই সম্বন্ধে বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করে জাপান মানুষ তৈয়ারি করতে লাগ্‌ল, তখন ক্রমে বিদেশী শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস হোতে লাগ্‌ল। এখন এরূপ শিক্ষকতা কার্য্যে একজনও বিদেশী শিক্ষক নাই।

জাপানে প্রস্তুত নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য বহু পরিমাণে এখন দেশ বিদেশে রপ্তানি হচ্চে। ১৮৬৮ সালে দুই কোটী টাকার দ্রব্য জাপান বিদেশে পাঠিয়েছিল। ১৯০১ সালে জাপানের বহির্বাণিজ্যের মূল্য চল্লিশ কোটি টাকা। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্যও বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা, প্রাদেশিক বা গ্রাম্য সমিতি এইরূপ প্রায় চল্লিশটি বিদ্যালয় স্থাপন কোরে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছেন। দেশ বিদেশে বাণিজ্য বিস্তার ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নানাবিধ বণিক্‌সমিতি

স্থাপিত হয়েছে। বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে, জাহাজ নির্ম্মাণ ও উপযোগী নাবিকের আবশ্যকতা বুঝে যাতে শিক্ষিত নাবিক প্রস্তুত হয়, এইজন্য জাপানে উচ্চশ্রেণীর নৌবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নৌবিদ্যালয়ে জাহাজ নির্ম্মাণ ও চালনাদি বিষয়ে সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই অল্পকাল মধ্যে জাপান কিরূপ সুদক্ষ নাবিক দল শিক্ষিত কোরেছে, তাহা বর্ত্তমান রুষ জাপান যুদ্ধে প্রমাণিত।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের অবস্থা কি ছিল আর আজ জাপান কি হয়েছে! যেদিন বিজয়দীপ্ত রোষকষায়িতলোচন ইউরোপের বিকট ভ্রুকুটিভয়ে, পরাজিত, কম্পিত জাপান অবনতমস্তকে, দ্বিসহস্র বৎসর বিজাতীয় সংস্রব রহিত, স্বদেশের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করেছিল, পরস্বাপহারক ইউরোপীয় কুটিল রাজনীতির চক্রে পড়ে পিতৃপুরুষের সমাধিক্ষেত্র ও দেব-মূর্ত্তিপরিশোভিত পবিত্র মাতৃভূমির চিরাগত স্বাধীনতার বিসর্জ্জন নিরাশ চক্ষে দেখ্‌ছিল, সেই একদিন—আর আজ ইউরোপের সম্রাড়্‌গণী, অর্দ্ধ পৃথিবীর রাজ্যেশ্বর, অগণ্য বাহিনীপতি অজেয় রুষের মহাতেজ খর্ব্ব কোরে, বালসৌর-করচিহ্নিত জাপানের বিজয়পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান! জ্ঞান বিজ্ঞানের রঙ্গভূমি সভ্যতাকেন্দ্র মহাবল ইউরোপ আজ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নগণ্য আসিয়ার নিকট হৃতবল, হতমান! কালচক্রের কি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ভবিষ্যতে কি হবে কে জানে!

চিড়িয়াতে মায বাজ লড়ায়ুঁ।
যব গুরু গোবিন্দ নাম শুনায়ুঁ।

আজ ক্ষুদ্রপ্রাণ চিড়িয়া বাজের প্রতিদ্বন্দ্বী; কিসে এই অসম্ভব সম্ভব হল? জাপান উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে, বিদ্যাশক্তির আরাধনা কর—সকল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হও—জাপানের সর্ব্বত্র কেবল এক প্রতিধ্বনি—শিক্ষা—শিক্ষা—শিক্ষা।

সমাপ্ত।

শঙ্করপ্রসঙ্গ।

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।)

ভারতীয় ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাসে শঙ্করাচার্য্য একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। তাঁহার যশোরবি যে কখনও অস্তমিত হইবে, তাহা বোধ হয় না। সভ্যতার বিস্তারের সহিত ভারতেতর দেশেও তাঁহার আদর দেখা যায়। তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ভগবান্ শিবাবতার জগদ্‌গুরু বলিয়া পূজা করেন। অন্যান্য সাধারণে তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকেন। বেদান্তপ্রতিপাদ্যজ্ঞানপিপাসুগণের নিকটে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। তৎপরভবিক অনেক মহাত্মাই তাঁহার মতের সমর্থন বা প্রতিবাদ করিয়াই চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। সাধারণের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। যাহা হউক, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ যেমন চির আলোচ্য বিষয়, তাঁহার আবির্ভাব-কাল, তাঁহার জীবন, ও তাঁহার কীর্ত্তিকলাপও আজ তদ্রূপ, প্রাচ্য প্রতীচ্য সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি দক্ষিণদেশস্থ কতিপয় তীর্থভ্রমণোপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা গেল। অতীত ও বর্ত্তমানে তাঁহার স্বদেশীয়গণের নিকট তিনি কিরূপ প্রতিপন্ন, এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্তগণের তদ্দেশে এখন কিরূপ অবস্থা, তাহাও কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া গেল। ভ্রমণবৃত্তান্ত উপলক্ষে কতিপয় তীর্থবিবরণ সহ পাঠকবৃন্দকে আজ তাহার কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিব।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণের ন্যায় দক্ষিণদেশভ্রমণ সহজসাধ্য নহে। দক্ষিণ দেশের ভাষাগুলি আর্য্যাবর্ত্তের ভাষাসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তেলেগু, তামিল, কানারিজ, মলয়ালম্ প্রভৃতি ভাষাই ও দেশে প্রচলিত। ইহাদের একটী শব্দও বুঝা যায় না। হিন্দুস্থানী ওদেশের লোকেরা জানে না। ইংরাজী আজ কাল প্রায় সার্ব্বজনীন ভাষা হইয়া উঠিলেও তাহা একটু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত সুতরাং ভাষার বিভিন্নতা হেতু দাক্ষিণাত্যবাসী সাধারণ লোকের সহিত মনোভাব বিনিময় আমাদের পক্ষে বড়ই অসুবিধাজনক। এতদ্ব্যতীত ওদেশের পরিচয় আমাদের সাধারণতঃ তত নাই। সুতরাং তাহাদের সহানুভূতি আমরা অতি অল্পই

আশা করিয়া থাকি। অধিকন্তু শুনিয়াছিলাম, তথায় জাতিভেদ বড়ই প্রবল। এতদ্দেশবাসী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেতরগণের প্রতি তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের বড়ই শ্রদ্ধার অভাব। সুতরাং যাত্রার পূর্ব্বে যথাসাধ্য দক্ষিণ দেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহে চেষ্টা করি। বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে যথাসম্ভব দক্ষিণদেশস্থ প্রধান প্রধান স্থান সমূহের পরিচয় লাভ করিতে লাগিলাম, পরন্তু বিশেষ বিবরণ বড় বেশী সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কেবল তীর্থ ভ্রমণ উদ্দেশ্য হইলে এত চিন্তার বিষয় হইত না। শঙ্করের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি সংগ্রহ উদ্দেশ্য থাকায়, সাধারণের সহিত মেশামেশীর বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া চিন্তিত হইলাম।

এদিকে তখন জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগ; বিলক্ষণ গরম পড়িয়াছে—চতুর্দ্দিকে প্লেগের প্রকোপ দেখিয়াও চিন্তা হইতেছিল। জানা ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও গুরুভ্রাতাগণ ভারতের নানা স্থানে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে অবস্থিতি করেন, সুতরাং বন্ধুবর স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকট যাইলাম। তাঁহার নিকট উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায়, তিনি আমায় অনেক সন্ধান দিলেন, অধিকন্তু, মাদ্রাজে তাঁহাদের যে মঠ আছে, তাহার অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উপর, স্বামী সারদানন্দের দ্বারা একটী পরিচায়ক পত্রও সংগ্রহ করিয়া দিলেন। স্বামী সারদানন্দের সহিত আমার পরিচয় ছিল না, তথাপি তিনি যে ভাবে আমার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য পত্রখানি লিখিয়া দিলেন, তাহা নিতান্ত বন্ধুত্ব থাকিলেই আশা করা যায়। একটী অপরিচিতের জন্য এরূপ লেখা দেখিয়া তাঁহার প্রতি স্বতঃই আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। বলিতে কি, তাঁহার এই পত্রের দ্বারা আমার বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল।

১৯০৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করি। কোন সাংসারিক কার্য্য বশতঃ পথে একবার মেদিনীপুর যাইতে হইয়াছিল। এই সময়ে এখানে একটী প্রদর্শনী হইতেছিল। ঘটনাচক্রে সেটীও আমার দেখা হইল। দেখিলাম, কয়েকটী শিক্ষিত যুবক চাকরীর দিকে মনোযোগ না দিয়া দেশীয় শিল্প প্রভৃতির দিকে মন দিতেছেন। একটী গ্রাজুয়েট, তোলকের (Lever) সাহায্যে এককালে একব্যক্তির দ্বারা নয়টী ঢেঁকির কার্য্য চালাইতে সক্ষম, এমন একটী ঢেঁকী কলের উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটী কর্ম্মকার একটী ধানঝাড়া কলের আবিষ্কার করিয়াছেন, একটী তন্তুবায় একটি উন্নত তাঁতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। একটী ভদ্র সন্তান একটী ছোট ছাপাকল

নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের অনেক প্রকার দ্রব্য সমাবেশ করা হইয়াছিল। মাদুর, খেলনা, বাসন, কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ স্থানীয় শ্রমজাত দ্রব্য সমুদায় দেখিবার যোগ্য। যাহা হউক ইহাতে স্থানীয় সমুদায় ভদ্রমণ্ডলী সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহর কালে মেদিনীপুর হইতে একটী গাড়ী খড়্গপুর অভিমুখে আইসে। আমরা একদিন পরে সেই গাড়ী সাহায্যে খড়্গপুরে আসিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা পরে, কলিকাতা হইতে পুরী প্যাসেঞ্জার গাড়ীটি আসিল, আমরা সেই গাড়িতে চড়িয়া পুরীধামাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে থাকিতে হইবে ভাবিয়া খড়্গপুরেই কিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহ করিলাম। এখানে দেখিলাম, মিষ্টান্ন, পুরী, পাঁউরুটী ও ফল প্রভৃতি পাওয়া যায়। মিষ্টান্ন তত ভাল ছিল না সুতরাং সমুদয়ই কিছু কিছু সংগ্রহ করিলাম। এই ট্রেনে অনেকগুলি গাড়ী ছিল, কিন্তু পশ্চিমের যাত্রী এতই প্রচুর হইল যে, কয়েক খানি নূতন গাড়ী সংযুক্ত করিয়াও স্থান সংকুলান হইল না। আমাদের গাড়ীতেও খুব ভিড় হইল। আমরা রাত্রে শুইবার আশায় উপরে বাঙ্কের (Bunk) উপর শীঘ্রই বিছানাটি পাতিয়া স্থান অধিকার করিয়া রাখিলাম।

খড়্গপুরটী বেশ একটী উচ্চ সমতল ভূমির উপরে। ষ্টেসনের আশপাশে অনেকদূর পর্য্যন্ত রেল কর্ম্মচারিগণের বসতি। রেল কর্ত্তৃপক্ষ যে ঘরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ব্যবস্থা বেশসুন্দর, প্রায় সমস্ত বাটীরই চতুঃপার্শ্বে কিয়ৎপরিমাণে অনাবৃত ভূমি আছে। কুলীদিগের ঘরগুলিও বেশ সুন্দর ও শ্রেণীবদ্ধ। অনুসন্ধানে যতদূর জানিলাম, এ স্থানের স্বাস্থ্যও বেশ ভাল। ষ্টেশন হইতে কিয়দ্দূরে আসিতে আসিতে জঙ্গল আরম্ভ হইল। এ জঙ্গলে বড় বড় গাছ নাই, বিরলসন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে জঙ্গলটী পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষলতাদিসমাকীর্ণ তীরভূমি বা দুর্ব্বাদলমণ্ডিত প্রান্তর-মধ্যগত নদীর বিস্তীর্ণ শুষ্ক বালুকাময় বক্ষদেশ তত্তৎপ্রদেশের বিচিত্রতা সাধন করিতেছে। এসব নদীতে প্রায়ই জল নাই, কোন এক ধারে অগভীর ক্ষুদ্রকায় প্রবাহ মাত্র বর্ত্তমান। কোথাও বা ফাল-কৃষ্ট ভূমির প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। কোথাও বা দূরস্থ গ্রামসমূহ স্বদেশের কথা স্মরণপথে আনিয়া দিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যাসমাগমে প্রকৃতি তমসাচ্ছন্ন হওয়াতে আমাদের দৃশ্যদর্শনপিপাসা অন্তর্হিত হইল, আমরা জলযোগ করিয়া বাঙ্কের বিছানায় শয়ন করিলাম। টাইম্‌টেব্‌লটি পড়িতে পড়িতে নিদ্রার আবেশ

আসিল, আমরাও পরমানন্দে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। মধ্যে একবার টিকিট কলেক্টারের আগমনে আমাদের একটু আরাম ভঙ্গ হইয়াছিল।

রাত্রি প্রায় ৪টার সময় আমাদের গাড়ী পুরী ষ্টেশনে আসিল, তখন বেশ অন্ধকার। আমরা অবতরণ করিয়া একটী কুলীসাহায্যে আমাদের জিনিষ পত্র লইয়া বাহিরে আসিলাম। এখানকার ষ্টেশনটী একটু অন্যরূপ। সাধারণতঃ সব ষ্টেশনের ঘরগুলির সম্মুখে প্ল্যাটফরমের ধারে গাড়ী লাগে, এখানে কিন্তু প্ল্যাটফরমের শীর্ষপ্রান্তে এড়ো এড়ি ভাবে এক লাইনে টিকিট ও তার ঘর প্রভৃতি অবস্থাপিত। যাহা হউক ফটক পার হইয়া দেখি, অন্ধকারে ৪।৫ খানি ঘোড়ার গাড়ীর ও ২০।২৫ খানি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান হাতে একটী একটী লণ্ঠন লইয়া যাত্রী সংগ্রহে ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। লণ্ঠন গুলিতে ছোট ছোট ৪খানি কাচের মধ্যে একটী ছোট টিনের ল্যাম্প, কেরোসিন তৈলের ধূমে আলোক রক্তাভ ও ক্ষীণপ্রভ। ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান গুলি ১॥০। ২টাকা ভাড়া চাহিল, গরুর গাড়ীব গাড়োযান গুলি ॥০ আনা ॥৶০ আনা চাহিল ; আমরা ইতস্ততঃ করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া আর ২।৩টী গরুর গাড়ীর গাড়োযানকে জিজ্ঞাসা করায় একজন।০ আনা মাত্র প্রার্থনা করায় আমরা তাহার গাড়ীতেই চড়িয়া বসিলাম। ঘোড়ার গাড়ীগুলি প্রায় কলিকাতার ঘোড়ার গাড়ীর মত। গরুর গাড়ী গুলি বেশ ছাউনি করা ও বেশ বড়। প্রায় একটী একটী গাড়ীতে দুইটী করিয়া লোক আছে। প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পরেই আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে আসিয়া পহুঁছিলাম। এখানে আমাদের একটী আত্মীয়ের বাটীতে প্রায় ১৬ দিবস অবস্থিতি করিলাম।

এখানে দেখিবার বিষয় অনেক, আমরা একে একে সব দেখিতে লাগিলাম। প্রায় নিত্যই সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতাম। চক্রবালস্পর্শী সমুদ্রের অপার শোভা, অবিরাম প্রবহমান সমুদ্রতটের নির্ম্মল বায়ু, অগাধ বালুকারাশি প্রাণে যে কত ভাবের উদয় করিয়া দিত, তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাতে ধীবরগণ সমুদ্রে মৎস্য ধরিত, সেই তরঙ্গের মধ্যে তাহারা যেরূপে তাহাদের অর্দ্ধ মাইল পরিমিত দীর্ঘ জাল নৌকাসাহায্যে বহুদূরে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া ৫।৭ জনে মিলিয়া তীরে টানিতে আরম্ভ করিত, তাহা আমাদের চক্ষে বড়ই নুতন বলিয়া প্রতীত হইত। সমুদ্রগর্ভ হইতে আনীত দ্রব্য সমুদায় আরও কৌতূহলজনক। কতপ্রকার মৎস্য ও ক্ষুদ্র জলচর প্রাণী দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এখানকার

সমুদ্রতীর পূর্ব্বোত্তর ও দক্ষিণপশ্চিমদিক্‌ব্যাপী। দক্ষিণ ভাগে দেশীয়-দিগের স্থান ও মঠ প্রভৃতি অবস্থিত, উত্তর ভাগে সাহেবদিগের অধিকৃত ভূমি। সাহেবগণ এখনও বাটী নির্ম্মাণ করেন নাই, তাঁহারা ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়া উত্তর ভাগের জমি দেশীয় লোকে পাইতেছে না। স্বর্গদ্বারের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে সাহেবদিগের জমির সীমা, জমিটা এখন মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন। দক্ষিণ ভাগটা শঙ্করাচার্য্যের মঠের জমি। শুনিলাম, এই স্বর্গদ্বার হইতেই রাবণ স্বর্গের সিঁড়ী প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ একখণ্ড প্রস্তর জগন্নাথদেবের মন্দির হইতে স্বর্গদ্বারের পথে এক স্থানে খাড়া করা আছে।

এখানে একটী শ্মশান আছে; লোকের বিশ্বাস, এই শ্মশানে স্বয়ং জগন্নাথ দেব চণ্ডাল বেশে মৃতের সংকার করেন, সুতরাং পুরীতে মরিলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ঘটে। শঙ্করাচার্য্য মঠের জমির কিয়দ্দূর হইতে দক্ষিণপশ্চিমদিক্‌-ব্যাপী সমুদ্রতট অত্যন্ত নীচু ও সমতল। পরন্তু উত্তর দিক্‌টা সেরূপ নহে; উহা বেশ উঁচু ও বাসের যোগ্য। উত্তর দিকের জমি মিউনিসিপালিটী ও খাস মহল বাদে বালুখণ্ড নামক ষ্টেটের অধীন। ইহা পূর্ব্বে একটী রাজার ছিল, এখন ইহার অর্দ্ধ অংশ এখানকার স্বনামখ্যাত জমীদার হরিবল্লভবাবু ক্রয় করিয়াছেন। শুনিলাম, সমগ্র অংশ ইঁহাদের হইলে সাধারণের জমি লওয়া পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। কলিকাতার অনেকে আজকাল সমুদ্রতীরে বাটী নির্ম্মাণ করিতেছেন। মঠের বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী অনেক স্থানে সদ্বংশজাত হিন্দু দেখিয়া মৌরস দিতেছেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট খাজনা ও সেলামি মিউনিসিপালিটীর হার অপেক্ষা কম। প্রায় ৮।১০ ঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ হিন্দু সন্তান তীরদেশে পাকা বাড়ী করিয়াছেন। ইহাঁরা যখন ঐ সকল বাটীতে বাস করেন না, তখন ভাড়া দেন। অনেক মান্য গণ্য ধনাঢ্য ব্যক্তি বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য আসিয়া অধিক ভাড়া দিয়াও এগুলিতে বাস করিয়া থাকেন। বাটীগুলি ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত। ঠিক সমুদ্রের উপর বলিয়া বাটীগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, শুনিতে পাই, বাটীগুলি বিশেষ স্বাস্থ্যকরও বটে। মিউনিসিপালিটির জমিতেও ৪।৫ ঘর বাঙ্গালী বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বাটীগুলি খুবই উত্তম। ২।১ জন রাজাও এখানে বাটী নির্ম্মাণ করাইতেছেন। সাহেবদের অংশে রবীন্দ্র বাবু একটী বাটীর জন্য জমি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাহার নির্ম্মাণ

এখন বন্ধ আছে। রেলের কর্তৃপক্ষও বিস্তর জমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকেরই বিশ্বাস, এখানকার জমিতে বাড়ী করিবার জন্য লোকের এত আগ্রহ হইবে যে, শীঘ্রই জমির মূল্য অতিরিক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

শঙ্করাচার্য্যের মঠের জমি সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা কথিত হইয়া থাকে। আরমষ্ট্রং সাহেব যখন কমিশনার ছিলেন, তখন তিনি মঠাধিপগণের চরিত্রে সন্দিহান হন ও গুপ্তচর দ্বারা সকলেরই সততা পরীক্ষা করিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবার সংকল্প করেন। প্রায় সমস্ত মঠাধিপেরই একে একে চরিত্রদোষ,অন্যাযাচার প্রভৃতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। এ সময়ে শঙ্করাচার্য্যের মঠের অতি হীনাবস্থা। কোনও সময়ে শঙ্কর মঠই পুরীতে প্রধান ছিল, মন্দিরের ক্রিয়াকলাপ এই মঠের মতেই সম্পন্ন হইত, বর্ত্তমান ভোগমণ্ডপ শঙ্কর মঠাধিপের অধীন থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য ভোগবর্দ্ধন মঠ নামে কথিত হইত। পরে রামানুজ দিগ্বিজয় উদ্দেশে এই স্থানে আসিয়া নিজমতের প্রতিষ্ঠা করেন, শঙ্কর মঠাধিপের আধিপত্য নষ্ট করিয়া ভোগবর্দ্ধন মঠের লোপ সাধন করেন ও উহা ভোগমণ্ডপ মাত্রে পর্য্যবসিত করেন। শঙ্করমতাবলম্বিগণ সুতরাং মন্দির ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন মঠেই বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে রামানুজীয়গণের প্রতাপ এতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, পুরীধাম রামানুজী মঠে পূর্ণ হইয়া উঠিল, রাজাও এই মতাবলম্বী হইয়া বিস্তর ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। রামানুজ যদিও পুরীধামের শ্রীমন্দিরের পূজাপদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে মানস করিয়া অকৃতকার্য্য হন, যদিও কথিত আছে, তিনি ৺জগন্নাথ দেবের আদেশে হনুমান কর্ত্তৃক নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রিযোগেই কূর্ম্মক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পুরীধাম হইতে বিতাড়িত হন, তথাপি তাঁহার মতের বিস্তার কমিল না। এই সময় হইতে শঙ্কর মঠের অবস্থা যেন ক্রমশঃ হীন হইয়া আসিতেছিল। অধিক কি, আরমষ্ট্রং সাহেবের সময়ে ইহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। সংস্কারাভাবে মঠগৃহ ক্রমে ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অন্যান্য মঠের পরীক্ষা অন্তে, এই বার তৎকালের ক্ষুদ্র শঙ্কর মঠের প্রতি আরমষ্ট্রং সাহেবের দৃষ্টি পড়িল। তদানীন্তন মঠাধিপ শঙ্করাচার্য্যের সাধু, বিদ্বান্ ও যোগী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল, পরন্তু তিনি উদাসীনস্বভাব ও

নির্জ্জনপ্রিয় বলিয়া নিজের বা মঠের প্রতিপত্তির জন্য কোন যত্নই করিতেন না। চরমুখে আরমষ্ট্রং সাহেব শুনিলেন যে, শঙ্করাচার্য্য রাত্রে সমুদ্রতীরে একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে থাকেন। সন্দেহ হইল, হয়ত অন্যান্য মঠাধিপগণের ন্যায় তাঁহারও রমণীসম্বন্ধ আছে। সাহেবের আদেশ মত চরগণ একদিন রাত্রে গৃহপার্শ্বে আগমন করিয়া গৃহমধ্যে রমণীকণ্ঠ শুনিতে পাইল ও তাহা সাহেবকে জানাইল। সাহেব তদবস্থায় উভয়কে ধরিয়া আনিবার আদেশ দেন, চরগণ কিন্তু সমস্ত রাত্র পাহারা দিয়াও স্ত্রীলোকটীকে প্রাতে দেখিতে পাইল না। ২।৪ দিন গত হইল; চরগণকে অকৃতকার্য্য দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব একদিন নিজে রাত্রে আসিলেন ও শঙ্করাচার্য্যকে যেন কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে শুনিলেন। ক্রুদ্ধ সাহেবের আদেশ মতে চরগণ তখনই গৃহদ্বার বলপূর্ব্বক উন্মুক্ত করিল। সাহেব গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, সন্ন্যাসী যোগাসনস্থ, সদ্য সমাধি উত্থিত; চমকিতনেত্রে সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, রমণী কোথায় যাইল? সন্ন্যাসী কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, তিনি সাহেবের নিকট কোন অপরাধ জ্ঞাত-সারে করেন নাই। সাহেব আরও রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন। ২।৩ দিন পরে পুনরায় সাহেব পূর্ব্ববৎ আচরণ করিলেন, সেদিনও সাধুর ঐ অবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন ও ভক্তি-ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতপর কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সাধু তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহাতে সাহেব আরও সন্তুষ্ট হইলেন, ও তাঁহাকেই পুরীধামে একমাত্র সাধু জানিয়া তাঁহার গুণগ্রাহী স্বভাবের পরিচয় স্বরূপ, সরকার বাহাদুরকে লিখিয়া ১০০ একার অর্থাৎ ৩০০ শত বিঘা জমী (মঠকে মধ্যস্থল করিয়া সমুদ্রতীরকে একদিকের ও স্বর্গদ্বারের প্রধান পথকে অন্যদিকের সীমা করিয়া) চিরদিনের জন্য প্রদান করিলেন।

বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শিষ্যের শিষ্য। ইনিও অতি শান্ত বিদ্বান্ ও সরলপ্রকৃতি, শুনিতে পাই, ইনিও একজন প্রকৃত সাধু। ইঁহার নাম মধুসূদন তীর্থ। ইঁহার পরে যিনি গদিতে বসিবেন, তিনি একজন গুজরাটদেশবাসী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী, বয়স ৪০।৪৫ এর উপর। ইনিও বিদ্বান্ ও উত্তমপ্রকৃতি। ইনি একটু একটু ইংরাজী জানেন, ইঁহার নাম জগন্নাথ তীর্থ। ইনি পূর্ব্বে একটী বেশ বড় জমীদার ছিলেন, যথেষ্ট ধনসম্পত্তিও ছিল, এখনও পর্য্যন্ত যথেষ্ট টাকা ব্যাঙ্কে আছে। ইনি এখানে সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বারের পথে

একটী ধর্ম্মশালা করিয়া দিতেছেন। ইচ্ছা আছে, তৎসঙ্গে একটী ভাল লাইব্রেরী স্থাপন করিবেন। আমি দেখিলাম, ভিত্তিপত্তনের ব্যবস্থা হইতেছে। ইনি অতিশয় উদারপ্রকৃতি এবং সাধারণের উপকারের জন্য ইঁহার বিশেষ যত্ন। ইঁহারা উভয়েই আজ কাল পুরীর প্রায় সমস্ত সাধারণের হিতকর কর্ম্মে যোগদান করেন এবং এ জন্য ইঁহাদের খ্যাতিও যথেষ্ট।

এই মঠের ইতিহাস ও আদি শঙ্করের জীবনী সংগ্রহ বিষয়ে উভয়ের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলে উভয়েই আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইঁহাদের নিকট হইতে শঙ্করাচার্য্য ও এই মঠ সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিলাম এবং নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই মঠের ও মঠাধ্যক্ষগণের যে ভাব বুঝিলাম, তাহা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

এই মঠ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত। ইহার নাম গোবর্দ্ধন মঠ। শঙ্করের প্রধান শিষ্য বিষ্ণুভক্ত পদ্মপাদ এই খানে প্রথম মঠাধিপ হন। শুনা যায়, শঙ্করাচার্য্য এখানে জগন্নাথদেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কালাপাহাড় বা রক্তবাহুর অত্যাচারে জগন্নাথদেবকে দক্ষিণ দেশে চিল্কা হ্রদের নিকট একটী স্থানে প্রোথিত করা হয়। বহুদিন পরে তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইলে শঙ্কর ভূগর্ভ হইতে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়া নীলাচলে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে কিরূপ মন্দিরাদি ছিল, এখন তাহার কিছুই জানা যায় না। বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা অনঙ্গ ভীমদেব। প্রায় ৭০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পদ্মপাদ হইতে শিষ্যপরম্পরার নাম ইঁহাদের নিকট পাওয়া যায় কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যথারীতি ইঁহাদের কোন ইতিহাস রক্ষা করা হয় নাই। উড়িয়া অক্ষরে একখানি সংস্কৃত পুস্তক আছে, তাহাতে এই সব সম্বন্ধে অনেক পুরাতন কথা আছে। পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও তাহার দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল না।

এ মঠের সন্ন্যাসিগণের উপাধি বন ও অরণ্য, কিন্তু এখন যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারা তীর্থ। ইহার হেতু ইঁহারা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, প্রায় ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এ মঠের তৎকালীন গুরুর দেহান্ত ঘটে; এবং কোন উপযুক্ত শিষ্য না থাকায় ৺কাশীধাম হইতে এক তীর্থ উপাধিধারী সন্ন্যাসীকে এই মঠের ভার প্রদান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যাদেশবাসিগণের

মধ্যে উপযুক্ত শিষ্য হইবার প্রকৃতির বড়ই অভাব। কতদিন মঠটী যে গুরু-শূন্য ছিল, তাহা ইঁহারা বলিতে পারেন না। বর্ত্তমান যিনি আছেন, ইনিও উড়িষ্যাদেশবাসী নহেন, এবং উড়িষ্যাদেশবাসী কেহ কখন ইহার আধিপত্য পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

শঙ্করের পর রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, পরিশেষে চৈতন্যদেব, যথাক্রমে ৺পুরীধামের ধর্ম্মমতের কর্ণধার হইয়াছিলেন। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের ৺পুরীধামে প্রাধান্যের সময় ছিল, এবং চৈতন্যদেবের মত যে অনেক অংশে শঙ্কর মতের বিরুদ্ধ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যখনই যে মত প্রধান হয়, দেখা যায়, বিরুদ্ধমতের উচ্ছেদ সাধন তাহার প্রতিষ্ঠার একটি অঙ্গ হইয়া পড়ে। চৈতন্যদেবের সময় অত্রত্য রাজাও চৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রধান যে পথে যায়, সাধারণেও সেই পথে যায়। কাজেই চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে এবং দলে দলে অনেকেই উক্তমতাবলম্বী হন। সুতরাং ইঁহাদের দরিদ্র মঠে যে উপযুক্ত শিষ্যের অভাবই হইবে, তাহাই নিশ্চিত। যাহা হউক তদবধি শিষ্যপরম্পরা অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিতেছে। এই মঠ শিষ্য-শূন্য হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তালিকা পাওয়া যায়; তাহা যে তৎকালিক কোন্ গুরুর লিখিত, তাহা বোধ হয় চেষ্টা করিলে জানা যাইতে পারে। ইঁহা-দের এমন কোন লেখা নাই, যাহাতে এমন কি রামানুজ, রামানন্দ, কবীর ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির সময় মঠের কোন দুর্ঘটনা বা পরিবর্ত্তন বেশ জানা যায়। ইঁহাদের প্রদত্ত ইতিহাস যাহা কিছু পাওয়া যাইতেছে, তাহা বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যের গুরু মহারাজের সময়ে উক্ত উড়িয়া অক্ষরে লিখিত পুস্তক ও কতকগুলি জীর্ণ পুস্তকাদি দৃষ্টে সঙ্কলিত। শুনিলাম, ইঁহাদের মুসলমান নবাব, মহারাষ্ট্র রাজা ও উড়িষ্যার রাজাদের প্রদত্ত সনন্দ আছে, অপিচ আরমষ্ট্রং সাহেবের সময়ের ইংরাজরাজের প্রদত্ত সনন্দও আছে।

ইঁহাদের মতে শঙ্করাচার্য্য ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ৮ম শতাব্দীতে শঙ্করের আবির্ভাবের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা ইঁহাদের মতে নৃসিংহ ভারতী নামধারী শঙ্করাচার্য্যের সময়। ইনিও আদি শঙ্করের মত ভারতে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, নেপাল ইতিহাসে দুই শঙ্করাচার্য্যের উল্লেখ দেখা যায় এবং সময় সম্বন্ধেও ইঁহাদের মতের সহিত অনেকটা মিলে। পরন্তু তাই

বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত সময়ের বিরুদ্ধে ইহা কত দূর প্রামাণিক, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমি এ সম্বন্ধে আরও অধিক জিজ্ঞাসু হওয়ায় ইঁহারা আমায় গুজরাটী ভাষায় লিখিত মাধবাচার্য্যকৃত "শঙ্কর-বিজয়" ও "শঙ্করাচার্য্যের সময়" নামক দুই খানি পুস্তকের নাম করিলেন, এবং তাঁহাদের মতের সহিত ঐক্য হয় বলিয়া তাহা হইতে আমাকে অনেক কথা শুনাইলেন। উক্ত পুস্তক দুই খানি একত্র বা পৃথক্‌রূপে কিনিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের সময় নামক পুস্তকখানি, শঙ্করবিজয়ের একটী অংশ বিশেষ। সময় সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আমার উহা পড়িবার বিশেষ আগ্রহ হইল, এবং আমি উক্ত ভাষা শিখিয়া পড়িবার প্রস্তাব করায় ভাবী শঙ্করাচার্য্য আনন্দ সহকারে ঐ পুস্তকখানি আমায় দিলেন ও গুজরাটি ভাষার অক্ষর ও বিভক্তি প্রভৃতি প্রথম শিক্ষনীয় বিষয় গুলি আমার খাতায় স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন। এখানে একটী টোল আছে। সেখানে একজন পণ্ডিত ১৫।১৬ টী ছাত্রকে সংস্কৃত পড়ান। শঙ্করাচার্য্য নিজে ৫।৭ টীকে পড়ান। যাঁহারা পড়েন, তাঁহাদের মধ্যে বেদান্তাদি পড়িবার কেহ নাই। একজন মাত্র ভাগবত পড়েন, অপর সকলে সিদ্ধান্ত বা লঘুকৌমুদী পর্য্যন্ত পড়েন। ইঁহাদের উপযুক্ত ছাত্র পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম। কোন বঙ্গীয় ছাত্র পান না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। যদ্যপি কোন সদ্‌ব্রাহ্মণকুমার পান, তাহা হইলে তাহার সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিয়া বিদ্যাদানে প্রস্তুত আছেন, উপযুক্ত বৈরাগ্যবান্ শিষ্য পাইলে ভবিষ্যতে মঠাধিপত্য দিতেও প্রস্তুত। ইহা সাধারণকে জানাইবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখিলাম।

ইঁহাদের একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা দেখিলাম। সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন ইঁহারা উপলব্ধি করেন। ইঁহাদের বেশ-ভূষার জন্য কোন আগ্রহ নাই। বিলাস অল্প মাত্রাতেও প্রবেশ করে নাই। ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বরও দেখিলাম না। বিলাসিতার মধ্যে একখানি ইজিচেয়ার, বিশ্রাম কালে মধুসূদন স্বামী তাহাতে শুইয়া থাকেন। ইঁহারা খাটের উপর শয়ন করেন। মোট কথা ইঁহাদের আচার ব্যবহার খুব সাদা সিধা, অহংকার অভিমান কিছুই নাই। মতামত সম্বন্ধে খুব উদার, গোঁড়ামীর প্রতি ঝোঁক নাই। পুরাতন পুঁথি প্রায় ৩।৪ শত এখনও আছে। সংস্কার অভাবে মধ্যে মধ্যে অনেক নষ্ট হইয়া গিয়া উক্ত সংখ্যায়

দাঁড়াইয়াছে। জগন্নাথের প্রসাদ ইঁহারা ভোজন করেন, সুতরাং রন্ধন ক্রিয়ার ব্যবস্থা দেখিলাম না। একটি ইংরাজী শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পুরীবাস উপলক্ষে ইঁহাদের মঠের একটি বাটির মধ্যে আছেন। ইনিই এখন মঠের পত্রাদি লেখা ও রাজসংক্রান্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বর্গদ্বার পথ দিয়া সমুদ্রাভিমুখে যাইতে হইলে দক্ষিণ দিকে সমুদ্রতীরে ইঁহাদের স্থান। সমুদ্রের অনতিদূরে পথের ধারে একটি ফটকের থামের উপর একটি সাইনবোর্ড উহার পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। বালুকাময় প্রান্তরে তাল ও ফেণীমনসা গাছের বেড়ার মধ্যে মঠ অবস্থিত। ফটকের ভিতর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাইযাই বামদিকে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও দক্ষিণ দিকে একটী বাগানের ভিতর ২।১ খানি চালা ঘর; ইহাই ইঁহাদের সংস্কৃত পাঠশালা। আর একটু অগ্রসর হইয়া বামদিকে গোশালা ও ২।১টি চালাঘর দেখা যায়, ও তাহার সম্মুখে একটি বালুকাময় ঢালু পথ। সে পথে প্রবেশ করিলে, উক্ত গোশালা দক্ষিণদিকে থাকে আর বামদিকে একটি বেড়ার নিয়ে শাক সব্‌জীর বাগান। আর একটু অগ্রসর হইলে দেখা যায়, বেড়াটির শেষ হইতে একটী প্রাচীর বালুকারাশিকে রক্ষা করিতেছে। সম্মুখে একটী বড় প্রবেশদ্বার। দ্বারে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে সিঁড়ী দিয়া নামিতে নামিতে ঘরের ভিতর আসিতে হয়।

মঠটী এখন মাটীর ভিতর পড়িয়া গিয়াছে, চতুঃপার্শ্বে বালুকা জমিয়া ক্রমশঃ এতই উচ্চ হইয়াছে যে, দূর হইতে উহার মন্দির ও বাসগৃহ দেখা যায় না। এই মঠে যাইতে হইলে অনেকটা যেন গর্ত্তের ভিতরে নামিতে হয়। মঠমধ্যস্থ পুষ্করিণী ইহাপেক্ষা আরও নিম্ন দেশে। মঠটী খুব নিচু বলিয়া বালুকা উড়িয়া নিয়তই ইহাদের পথ ঘাট বুজাইয়া দেয়। এই বালুকা পরিষ্কার করিবার জন্য বৎসরে দুই তিন শত টাকা ব্যয় হয়। মঠটী এইরূপ নিচু বলিয়া দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। মঠের ভিতর একটি শিবলিঙ্গ ও গোপাল বিগ্রহ আছেন। একটি ছোট মন্দির খুব প্রাচীনত্বের পরিচয় দেয়। মঠের প্রধান গৃহটির ছাদ নাই, খোলার চাল। ইহার সম্মুখে একটি ছোট উঠান, উঠানের অপর প্রান্তে গোপালজীর মন্দির ও পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র গৃহ। গোপালজীর মন্দিরের উপর একটি গেরুয়া রংএর ধ্বজা। তাহার পরেই ছাত্রদিগের ঘরের শ্রেণী। ঘরগুলি খড়ের চাল বিশিষ্ট। উঠানের অপর এক ধারে ধান রাখিবার একটি পাকা ঘর। ইহা মঠের প্রধান গৃহের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। এই ঘরের সম্মুখে উঠান, তাহার পর একটী খড়োঘর ও তাহারই

সম্মুখে একটি তুলসীমণ্ডপ আছে। মঠে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে খান রাণি-বার পাকা ছাদবিশিষ্ট ঘরটী দেখা যায়। ইহার পার্শ্ব দিয়া উঠানে যাইতে হয় ও তথা হইতে প্রধান গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। এই পাকা ঘরটীর গায়ে উঠানের দিকে একটা বারাণ্ডার ছাদের মত আছে। তাহারই তলায় শঙ্কর স্বামী ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করান।

উঠানটী পাকা বাঁধান। প্রধানগৃহটীই শঙ্কর স্বামীর বাসগৃহ; ইহার ভিতর গুটি দুই আলমারী ও একটী মাচায় পুস্তক রক্ষিত। এক পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তরের একটী শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি আছে। উহা কাশীস্থ মূর্ত্তির অনুরূপ ও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত। অপর পার্শ্বে শঙ্কর স্বামীর বিশ্রামাগার। ঘরের একটি মাত্র দ্বার সুতরাং অন্ধকার; আলোর জন্য ২।১টি জানালা আছে মাত্র। দ্বারে প্রবেশ করিতে বাম দিকে অষ্টভুজ, পদ্মাকার ১ বিঘত উচ্চ একটি উচ্চাসন আছে। শঙ্কর স্বামী এই স্থানে বসিয়া সন্ধ্যাকালে বাক্যালাপ করেন। শুনিলাম, ইঁহার গুরু এই গৃহে শয়ান অবস্থায় সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। গৃহগুলিকে মাটীর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে। উহার পার্শ্বে একটী শাক সবজীর বাগান। কিছু শাক সবজী হইয়াছে দেখিলাম। এ স্থানটী দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে এখানে মঠ গৃহাদি কিছু ছিল কিন্তু এখন তাহার কিছুই নাই। মঠগৃহ যে স্তরে, তাহার একটী উচ্চস্তরে এই বাগান এবং খুব নিম্নে পুষ্করিণীটি রহিয়াছে, এবং তাহার আর একটু উচ্চস্তরে মঠের গোশালা। ভাবী শঙ্করাচার্য্যের গৃহও ২।১টি চালাঘর। উহারই একটী ঘরে উক্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণটী বাস করেন।

সমুদ্রের দিকে মঠের পার্শ্বে মঠাধিপগণের সমাধিস্থান। এখানে ১৮।১৯টী সমাধিস্তম্ভ দেখা যায়। বুঝা যায়, কোন কালে উহা কেবল শঙ্করাচার্য্যগণের সমাধিস্থান ছিল, এখন এখানে অপরেরও সমাধি দেওয়া হয়। বর্দ্ধমানের রাজা ও ভূতানন্দ স্বামীরও সমাধি এখানে রহিয়াছে। মঠের গোপালজীর মন্দিরে একটি গেরুয়া রঙ্গের নিশান। উহাই দূর হইতে মঠের পরিচায়ক। নচেৎ কতকগুলি তালগাছ ও ফেনিমনসার গাছ দেখিয়া জঙ্গল বলিয়া মনে হয়। মঠের বাহ্য অবস্থা বড় হীন। পুরীতে অন্যান্য যে সব মঠ আছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী রাজপ্রাসাদতুল্য। তাহাদের তুলনায় এইটী নগণ্য পর্ণকুটীর বিশেষ। ইহার বাহ্য অবস্থা এত হীন হইলেও সম্মানে ইহাই সর্ব্বপ্রধান। পুরীবাসী সকলেই বোধ হয় একবাক্যে স্বীকার

করিবেন যে, শঙ্করাচার্য্যের মঠই উৎকল দেশে প্রকৃত সাধুগণের মঠ। পুলি-সের অনেক ডিটেক্‌টিভ মুখেও এ কথা শুনিয়াছি। আমার সঙ্গে ফটো-গ্রাফের সমুদায় ব্যবস্থা ছিল; আমি দুই স্বামীজীর, একটী ছাত্রগণসহ স্বামীজীর ও মঠের দুই খানি ফটো লইলাম। যে কয়দিন আমি পুরী ছিলাম, প্রায় নিত্যই আমি এখানে আসিতাম এবং আদি শঙ্কর সম্বন্ধে যথাসাধ্য সংবাদ সংগ্রহ করিতাম। ইঁহারা মাধবাচার্য্যের শঙ্কর বিজয়কেই প্রামাণিক মনে করেন, আনন্দগিরি কৃত শঙ্কর বিজয়ের উপর ইঁহাদের আস্থা নাই। ইঁহাদের ধারণা,—আনন্দগিরি কৃত একখানি "বৃহদ্দিগ্বিজয়ই" সর্ব্বা-পেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহা উঁহাদের নিকট নাই, কোথাও পাওয়া যায় কি না, তাহাও জানেন না। জগন্নাথ স্বামীর ধারণা,—বৃহ-দ্দিগ্বিজয় খানি কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে। অতঃপর এতৎ সম্বন্ধে উঁহারা আমায় বোম্বাইয়ের "ব্রাহ্মণোৎপত্তি", "কূর্ম্মপুরাণ", পূর্ব্বোক্ত গুজরাটী পুস্তক, দ্বারকা মঠের পূর্ব্বের শঙ্করাচার্য্য কৃত "পরামর্শ" নামক পুস্তক ও কাশীর পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক "শঙ্করাচার্য্যের সময় নির্ণয়" এই কয়েকখানি পুস্তক অনু-সন্ধান করিতে বলিলেন।

ইহাঁরা মধ্যে মধ্যে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্তু অন্যান্য মঠের শঙ্করাচার্য্যদিগের সহিত ইহাঁদের কোন সম্বন্ধ নাই। সকলেই শঙ্করের শিষ্য বলিয়া যে সমবেত হইয়া শঙ্করের উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যে ব্রতী হই-বেন, তাহা ইহাঁদের সংকল্পারূঢ় এখন পর্য্যন্তও হয় নাই। এমন কি, শঙ্করের প্রধান চারি মঠের স্ব স্ব অধিকারের বহির্দ্দেশে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে যাইতে ইহাঁরা সঙ্কুচিত হন। দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য যে "মঠাম্নায়" নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহার সমস্তই ইহাঁদের মতে যথার্থ শঙ্কর বিরচিত নহে। মঠাম্নায় গ্রন্থ ইহাঁদিগের নিকটও আছে, তাহা অতি ক্ষুদ্রকলেবর। মঠা-ম্নায় গ্রন্থে এক স্থানে উল্লেখ আছে, কদাচ কোন শঙ্করাচার্য্য যেন অন্য কোন শঙ্করাচার্য্যের অধিকারে না যান। পরন্তু দ্বারকার খানি অতি বৃহৎ ও উহাতে গোবর্দ্ধন মঠের নামোল্লেখ নাই ইত্যাদি স্মরণ করিয়া জগন্নাথ স্বামী কোন সময়ে গুজরাটে উপস্থিতিকালে দ্বারকার শঙ্করাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং কথোপকথন কালে দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য তদ্দেশে জগ-ন্নাথ স্বামীর আগমন অন্যায় এইরূপ বলিলে, উত্তরে জগন্নাথ স্বামী প্রতি-বাদ করেন। কোন সময়ে দ্বারকার শঙ্করাচার্য্য কলিকাতায় আসিয়া-

ছিলেন, সুতরাং জগন্নাথ স্বামী দ্বারকার স্বামীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, যে হেতু বঙ্গদেশ গোবর্দ্ধন মঠের অধীন। আদি শঙ্কর অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত সমস্ত ভারতবর্ষকে ৪ মঠের অধীন করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবাসী এই চারিটি মঠের নিকট হইতে ধর্ম্মজ্ঞান ও সদাচার প্রভৃতি লাভ করিতে পারে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। মঠ চারিটার নাম, শৃঙ্গেরী, সারদা, গোবর্দ্ধন ও জ্যোতি মঠ বা যোশী মঠ। এইগুলি যথাক্রমে মহীশুর, দ্বারকা, পুরী ও বদরিকাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত ও ইঁহাদের অধীন। ইঁহারা কিন্তু আজ কাল সকলেই স্ব স্ব প্রধান। যাহা হউক দ্বারকা স্বামী উত্তরে গোবর্দ্ধন মঠের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন না, এবং মঠাম্নায় গ্রন্থ তাহার প্রমাণ রূপে প্রদর্শন করাইলেন। পরন্তু জগন্নাথ স্বামী যথার্থই গোবর্দ্ধন মঠের অস্তিত্ব প্রদর্শন করাইলেন। তাহার গুরুপরম্পরা প্রভৃতি সমস্তই জানাইলেন, এবং তাঁহাদের সেই নিজের ক্ষুদ্র মঠাম্নায় গ্রন্থের উল্লেখ করিলেন। দ্বারকা প্রকাশিত মঠাম্নায় গ্রন্থে গোবর্দ্ধন মঠের উল্লেখ না থাকায় তিনি ঐ পুস্তক খানি আদি শঙ্করের রচিত নহে, ইহাও বলিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অতঃপর শঙ্করাচার্য্যদিগের উক্ত অধিকারবোধক শ্লোক যে কখনই তাঁহাদের দেশাদি গমনাগমন পক্ষে নহে, পরন্তু তাঁহাদিগের শিষ্যসংগ্রহ পক্ষে প্রযুক্ত, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন।

যাহা হউক, এক্ষণে ইঁহারা সকলে মিলিয়া নিয়মবদ্ধ হইয়া স্বতঃ পরতঃ উন্নতির উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সকলে কোন এক স্থানে মিলিত হইবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছেন। জগন্নাথ স্বামী নিজ গোবর্দ্ধন মঠের একটি ইতিহাস লিখিতেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শঙ্করাচার্য্যদিগের ন্যায় মঠের ব্যবস্থা ও পুস্তকাদির প্রতি ইঁহার ঔদাসীন্য নাই। ইঁহার মঠের উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি। মধুসূদন স্বামী কিছু অধিক উদাসীনস্বভাব, তথাপি উভয়ের চেষ্টায় মঠের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে। এক্ষণে ইহা নানা কারণে সাধারণ শিক্ষিত মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আমি থাকিতে থাকিতেই কয়েকটি রাজা ও জমীদারকে এই মঠে আসিয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতে দেখিলাম। এই প্রবন্ধে কেবল শঙ্কর সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিবার উদ্দেশ্য বলিয়া কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়া ইহা সমাপ্ত করিলাম। ৺পুরীধামের বিষয় আজ কাল বহুল প্রচারিত সুতরাং ৺পুরীধামের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আর উল্লিখিত হইল না। অতঃপর শঙ্করের জন্ম

ভূমি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী প্রভৃতি স্থান দর্শন মানসে পুরীধামের শঙ্করাচার্য্যের নিকট হইতে শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য্যের উপর একখানি পরিচয়-পত্র লইয়া ২৩ শে ফেব্রুয়ারী মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ।

সাবিত্রী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আসিছেন অশ্বপতি ভেটিতে তাঁহায়,
শুনি দ্যুমৎসেন ত্বরা হৈল আগুসার,
অভ্যর্থিতে লয়ে অর্ঘ্য, সাদর সম্ভাষে
কুটীরে আনিয়া নৃপে, দিইলা বসিতে
পবিত্র শাম্বর-চর্ম্ম ; সুধাইলা পরে,
"হে নৃপেন্দ্র! কোন্ হেতু, কহ আগমন?"
ধীরে ধীরে সবিনয়ে কহেন মহীশ
"হে রাজর্ষি, তব পদে নিবেদন মম—
শোভনা সাবিত্রী কন্যা, তব পুত্রবর
সত্যবানে সম্প্রদানি, দিলে অনুমতি।
পরম পবিত্র প্রেম দোঁহাকার হৃদে।"
উত্তরিলা রাজ ঋষি "কি সৌভাগ্য ফলে
কোন্ পুণ্য আচরিয়া, হে মদ্র অধিপ
হেন পুত্রবধূ লাভ অদৃষ্টে আমার?
কিন্তু চিরকাল যেই যতনে পালিত,
স্বপনে দারিদ্র্যমুখ করেনি দর্শন,
কেমনে সে সুকুমারী তনয়া তোমার
তপোবনে বনবাসে সন্ন্যাসিনী হেন
সহি সুকঠোর দুখ সুকোমল দেহে
নিবসিবে?" শুনি এত কহেন রাজেশ
"সত্য বটে কন্যা মম তরুণ বয়সে,

কিন্তু জ্ঞানে হারি মানে প্রবীণ যে জন,
বিশেষ বিশুদ্ধ প্রেম তুচ্ছ হেন গণে
দুঃখ সুখ সংসারের, প্রিয়জন তরে ;
তপোবনে দুখে বাস কোন্ ছার কথা,
অবহেলে নিজ দেহ পারে উৎসৃজিতে,
মৈথিলী পবিত্রনামা দৃষ্টান্ত উজ্জল।
অযোগ্য ভাবিয়া মোরে, এ প্রার্থনা মম
নিষ্ফল না কর দেব, সৌহৃদ্যের আশে
প্রণত চরণে তব, পূর্ণ কর আশা।"
এত বলি নীরবিলে মদ্র অধিপতি
সাদরে মধুর বাক্যে কহেন রাজেশ
'হে নরেন্দ্র দেবেন্দ্র সমান, তব সনে
নহে ইষ্ট কহ কার সৌহার্দ্য স্থাপন?
রাজ্যহীন বনবাসী, তেঁই সে কহিনু
এত কথা, দোষী যদি ক্ষমিবেন মোরে।"
হেনরূপে মিষ্ট ভাষে দোঁহে তুষি দোঁহা,
পরস্পরে আলিঙ্গিয়া লইলা বিদায়।
অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণ পেয়ে,
লয়ে কুলপুরোহিত, সুবেশ ভূষণে
ভূষিতা কন্যকা সাথে উদ্বাহ কারণ,
উপজিলা মদ্রেশ্বর রাজর্ষি কুটীরে।
আনন্দে আইলা ধেয়ে ঋষিকুলবধূ
কেহ শঙ্খ করি করে, বরণের ডালা,
ধূপ ধুনা গুগ্গুলাদি দীপ লয়ে কেহ,
কর্পূর কস্তুরী কেহ দূর্ব্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফল দধি স্বস্তিক সিন্দূর,
কেহ বা পুরিয়া পাত্র চন্দনের রসে।
সত্যবান সহচর ঋষিসুত যত,
সখার বিবাহে আজি প্রহৃষ্ট-হৃদয়,
মুখে আনন্দের ছটা—দ্রুত এল তথা।

অগ্নি ধর্ম্ম করি সাক্ষী সত্যবান করে
অর্পিলা কন্যায় নৃপ, দ্যুমৎকুমার
পূত মন্ত্র করি পাঠ গ্রহিলা তাহায়।
পড়ি গেল হুলুধ্বনি অমনি চৌদিকে
বাজিল শতেক শঙ্খ ছাড়ি তপোবন;
তাপস যুবতী যত ছড়াইলা সুখে
ধানা দূর্ব্বা যব আজ্য বিবাহ প্রাঙ্গনে;
কুলাচার্য্য দ্বিজগণ কলকণ্ঠস্বরে
আরম্ভিল কুলগান--কোন্ বংশে কবে
কোন্ নৃপতির জন্ম, কেমনে শাসিলা
চরাচর, কোন্ কীর্ত্তি করিলা জগতে।
দেব দ্বিজ ঋষি যত সমতানে সবে
উচ্চারিলা আশীর্ব্বাদ দম্পতীমঙ্গলে।
অথ বধূগণ আসি পট্টবাস পরি,
কুসুম ভূষণে অঙ্গ সুন্দর ভূষিত:
(স্বর্ণরত্ন অলঙ্কার নাহিক সাজয়ে
সে অঙ্গে, উজ্জ্বল সদা নিজ সুষমায়)।
চন্দনের বিন্দুনাশে উজ্জ্বল ললাট;
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু নক্ষত্র যেমতি,
নাসিকার অগ্রে দুলে চারু মুক্তাফল
(নর্ম্মদার নীর হতে যতনে চয়িত)
শতদল দলে যেন বিন্দু হিমানীর।
কেহ করে ফুল মালা সুষিক্ত চন্দনে,
কার করে দীপপাত্র নক্ষত্রের পাঁতি,
বরণের ডালি মাথে কোন বা রঙ্গিণী,
খই কড়ি ভরি কেহ বসন অঞ্চলে,
বর কন্যা লয়ে সাথে বেড়িয়া চৌদিকে,
নাচিতে নাচিতে রঙ্গে ফুলরাশি যথা
পবন হিল্লোলে নাচে, ভরি নভস্থল
সুগীত সঙ্গীতস্রোতে, প্রবেশিল ধীরে

অন্তঃপুর, সভাজনে রাখিয়া গোহিত।
অথ দ্বিজগণপদে করিয়া প্রণতি
আলিঙ্গিয়া দ্যুমৎসেনে লইলা বিদায়
ভূপেন্দ্র, তিতিয়া হায় নয়নের জলে।

শ্রীহা— ক্রমশঃ।

খ্রীষ্ট ও চর্চ্চ।

হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্য ভাবে উন্নতি না হইলে উহাদের মধ্যে একটী প্রবল হইয়া আমাদিগকে অনেক সময় বিপথে লইয়া যায়। ভাবপ্রধান খৃষ্টধর্ম্ম একসময়ে পাশ্চাত্য প্রদেশে তাহার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞান যখন জন্ম গ্রহণ করিয়া উহার ঘোর প্রতিবাদী হইয়া দাঁড়াইল, তখন পাশ্চাত্য জগতে মহাবিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। কেহ কেহ ঘোর বিজ্ঞানবাদী হইয়া ঈশ্বর আত্মা পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, অপর দিকে আবার অনেকে খৃষ্ট ধর্ম্মের নামে কতকগুলি জাতীয় কুসংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন। এখনও সামঞ্জস্য আসে নাই। তবে আশা আছে।

সম্প্রতি আমেরিকার লিমন এবট নামক একজন বিখ্যাত পাদ্রী ম্যাসাচুসেট্‌সের অন্তর্গত কেম্ব্রিজ সহরে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়া ধর্ম্মদ্রোহী নামে আখ্যাত ও ঘোর লাঞ্ছিত হইতেছেন। ইঁনি পূর্ব্বে নিউইয়র্কের প্লাইমাউথ চার্চ্চের পাদ্রী ছিলেন। সকল লোকেই ইঁহাকে ভালবাসিত এবং তাঁহাকে একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান, সুন্দর বক্তা এবং অকপট ও প্রেমিক লোক বলিয়া বিশ্বাস করিত।

লোকের কেন এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন হইল? ইঁহার অপরাধ?

অপরাধ কি, বুঝিতে হইলে পাদ্রী মহাশয়ের বক্তৃতার অন্ততঃ কিয়দংশ শুনিতে হইবে,—

"কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একদিন এক যুবক আমার নিকট আসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন করিল। তাহার একটি প্রশ্ন এই, আপনি কি Personal God বিশ্বাস করেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু Personal God বলিতে তুমি কি বোঝ? সে বলিল, Personal God বলিতে আমি বুঝি খুব একজন

লম্বাচোড়া মানুষ, যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে বসে জগৎ শাসন করছেন।" আমি বলিলাম, আমি এরূপ Personal God মানিনা।

"পূর্ব্বে লোকের ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ ধারণা ছিল বটে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে বসিয়া ঈশ্বর একচ্ছত্র সম্রাটের ন্যায় জগৎশাসন করিতেছেন। তাঁহার আজ্ঞাই জগতের বিধান। মানুষ কেবল দূর হইতেই তাঁহার শরণ লইতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা এখন চলিয়া গিয়াছে বা যাইতে বসিয়াছে। আমরা কেহ কেহ এখনও ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই ধারণাই পোষণ করিতেছি বটে, এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা পরিত্যাগ আমাদের কাহারও কাহারও পক্ষে নাস্তিকতার সহিত সমানার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি সাহিত্য আমাদিগের এই মানসপ্রতিমা ভগ্ন করিয়া দিলেও এক অনন্ত, অপাপবিদ্ধ, আত্মসংবেদ্য, আমাদের নিজ দেহ হইতেও নিকটবর্ত্তী পরমাত্মার সম্মুখীন করিয়াছে।

"আমার ঈশ্বর এক মহান্ নিত্যবিদ্যমান শক্তি, মানুষের এবং প্রকৃতির প্রত্যেক ক্রিয়ায় তাঁহার প্রকাশ। আমি সেই ঈশ্বর মানি, যিনি সর্ব্ব বস্তুতে, সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। আমি সে ঈশ্বরকে মানিনা, যিনি জগৎ হইতে অতি দূরে অবস্থিত, যাঁহাকে বাইবেল, পাদ্রি বা অপর বাহ্য বস্তুর সাহায্যে জানিতে হয়।

"বিজ্ঞান সাহিত্য ও ইতিহাস আমাদিগকে সমস্বরে বলিতেছে, এক নিত্য শক্তি বিদ্যমান, বাইবেলকে চরম প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারেনা। বাইবেল শাস্ত্রে উপদিষ্ট বিধি নিষেধের অনেকগুলি অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে গৃহীত। উহার দশবিধি মুশার আবিষ্কার নহে; অন্যান্য বিধানের ন্যায় উহারাও প্রাকৃতিক নিয়মে উৎপন্ন। মানুষ সৃষ্ট নহে, ক্রমোন্নতির নিয়মে উৎপন্ন। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই শক্তির সত্ত্ব স্বীকার করিবেন না। এক শক্তি বিদ্যমান এবং উহা সদা ক্রিয়াশীল। ঐ শক্তি চৈতন্যময়। কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উহা অস্বীকার করিতে পারেন না। খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেও উহা কার্য্য করিতেছিল, এখনও করিতেছে।

"তথাপি আমি বিশ্বাস করি, ভগবানের ব্যক্তিত্ব (Personality) আছে। আমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের সমীপে রহিয়াছি, আমরা যতই উন্নত হইব, ততই তাঁহার সান্নিধ্য ও প্রেম উপলব্ধি করিব। ঈশ্বর মঙ্গলময়। মানুষ ক্রমশঃ উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে।"

একটি সাহেব এই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিলেন—"আধুনিক চিন্তার এই অনিবার্য্য গতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া এবং জগতের উন্নতির বিরুদ্ধাচরণ, এক কথা। যাহারা করে, তাহারা ধর্ম্মের যথার্থ শত্রু। আর ধর্ম্ম বলিতে আমি ধর্ম্মজীবন মাত্র বুঝিয়া থাকি। বিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটী, আমাদের সমুদয় শিক্ষাপ্রণালী এই আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সহায়। আমাদের কলেজের অনেক বিভাগের ছাত্রেরা এই ক্রমবিকাশবাদ শিখিতেছে। কেবল ধর্ম্মরাজ্যেই এই ক্রমবিকাশ খাটিবে না, ইহা বলা ঘোর অজ্ঞতার পরিচায়ক। এইরূপ মত প্রচারে শুভ ফলই উৎপন্ন হইবে। চর্চ্চ সকলও ক্রমশঃ প্রাচীন মতগুলিকে উচ্চ ধর্ম্মজীবনের বিরোধী জানিয়া সেইগুলি প্রচারে আর তত আগ্রহ দেখাইতেছেন না। চর্চ্চের সঙ্গে মতবিরোধ হইলেই ধর্ম্মদ্রোহী বলা এক্ষণে তমোময় যুগের প্রতিধ্বনি মাত্র।"

পাঠক শুনিলেন, ইঁহার অপরাধ। এই ঘোর অপরাধে আমেরিকার দিগ্গজপাদ্রীরা ইঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী, নব ধর্ম্মমতপ্রচারক, হিন্দু প্রভৃতি খৃষ্টীয়ান-সুলভ সুমধুর বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

এইস্থলে আমেরিকার জনৈক ছাত্র হিন্দুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে-ছেন,—

"আমেরিকায় মহাত্মা বিবেকানন্দের শুভাগমনের পর হইতে এখানকার লোকেরা ঈশ্বরের এই সান্নিধ্য একটু একটু করিয়া বুঝিতে পারিতেছে। এখানেও অনেক চর্চ্চবিরোধী মত পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, সে গুলি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও চর্চ্চের এই অতি দূরাবস্থিত ঈশ্বরবাদের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু খৃষ্ট স্বয়ং বলিয়াছিলেন, আমি ও আমার পিতা এক। এই মহাসত্য বহু শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে পরিজ্ঞাত। দুঃখের বিষয়, মিশনরিগণ হিন্দুগণকে এমন এক ধর্ম্মমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন (যদি তাঁহারা অকপট হন) যাহা তাঁহারা ক্রমশঃ অযৌক্তিক ও অসত্য বলিয়া বুঝিবেন। মিশনরিগণ প্রাচ্যদেশে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না, কারণ, প্রাচ্য দেশবাসিগণই প্রকৃত ধর্ম্ম কি জানেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া থাকেন। কয়জন মিশ-নরী যিশুখৃষ্টের আদর্শানুসরণ করিয়া দরিদ্রকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া থাকেন?

"খৃষ্ট এক জন শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরাবতার; তাঁহার প্রতি সকলেরই ভক্তি ও ভালবাসা হওয়া স্বাভাবিক। আধুনিক চর্চ্চ কিন্তু খৃষ্টের প্রকৃত

ভাব হইতে এত দূর বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন যে, যদি হিন্দুগণ এক মুহূর্ত্ত ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও মিশনরিগণের ভ্রান্ত যুক্তি ও মিথ্যা মতবাদের কুহকে ভুলিবেন না।

"ভারত চিরকাল জগৎকে যে সকল মহান্ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সকল তত্ত্বচিন্তায় সদা জাগ্রত থাকুন। বেদ, উপনিষৎ ও গীতা যে মহান্ অদ্বৈত তত্ত্বের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে অনুভব করিতে হইবে, তবেই আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম কি জানিতে পারিব। অবশ্য ভারতবাসী পাশ্চাত্য প্রদেশের বৈজ্ঞানিক কার্য্যকরী শিক্ষা পাইয়া যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারেন। কিন্তু ধর্ম্মজগতে ভারত যেন চিরকাল আচার্য্যের স্থান অধিকার করে। মিশনরিগণ ভারতবাসীকে কি শিখাইবে? তাহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছে, ভারত যে শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সেই দেশের বড় বড় ধার্ম্মিককে ধর্ম্ম শিখাইতে পারে।

"মিশনরিগণ প্রাচ্য দেশে যে রূপে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, তাহাতে উদারহৃদয়, চিন্তাশীল আমেরিকান মাত্রেই বিরক্ত। তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, ভারত চিরকাল সত্যের উপাসনা করিয়া আসিতেছে। আর আজ মিশনরিগণ আসিয়া প্রচার করিতেছেন, খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত সত্য লাভের উপায় নাই। মিশনরীরা হিন্দুহৃদয়ের এই সত্যপিপাসা তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

"ভারতপর্য্যটক বিশপ হেনরী পার্কার তাঁহার ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধীয় পুস্তকে খৃষ্টধর্ম্মের পানদোষ নিবারণের অক্ষমতায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। রেভারেণ্ড কাথবার্টস হল প্রাচ্য দেশবাসীর আধ্যাত্মিকতার সহিত পাশ্চাত্য জড়বাদের তুলনা করিয়া প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতারই প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি ভারতভ্রমণের পূর্ব্বে ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু ভারতভ্রমণের পর তাঁহার এই ঘোরতর মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে।

"সম্প্রতি কোন খ্রীষ্টীয় সমিতি কতকগুলি প্রধান প্রধান উন্নতমনা ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়া পাঠান,—চর্চ্চ সকল খৃষ্টের অনুসরণ করিতেছে কি না। তদুত্তরে আমেরিকার বিখ্যাত পাদ্রী হেবার নিউটন লিখেন, যদি ঐ প্রশ্নের এই অর্থ হয়, চর্চ্চের মধ্যে দুই চারি জন ব্যক্তি যথার্থ খ্রীষ্টের অনুসরণ করিতেছে কিনা, তাহা হইলে সকলেই অবশ্য ইহার উত্তর 'হাঁ'

বলিবেন, কিন্তু যদি এই প্রশ্নের অর্থ হয় যে, সমগ্র চর্চ্চ খৃষ্টের মতানুযায়ী গঠিত কি না এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া খৃষ্টের উপদেশের অনুসরণ করিতেছে কি না তাহা হইলে তাহার উত্তরে অবশ্যই 'না' বলিতে হইবে। চর্চ্চ যে নীতির অনুসরণ করিতেছে, তাহা খৃষ্টের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী।

"সম্প্রতি হেবার নিউটন্ তাঁহার এক বক্তৃতায় ১৮১৩ সালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া সন্ধিপত্রের অন্তর্গত মিশনরীদের সনন্দ নামক একটী প্যারাগ্রাফের উল্লেখ করিয়া বলেন, উহাতে ভারতবাসীকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া ইংলণ্ডের একটী বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে তিনি অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, যে দেশ ধর্ম্ম ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই প্রসব করে নাই, তাহাকে আবার ধর্ম্ম কি শিখাইবে? তিনি এই বক্তৃতায় প্রাচ্য দেশে নূতন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী এক যুবকের পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এই যুবক খৃষ্টধর্ম্মের সত্য আলোকের দ্বারা অন্যান্য মিথ্যা ধর্ম্মের অন্ধকার দূর করিবেন, এই আশায় প্রাচ্যভূমে গিয়াছিলেন। লোকটী সরলচিত্ত। তাঁহার পত্রপাঠে বোধ হয়, তিনি অন্যান্য ধর্ম্মেও খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় সত্যালোক দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। এবং তিনি যে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই প্রচারকার্য্যে আসিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই সকল উদারহৃদয় আমেরিকানগণের সাক্ষ্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গোঁড়াদের প্রতাপ সত্ত্বেও আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তিরা দিন দিন উদারভাবাপন্ন হইতেছেন। হে ভারতবাসিগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা তথাকথিত খৃষ্টশিষ্যগণের সংস্পর্শে আসিতেছ, জানিয়া রাখ যে, প্রকৃত খৃষ্ট অনন্ত কাল ধরিয়া তোমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন।"

পাঠক, আমেরিকান ছাত্রের পত্রের সারাংশের মর্ম্মানুবাদ করিয়া তোমাদিগকে শুনাইলাম। এখন জগতের ভাব বুঝিয়া নিজ নিজ পথ বাছিয়া লও, নিজের ধর্ম্ম নিজে বুঝিতে শিখ। সংসারের পিচ্ছিল পথে পথভ্রষ্ট হইও না এবং পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া জগতে ভারতবাসীর প্রকৃত স্থান অধিকার কর।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, বহুবাজার সার্পেন্টাইন লেনস্থ রামকৃষ্ণ সমিতি কর্ত্তৃক স্থাপিত অনাথ ভাণ্ডারের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। গত মাস হইতে আর একটী অনাথ বালককে আশ্রমে রাখা হইয়াছে। সুতরাং আশ্রমের অনাথ সংখ্যা এক্ষণে ছয়টী। উক্ত ভাণ্ডারের মার্চ্চ, এপ্রেল ও মে মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মার্চ্চ, এপ্রেল ও মে মাহার আয়—

চাউল বিক্রয় হইতে ———১১৩।/১৭॥

চাঁদা আদায়—————— ৯৩৸৫

এককালীন দান প্রাপ্তি———২৪॥/০

বালকদিগের উপার্জ্জন——— ৯৮৵৫

মোট—২৪১৮৭॥

মার্চ্চ, এপ্রেল ও মে মাহার ব্যয়—

অনাথভাণ্ডারের আবশ্যকীয ব্যয় ৩৸৶১০

বিধবাগণকে সাহায্য দান——১০॥৶১০

আশ্রমস্থ বালকগণের

খাই খরচ———৪৪৸৶১৫

ঐ বস্ত্রাদি———— ৭॥০

,, ঔষধ—————৪॥/০

,, তৈজসাদি——— ২৸/১০

,, আলোখরচ———৪৲১০

,, পুস্তকাদি——— ২॥৶১০

,, ধোপা নাপিত———১।/০

,, ট্রেণইত্যাদিরভাড়া ৫॥১০

,, শয্যাদি————৩।৶১৫

,, পাচকের বেতন—৬।/১০

,, ঘরভাড়া——— ১০৲

,, খুচরা খরচ————২৵৫

মোট—১১০৵৫

হস্তেস্থিত—১৩১॥৵২॥

—

আমেরিকার ব্রুকলিন নগরস্থ মনটেগ ষ্ট্রীটস্থ শিল্পপ্রাসাদে গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে স্বামী অভেদানন্দ "বেদান্তদর্শন এবং শ্বাস প্রশ্বাস তত্ব" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা সমধিক হওয়ায় হলটি একবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সকলেই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা দ্বারা ব্রুকলিন নগরস্থ জন সাধারণের বেদান্ত জ্ঞান পিপাসা সবিশেষ পরিবর্দ্ধিত হইযাছে।

গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে স্বামী অভেদানন্দ ওয়াসিংটন নগরের সর্ব্ব সাধারণ সমক্ষে একটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে বহুজন সমাগম হয় এবং সকলেই আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেন। এই বক্তৃতার পর হইতে ওযাসিংটনে বেদান্ত সমিতির একটি শাখা স্থাপিত হইযাছে। ইতিপূর্ব্বেও স্বামীজি এই নগরে আগমন করিয়া বেদান্ত সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

গত ১৮ই এপ্রেল তারিখে স্বামীজি পুনরায় এখানে আসিয়া এক বক্তৃতা করেন।

আমরা বিগত ২৭শে মে শনিবার ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের দেহত্যাগ সংবাদে অতিশয দুঃখিত হইয়াছি। ইনি আজীবন ব্রহ্মনাম প্রচারে জীবন যাপন করেন। ইংরাজী বক্তৃতায ও ইংরাজী গ্রন্থরচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সুদূর আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তিনি অনেকবার ধর্ম্ম প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। চিকাগোর বিখ্যাত ধর্ম্মমেলায় 'এসিয়াবাসীর নিকট পাশ্চাত্যদেশ কি শিক্ষা করিতে পারে', এতৎসম্বন্ধে এক মনোহর সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কেশব বাবুর সহিত ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন এবং পরমহংসদেবের চরিত্রে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবও ইঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং সস্নেহে অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। ইনি কিছু স্বাধীনপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কেশব বাবুর শরীর ত্যাগের পর ইনি সাধারণের সহিত বড় মেশামিশি করিতেন না। ঈশ্বর ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারগণের সান্ত্বনা বিধান করুন।

আমেরিকার নিউইয়র্ক বেদান্তসমিতি হইতে সম্প্রতি 'বেদান্ত' নামে এক খানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহা দ্বারা বেদান্তকার্য্যের আরও বিস্তৃতি হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত। *

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অদ্য শ্রীরঙ্গমে গরুড় মহোৎসব। নানাস্থান হইতে শত শত নর নারী ভগবদ্দর্শনমানসে তথায় উপনীত হইয়াছেন। সকলে সুবিশাল মন্দিরদ্বারে গরুড়স্কন্ধসমাসীন শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভেরি ও কাহলের তুমুলধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে শেষশায়ী নারায়ণের জয়ঘোষণা করিতেছে। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিশাল প্রাঙ্গনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছেন। এমন সময় শ্রেণীবদ্ধ শত শত ব্রাহ্মণকণ্ঠ হইতে পরম পবিত্র দ্রাবিড় বেদধ্বনির আবির্ভাব হইল। তচ্ছ্রবণে সমুদয় কোলাহল সর্ব্বতোভাবে স্থির হইয়া গেল। বেদপাঠিগণ আভ্যন্তর প্রাঙ্গন হইতে ক্রমে মন্দিরদ্বারের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বংশখণ্ডদ্বয়ের অগ্রভাগে বিন্যস্ত শঙ্খচক্রতিলকাঙ্কিত এক লোহিতপট তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে নীয়মান হইতে থাকিল। সেই গোমুখবিমুক্ত জাহ্নবীধ্বনির ন্যায় পরমপাবন বেদধ্বনি সমবেত যাবতীয় নরনারীর সর্ব্বসন্তাপ হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে শ্রুতিমন্দাকিনীস্নাত করতঃ দেবতুল্য করিয়া তুলিল। পৃথিবী তৎকালে স্বর্গের ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী হইলেন।

মন্দিরদ্বার অতিক্রম করিয়া, দ্রাবিড়বেদপাঠিগণ রাজপথে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের পশ্চাৎ বিপুলকলেবর কতিপয় হস্তী বৃহদ্দুর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিত ও নানা সাজে সজ্জিত হইয়া দীর্ঘস্থূল কররাজি আন্দোলন করিতে করিতে মন্থরগমনে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারাও রাজপথ অধিকার করিলে তৎপশ্চাৎ কতিপয় দীর্ঘবিষাণ, স্থূলককুৎ, পীবরতনু, কাহলযুগ্মশোভিপৃষ্ঠ, সুসজ্জিত বৃষভ, রক্ষকপরিচালিত হইয়া মৃদুগমনে ক্রমে রাজমার্গ

* পূর্ব্বে যে কুরেশনন্দন পরাশর ও ব্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা ৯৮৩ শকাব্দায়, শুভকৃৎ নামক বর্ষে, বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুরাধা নক্ষত্রে, শ্রীরঙ্গমক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আশ্রয় করিল। তৎপশ্চাৎ সাদিপরিচালিত কতিপয় সুসমলঙ্কৃত তুরঙ্গ অশ্ব, বাদ্যকারবিতাড়িত ঢক্কাযুগ্ম পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া ক্রমে দ্বার অতিক্রম করিল। তাহাদের পশ্চাৎ অসংখ্য হরিনামসঙ্কীর্ত্তনপরায়ণ ভক্তমণ্ডলী নানাবিধ যন্ত্র সহায়ে মধুরস্বরে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে করিতে রাজমার্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা রাজমার্গে প্রবেশ করিলে, তৎপশ্চাৎ গরুড়স্কন্ধসমাসীন দেবদাসিগণসংস্তুত লক্ষ্মী-সনাথ, অর্চ্চকগণপরিবেষ্টিত শ্রীনারায়ণ শত শত ভক্তিমান্ বাহক কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যখন জনতার নয়নপথে পতিত হইলেন, তখন আনন্দো-ৎফুল্ল নরনারীগণ যুগপৎ করতালিধ্বনি ও জয় শব্দে দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত করিয়া তুলিল। দ্বারসম্মুখস্থ মণ্ডপে শ্রীভগবান্ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করি-লেন। তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে শ্রেণিবদ্ধ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ উচ্চগম্ভীরস্বরে ঋষিপ্রহৃত সংস্কৃত বেদপাঠ করিতে করিতে ধীরপদে আগমন করিতে লাগিলেন। নারায়ণ মণ্ডপে উপবিষ্ট হইলে সকলেই গতি স্থির করিলেন। শত শত ভক্ত তৎকালে নানাবিধ পূজোপহার লইয়া ভগবানের পূজা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ নারিকেল ফল সমূহ ভগ্ন করতঃ তৎসমু-দয়কে নারায়ণদৃষ্টিপূত করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কদলকগুচ্ছ তদীয় উদ্দেশে নিবেদন করিতে থাকিলেন, কেহ কেহ বা কর্পূর প্রজ্ব-লিত করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীহরির আরাত্রিক বিধান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে শ্রীভগবান্ মণ্ডপ ত্যাগ করিলেন; এবং শঙ্খচক্রতিলকাঙ্কিত লোহিত পট হইতে আরম্ভ করিয়া সাম ও যজুর্ব্বেদপাঠিগণ পর্য্যন্ত সমুদয় জনতা এক মহাস্রোতের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজপথে তিলমাত্র স্থানও জনশূন্য রহিল না। সকলেরই দৃষ্টি গরুড়স্কন্ধাধিরূঢ় লক্ষ্মীসনাথ নারায়ণের উপর।

স্বীয় দলবলসহিত ব্রহ্মাণ্ডপতি রাজমার্গে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে বীথিপার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকাসমূহের অলিন্দ হইতে পুরনারীগণ কুসুম কর্পূর ফল তাম্বুলময় নৈবেদ্য ভগবদুদ্দেশে সমর্পণ করিবার জন্য অর্চ্চকদিগের হস্তে দিতে থাকিলেন, এবং তাঁহারাও যথাবিধি তৎসমুদয়কে নিবেদন করিয়া ভক্তিমতী পুরন্ধ্রীকুলকে প্রসাদ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক ভগবৎপাদুকাচিহ্নিত মুকুট (শঠকোপ) তাঁহাদের অবনত শিরোদেশে স্পর্শ করাইতে লাগিলেন। সেই বিপুল জনতার মধ্যে এমন

কেহই ছিলেন না, যিনি যুক্তকরে ভক্তিপরিপ্লুতহৃদয়ে ভগবৎপাদপদ্মে ন্যস্তদৃষ্টি হইয়া না ছিলেন। তৎকালের এমনই এক ভক্ত্যুদ্দীপক প্রভাব প্রকটিত হইল যে, অভক্তও কালগুণে পরম ভক্তিমান্ হইলেন। এই ভাবটী জনতার সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইল, কেবল মাত্র একস্থলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখা গেল। রঘুবংশীয়দিগের ন্যায় এক "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্ম্মহাভুজঃ" পরম বলবান্ দর্শনীয় পুরুষ অন্যভাবে বিভোর হওতঃ জনতাস্রোতে আকৃষ্ট হইয়াই যেন চলিতেছিল। তাহার বাম হস্তে একটী বিস্তৃত ছত্র, কিন্তু তাহা তদীয় মস্তককে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছিল না। সম্মুখে এক পরমলাবণ্যময়ী, বিশালনয়না, চিত্ত-চমৎকারিণী যুবতীর প্রফুল্ল কুমুদিনীসদৃশ মনোহর বদনকে কমলিনীনায়ক সূর্য্যের প্রখর কিরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত ছত্রটি তাহারই শীর্ষো-পরি বিধৃত হইয়াছিল। সেই পুরুষটীর দক্ষিণ হস্তে একটী ব্যজন ছিল। মধ্যে মধ্যে তাহা সঞ্চালন করিয়া যুবতীর ঘর্ম্মক্লেশ নিবারণ করিতেছিল। তাহার মন প্রাণ ও দৃষ্টি সেই ললনাটির উপরই নিবদ্ধ। জগৎ আছে বলিয়া তাহার বোধ ছিল না। এরূপ আচরণে লোকে কি কহিবে, এ চিন্তা তাহার মনে একবারও উঠে নাই। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা যদিও ঐ যুগলমূর্ত্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া কত কি কানাকানি করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা তাহার গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিল না। কমলহৃদয় মধুপায়ী ভ্রমর সম্ভোগসাগরে নিমগ্ন হইয়া যেরূপ জগৎ বিস্মৃত হইয়া যায়, ঐ বলবান্ যুবকটীও তদ্রূপ সেই যুবতীর সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া গিয়া আত্মহারা হইয়াছিল। সুতরাং লজ্জা ঘৃণা ও ভয় তাহাকে কিরূপে স্পর্শ করিবে?

স্নানান্তে কাবেরীতীর হইতে প্রত্যাগত, শিষ্যকুলপরিবেষ্টিত, দাশ-রথিস্কন্ধোপরি-ন্যস্ত-বামহস্ত, পতিতপাবন শ্রীরামানুজাচার্য্য তৎকালে রাজ-মার্গে ভগবদ্দর্শন পূজন সমাপ্ত করিয়া স্বীয় মঠের দিকে গমন করিতে-ছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি এই অভিনব দৃশ্যের উপর পতিত হইল। তিনি জনৈক শিষ্যকে কহিলেন, "বৎস, তুমি ঐ নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ লোকটীকে আমার নিকট আহ্বান করিয়া আনয়ন কর। শিষ্যটী তৎসমীপে উপনীত হইয়া বারম্বার আহ্বান করিলে, তবে তাহার চৈতন্য হইল। তখন সে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কিঞ্চিৎ ত্রস্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দর্শন করতঃ যুক্ত-করে কহিল, "মহাশয়, দাসকে কি অনুমতি করিতেছেন?" ব্রাহ্মণ কহি-

লেন, "অদূরে যতিরাজ দণ্ডায়মান। তিনি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহার নিকট আইস।" যুবক যতিরাজের নাম শ্রবণ করিয়া প্রণয়িনীর নিকট হইতে ক্ষণকালের জন্য বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিভরে ব্রাহ্মণের অনুগমন করিল ও ক্ষণপরেই শ্রীরামানুজ সন্নিধানে আগমন করতঃ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তৎ-সমীপে তূষ্ণীম্ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। যতিরাজ তাহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঐ যুবতীটির ভিতর কি এমন অমৃত পাইয়াছ, যাহাতে লজ্জা ঘৃণা ভয় ত্যাগ করিয়া এই বিপুল জনতার মধ্যে মহা কামুকের ন্যায় ব্যবহার করতঃ সকলের হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছ?" যুবক উত্তর করিল, "মহাত্মন্, পৃথিবীতে যাবতীয় সুন্দর বস্তু বর্ত্তমান আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ঐ সুন্দরীর নয়নযুগল পরম সুন্দর। ও দুইটীকে দর্শন করিলে আমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যাই। তখন আমার আর চক্ষু ফিরা-ইবার সামর্থ্য থাকে না।" যতিরাজ কহিলেন, "উনি কি তোমার বিবা-হিতা পত্নী?" যুবক কহিল, "না মহাশয়! বিবাহিতা না হইলেও, আমি উহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ইহ জীবনে ভাল বাসিব না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি।" "তোমার নাম ধাম কি?" যুবক। "নিচুল নগরে আমার বাস। আমার নাম ধনুর্দাস। আমি মল্লবিদ্যানিপুণ। আমার প্রণয়িনীর নাম হেমাম্বা।" যতিরাজ ইহা শুনিয়া কহিলেন, "ধনুর্দাস, যদি আমি তোমায় ঐ যুবতীর নয়ন অপেক্ষা আরও সুন্দরতর নয়নযুগল দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি উহাকে ছাড়িয়া তাহাকে ভাল বাসিতে পারিবে কি না?" যুবক ইহাতে উত্তর করিল, "মহাত্মন্, যদি আমার প্রণয়িনীর নয়ন অপেক্ষা অন্য কাহারও সুন্দরতর নয়ন থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উহাকে ছাড়িয়া তাহাকে ভজনা করিব।" শ্রীরামানুজ কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, অদ্য সন্ধ্যার সময় আমার নিকট আসিও। আমি তোমায় এমন সুন্দর লোচনযুগ্ম দেখাইব, যাহার তুলনা ত্রিভুবনে নাই। ধনুর্দাস "যথাজ্ঞা" বলিয়া যুবতী-পার্শ্বে গিয়া পূর্ব্ববৎ ছত্র ধারণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত। শ্রীরামানুজাচার্য্য ধনুর্দাসের সহিত শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর বৃহদায়তন দ্বারগুলি একে একে অতিক্রম করিতেছেন। এইরূপে পাঁচটি গোপুর অতিক্রান্ত হইলে তাঁহারা মূল বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অর্চ্চক যতিরাজকে সন্দর্শন করিয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনা

পূর্ব্বক কর্পূর গ্রহণ করতঃ ভুজগশয়ন, জগদ্বীজ, শান্তাকার, পদ্মনাভ, মেঘবর্ণ, শুভাঙ্গ, লক্ষ্মীপতি, ভবভয়হারী, কমলনয়ন নারায়ণের আরাত্রিক বিধান করিতে লাগিলেন। সেই কর্পূরালোকে শ্রীভগবানের পদ্মপলাশ-সদৃশ বিশাল নয়নদ্বয় ভক্তগণচিত্তে পরমানন্দ বিস্তার করিয়া প্রকাশিত হইল। যতিরাজপার্শ্ববর্ত্তী ধনুর্দাস তন্মাধুর্য্য দর্শনে আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না, সে অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আনন্দের পরকাষ্ঠায় উপনীত হইল। হেমাম্বার নয়নমাধুরী সূর্য্যোদয়ে তারকামাধুরীর ন্যায় তাহার চিত্তাকাশ হইতে একেবারে অপসৃত হইয়া গেল। পরম নির্ব্বৃতিসাগরে এইরূপে কিয়ৎকাল নিমগ্ন থাকিবার পর ক্রমে তাহার বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। তখন সে স্বপার্শ্বে যতিরাজকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার পাদমূল আশ্রয়পূর্ব্বক কহিল, "মহাভাগ, পরম কৃপালুতাবশতঃ অদ্য আপনি এই কামপরায়ণ পশুকে যে দেবদুর্লভ আনন্দের ভাগী করিলেন, তন্নিমিত্ত সে চিরকালের জন্য আপনার ক্রীতদাস হইয়া রহিল। আমি এতকাল মহাসাগর তুচ্ছ করিয়া কূপমণ্ডূকের ন্যায় কূপেরই পরম সমাদর করিতেছিলাম, সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও বীর্য্যের আকর, ভগবান্ অংশুমালীকে বহুমান না দিয়া নিশাচর পেচকের ন্যায় খদ্যোতিকার রূপেই মুগ্ধ ছিলাম। অহো, আমার ন্যায় হীনবুদ্ধি জগতে কি আর দ্বিতীয় আছে? আমার ন্যায় ঘোর মূঢ়ের তমোবিনাশ কেবল মাত্র আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব হইল। অদ্য হইতে আমাকে আপনার চিরদাস বলিয়া জানিবেন।"

পতিতপাবন রামানুজ পদপ্রান্তে পতিত, অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র ধনুর্দাসকে উত্থাপিত করিয়া সস্নেহে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাহার ত্রিবিধ সন্তাপ চিরকালের জন্য হরণ করিয়া লইলেন। লম্পট দেবত্ব লাভ করিল। স্বৈরিণী হইলেও হেমাম্বা ধনুর্দাসকে পতির ন্যায় ভক্তি করিত। যতিরাজকৃপায় প্রিয়তমের দিব্য দৃষ্টি লাভ হইয়াছে জানিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সেও ইন্দ্রিয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামানুজের শরণাগত হইল! অপার করুণাসাগর প্রণতার্ত্তিহর যতিভূপতি তাহাকেও কৃপা করিয়া মোহান্ধকার হইতে মুক্ত করিলেন এবং উভয়ের কামবন্ধন ছাড়াইয়া তাহাদিগকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। পতিপত্নীর ন্যায় একত্র থাকিলেও কাম আর তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিল না। নিচুল নগর হইতে

বাস উঠাইয়া তাহারা শ্রীরঙ্গমে আসিল এবং যতিরাজ সন্নিধানে একটি গৃহ লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

ধনুর্দাসের উপর শ্রীরামানুজের স্নেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার গুরুভক্তি, বৈরাগ্য, বিনয়, সরলতা, মধুরভাষিতা প্রভৃতি অশেষবিধ গুণে শ্রীরঙ্গমস্থ যাবতীয় নরনারী তাহাকে ও তদীয় প্রণয়িনীকে যতিরাজের পরম কৃপাপাত্র বলিযা সমাদর করিত। তাহার দেবতুল্য গুণসমূহের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য প্রতিদিন স্নানগমনকালে দাশরথির কর গ্রহণ করিয়া গমন করিলেও, স্নানান্তে প্রত্যাগমনকালে শ্রীরামানুজ ধনুর্দাসের হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক স্বমঠে আগমন করিতেন। ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ নিরতিশয় দুঃখিত হইত, এবং কেহ কেহ তাঁহাকে এই বিসদৃশ আচরণের জন্য দুই এক কথাও বলিয়াছিল। তিনি তাহাতে কোনও উত্তর না দিয়া তূষ্ণীম্ভাবে থাকিতেন। একদিন রজনীযোগে মঠস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে যতিরাজ রজ্জ্বুপরি বিস্তৃত প্রতি শিষ্যের বস্ত্রাঞ্চল হইতে কৌপীনোপযোগী কিয়দংশ বস্ত্র ছিন্ন করিয়া লইলেন। প্রভাতে শিষ্যগণ শয্যা হইতে উঠিয়া স্ব স্ব বস্ত্রের দুর্দশা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি এরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল যে, তাহা শুনিলে অতি ইতর লোকও লজ্জিত হয়। এক প্রহর কাল এরূপ কলহ চলিলে শ্রীরামানুজ তাহা এক প্রকার মিটাইয়া দিলেন।

সেই দিন রজনীমুখে তিনি কতিপয় শিষ্যকে কহিলেন, "দেখ, আমি অদ্য ধনুর্দাসকে কথাচ্ছলে অনেকক্ষণ আমার নিকট বসাইয়া রাখিব। তোমরা ইত্যবসরে উহার প্রসুপ্তা প্রণয়িনীর অঙ্গ হইতে যাবতীয় অলঙ্কার অতি সংগোপনে হরণ করিয়া আন। দেখিব, এতদ্দ্বারা ধনুর্দাস ও তৎপ্রণয়িনীর কোনও মনোবিকার জন্মায় কি না।" গুরুবাক্যানুসারে শিষ্যগণ গভীর নিশায় ধনুর্দাসমন্দিরের নিকট গিয়া বুঝিতে পারিল যে, তাহার প্রণয়িনী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। পতির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া হেমাম্বা দ্বার অর্গলবদ্ধ করে নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ সহজেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহারা তাহাকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা দেখিয়া অতি সতর্কতার সহিত তাহার অঙ্গ হইতে আভরণ উন্মুক্ত করিতে লাগিল। হেমাম্বা ইহা জানিতে পারিল কিন্তু নড়িলে চড়িলে পাছে ব্রাহ্মণগণ ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে, এই জন্য স্থির হইয়া রহিল। এক পার্শ্বের অলঙ্কার উন্মুক্ত

হইলে হেমাম্বা অপর পার্শ্বের অলঙ্কার গুলিও তাঁহাদিগকে দিবার জন্য নিদ্রাভিভূতার ন্যায় ছলক্রমে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণগণ ত্রস্ত হইয়া একপার্শ্বের অলঙ্কার লইয়াই প্রস্থান করিল এবং শ্রীরামানুজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত গোপনে ব্যক্ত করিল। যতিরাজ তখন ধনুর্দ্দাসকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস, রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে গমন কর।" 'যথাজ্ঞা ভগবন্‌' বলিয়া মল্লবর গৃহে গমন করিলে তিনি চৌর শিষ্যগণকে কহিলেন, "তোমরা উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর এবং শুনিয়া আইস উহাদের কি কথোপকথন হয়।" শিষ্যগণ তদ্রূপ করিল। ধনুর্দ্দাস গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক পত্নীকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কহিল, "একি, তোমার এক পার্শ্বের আভরণ সমুদয় কোথায়?" হেমাম্বা কহিল, "প্রভো, কতিপয় ব্রাহ্মণ গৃহে অভাব বশতঃ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমার বহুমূল্য অলঙ্কার হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি তৎকালে শয্যায় শয়ান থাকিয়া ভগবানের নামাবলি মনে মনে জপ করিতে করিতে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। তাঁহারা আমি নিদ্রাভিভূতা জ্ঞান করিয়া ধীরে ধীরে আমার একপার্শ্বের আভরণগুলি উন্মুক্ত করিলে, আমি অন্য পার্শ্বের গুলিও তাঁহাদিগকে দিবার জন্য যেন নিদ্রাভরেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা তাহাতে ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গেলেন।" ইহা শুনিয়া ধনুর্দ্দাসের আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে কহিল, "তুমি পাশ ফিরিতে গিয়া কি অন্যায়ই করিয়াছ! তোমার অহঙ্কার এখনও গেল না? আমার দেহ, আমার অলঙ্কার, আমি দান করিব, এই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃই অদ্য তুমি এই কাঞ্চনবহনরূপ বিষ্ঠাভার হইতে মুক্ত হইবার পরম সুবিধা হারাইলে। তুমি যদি শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিতে, তাহা হইলে তাঁহারা তোমায় সুনিদ্রিতা জানিয়া সমস্ত অলঙ্কারগুলিই লইয়া যাইতে পারিতেন। অতএব যদি মঙ্গল চাও, এই মুহূর্ত্ত হইতে 'আমি' জ্ঞান একবারে সমূলে উন্মূলিত করিয়া দিতে সবিশেষ যত্নবতী হও।" হেমাম্বা এতচ্ছ্রবণে আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিল, "হে প্রিয়তম, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এরূপ মোহ আমার মনে আর কখনও স্থান না পায়। আর যেন আমি কখনও অহঙ্কারে অভিভূতা না হই।"

ব্রাহ্মণগণ এই দেবতুল্য দম্পতির নির্ম্মল মনোভাব জ্ঞাত হইয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শ্রীরামানুজচরণে নিবেদন করিল। রাত্রি অধিক হওয়ায় সে দিন তিনি তাহাদিগকে বিশ্রামার্থ গমন করিতে অনুমতি করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে মঠবাসী সিংহাসনাধিপতি ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক অধ্যয়নার্থ শ্রীযতিরাজের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইলে, তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণাভিমানি-পণ্ডিতগণ, তোমরা পূর্ব্বদিবস প্রাতঃকালে স্ব স্ব বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন দর্শন করিয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছিলে, ও গত রজনীতে সপত্নীক ধনুর্দাস সর্ব্বস্বলুণ্ঠিত হইলেও যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, এই দুইটী আচরণের মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণোচিত আচরণ হইয়াছে, তাহা বল।" এতচ্ছ্রবণে সকলে অবনতমস্তকে পরম লজ্জাযুক্ত হইয়া একবাক্যে কহিল, "প্রভো, ধনুর্দাসই ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করিয়াছেন, এবং আমরা নিরতিশয় ঘৃণিত আচরণ করিয়াছি।" ইহাতে যতিরাজ করিলেন, "অতএব বৎসগণ জানিও, 'ন জাতিঃ কারণং লোকে গুণাঃ কল্যাণহেতবঃ,' গুণই কল্যাণের কারণ, জাতি নহে। সুতরাং সকলে জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া গুণবান্ হইতে যত্নশীল হও। জাতি অহঙ্কারের প্রসূতি হইলে তাহার ন্যায় শত্রু মানবের আর দ্বিতীয় থাকিতে পারে না। কিন্তু উহা যদি আত্মরক্ষার কারণ হয়, তাহা হইলে উহার ন্যায় বন্ধুও আর এ জগতে দ্বিতীয় নাই।" সিংহাসনাধিপতিগণ সেই দিবস হইতে চৈতন্য লাভ করিলেন। তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার গুরূপদেশরূপ আলোকে তিরোহিত হইয়া গেল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনাথদ্বার।

(শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিক।)

রাজপুতানা ভ্রমণকালীন তদ্দেশবাসীর মুখে মেবারের শ্রীনাথজীউর প্রসিদ্ধি ও মাহাত্ম্য শুনিয়া আমার ঐ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। আমি রাজপুতানা মালোয়া রেলে আরোহণ করিয়া চিতোর গড়ে পৌঁছিলাম। তথায় গাড়ি বদল করিয়া উক্ত রেলের যে শাখা উদয়পুরের*

দিকে গিয়াছে, তাহাতে আরোহণ করিলাম এবং পথিমধ্যে মাবলি (মাউলী) ষ্টেশন অতিক্রম পূর্ব্বক দেবারি ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীনাথদ্বার সহর মাবলি ষ্টেশন হইতে ৭ ক্রোশ ও উদয়পুর হইতে ২১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; পথের অল্পতা হেতু অধিকাংশ যাত্রীই মাবলি পথে দর্শনার্থ গমন করে। পূর্ব্ব হইতেই আমার উদয়পুর সহর দেখিবার ইচ্ছা ছিল, বিশেষতঃ সে সময়ে সারণ জেলা নিবাসী আমার জনৈক ক্ষত্রিয় বন্ধু উদয়পুরে ছিলেন, আমিও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রতিশ্রুত ছিলাম, এই সকল কারণে আমি উদয়পুরের রাস্তা দিয়া শ্রীনাথদ্বার যাত্রা করি। তখন উদয়পুর পর্য্যন্ত রেল খোলা হয় নাই। দেবারি এই শাখা লাইনের শেষ ষ্টেশন; এখান হইতে উদয়পুর ৩ ক্রোশ, বেশ পাকা রাস্তা। ষ্টেশনে গাড়ি, টঙ্গা, এক্কা প্রভৃতি সমুদায় সোয়ারি পাওয়া যায়।

ষ্টেশনের অতি নিকটেই পর্ব্বতশ্রেণী। আমি উদয়পুর যাইবার জন্য একখানি টঙ্গা ভাড়া করিয়া এক মাইল পথ আসিয়াই একেবারে পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। এখানে পর্ব্বত মধ্যে একটী গিরিবর্ম্ম (Pass) থাকায়, এই পাহাড়টী অতিক্রম করিবার জন্য উহাতে আরোহণ করিবার আবশ্যকতা হয় না। এই রন্ধ্রপথ দিয়া বহিঃশত্রু প্রবেশ নিবারণের জন্য ইহার প্রবেশমুখে একটী প্রকাণ্ড দরজা বা ফটক আছে। ইহার ভিতর প্রহরীদের থাকিবার স্থান ও চতুর্দ্দিকে তোপ সাজান আছে। হলদিঘাটার যুদ্ধে যদিও মিবারের স্বাধীনতা মোগল কর্ত্তৃক অপহৃত হয় এবং যদিও রাণা প্রতাপসিংহ পরবর্ত্তী কয়েকটী যুদ্ধেও মোগলদের নিকট কয়েকবার পরাজিত হন, তথাপি তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্বীয় অসীম সাহস ও দৃঢ় অধ্যবসায় সহায়ে, এই দেবারি যুদ্ধক্ষেত্রে মোগলদিগকে জয় করিয়া, মিবারের সেই নষ্ট গৌরব ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। হায়! আজও মিবারে সেই দেবারির ন্যায় বিজয়ক্ষেত্র সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, আজও সেই মহারাণা প্রতাপসিংহের বংশ শিশোদিয় কুল মিবার রাজ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, আজও মিবার রাজ্য পর্ব্বতাদি দ্বারা স্বাভাবিক উপায়ে পূর্ব্বের ন্যায় সুরক্ষিত রহিয়াছে, আজও সেই মরুময় মিবারের রাজপুত রমণীগণ পূর্ব্বের ন্যায় শ্রমসহিষ্ণু বীর সন্তান সকল প্রসব করিতেছেন; কিন্তু মহারাণা প্রতাপের হৃদয়ে যে অধ্যবসায় ছিল, সেই অধ্যবসায় আমাদের জাতীয় জীবন হইতে লুপ্ত হওয়ায় এ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও যেন আমাদের কিছুই নাই! একমাত্র এই অধ্যবসায়ের অভাবে আজ পর্য্যন্ত আমরা কোন বিষয়েই কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি না।

২

পূর্ব্বোক্ত রন্ধ্রপথ দিয়া পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক সমতল ক্ষেত্র সকল পার হইয়া ক্রমে উদয়পুর সহরের নিকটে আসিয়া পৌছিলাম। এস্থান হইতে উদয়পুর সহরটী অতি সুন্দর দেখায়। সহরের সম্মুখবর্ত্তী বাটীগুলি অপেক্ষা পশ্চাদ্বর্ত্তী বাটীগুলি ক্রমান্বয়ে পরস্পর হইতে ঈষৎ উচ্চস্থানে অবস্থিত থাকায়, এবং সর্ব্ব পশ্চাতে উদয় সাগরের উপকূলে অনতি উচ্চ পার্ব্বতীয় ভূখণ্ডের উপর মহারাণার মহল প্রতিষ্ঠিত থাকায়, দূর হইতে সমুদয় সহরটী, বিশেষতঃ মহারাণার মহলটী বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের সম্মুখের তিন দিক্ হাতা অর্থাৎ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, পশ্চাতে উদয়সাগর, সুতরাং ঐদিকে আর প্রাচীর নাই। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে সহর প্রবেশের জন্য কয়েকটী ফটক আছে। প্রত্যেক ফটকেই প্রহরী নিযুক্ত ও তোপ সজ্জিত আছে। সহরের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের উপরিস্থিত সুজন গড় নামক কেল্লা এরূপ ভাবে অবস্থিত যে, এখান হইতে তোপের সহায়ে সমুদয় সহরটী রক্ষিত হইতে পারে। এই কেল্লাতেই মহারাণার রণোপকরণ সমুদয় মজুত থাকে। এই কেল্লা হইতে প্রত্যহ রাত্রি ১০টার সময় তোপ পড়িলে সহরের সমুদয় ফটক রাত্রের জন্য বন্ধ হয় এবং প্রাতে ৫টার সময় পুনরায় তোপের শব্দ হইলে ঐ সকল ফটক খোলা হয় ও সাধারণে যাতায়াত করিতে পারে।

আমি সহরের বাহিরে অবস্থিত একটী সরায়ে টঙ্গা হইতে নামিয়া স্নান আহার ও বিশ্রাম করিয়া লইলাম। উদয়পুর সহরের বাহিরে ও ভিতরে প্রায় ৩।৪টী সরাই আছে। এই সকল সরাই মহারাণার ব্যয়ে নির্ম্মিত, যাত্রিগণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সরায়ের দ্বারে মহারাণার প্রহরী দিবারাত্র পাহারায় নিযুক্ত থাকে। সরায়ে থাকিবার জন্য কোনরূপ ভাড়া দিতে হয় না। কোন যাত্রীকে এক মাসের অধিক সময় থাকিতে দিবার নিয়ম নাই। সরায়ের যাত্রীদিগকে, কোতোয়ালিতে যাইয়া নিজ নিজ নাম ধাম, আসিবার প্রয়োজন ও কতদিন এইস্থানে থাকিবে, তাহা লেখাইয়া আসিতে হয়। এখানে বিশ্রামান্তে আমি ফটক দিয়া সহরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেলওয়ারা রাজার হাবলীতে (বাটীতে) গিয়া আমার পূর্ব্বপরিচিত ক্ষত্রিয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহার উক্ত রাজার সহিত আত্মীয়তা থাকায় তিনি ঐ বাটীর একটী পৃথক্ মহলে নিজ লোকজনের সহিত বাস করিতে-ছিলেন। বন্ধুবর আমাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে তাঁহার বাসায় থাকিবার অনুরোধ করায় আমি যে কয়দিন উদয়পুরে ছিলাম, সেই কয়দিন তাঁহার নিকটেই রহিলাম। এই বাটী মহারাণার মহলের অতি নিকট

এবং মহারাণার সরকারী বাগানের ঠিক পার্শ্বে অবস্থিত। দেলওয়ারা রাজার ন্যায় মিবারের সমুদয় সামন্ত নরপতিদের রাজকার্য্য বা শিকার খেলার জন্য সময় সময় দরবারে উপস্থিত হইতে হয়, ঐ সময় তাঁহারা ২।১ মাস উদয়পুরে থাকেন। এই কারণ প্রত্যেক সামন্ত নরপতিদের উদয়পুরে এক একটী বাসা বাটী আছে।

উদয়পুর সহর ; একারণ এখানে সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান, দেওয়ানী ও ফৌজদারী সদর কাছারী, আপিল বিভাগ, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, রেসিডেণ্ট সাহেবের বাঙ্গালা, স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, ক্লক টাওয়ার, সরকারি বাগান, দেবমন্দির প্রভৃতি সমুদয় আছে এবং কর্ম্মোপলক্ষে সকল দেশের লোক এখানে বসবাস করে। উদয়পুর মিবারের মরুময় প্রদেশে অবস্থিত হইলেও ইহার ঠিক পার্শ্বেই উদয়সাগর থাকায় সহরে কিছুমাত্র জলকষ্ট নাই। সহরে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য। (১) সহর হাতা বা প্রাচীর ; ইহা প্রায় ২০।২৫ হাত উচ্চ এবং সহরের তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে, ইহার গাত্রে স্থানে স্থানে তোপ সজ্জিত আছে ও তিরন্দাজদিগের ভিতর হইতে বাহিরে তীর নিক্ষেপ করিবার জন্য ঘুলি সর্ব্বত্র অবস্থিত ও উহার মধ্যে মধ্যে সহরে প্রবেশ করিবার জন্য কয়েকটী ফটক আছে। (২) মহারাণার মহল ; উহা সহরের প্রান্তবর্ত্তী উদয়সাগরের উপকূলে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। মহলের মধ্যে হাতীশালা, ঘোড়াশালা, অস্ত্রাগার, রক্ষীদের স্থান, দেওয়ান আম, দেওয়ান খাস, জগ-মহল নামক আধুনিক নির্ম্মিত বিলাতি সাজ-সজ্জায় সজ্জিত মহারাণার বসিবার ঘর, অন্দরমহল প্রভৃতি অবস্থিত। কেবল অন্দর বা জেনানা ভিন্ন আর সমুদয় সাধারণকে দেখিতে দেয়। (৩) উদয়সাগর নামক দুই ক্রোশব্যাপী জলাশয় বা হ্রদ ; ইহার পূর্ব্ব পারে উদয়পুর অবস্থিত ; অপর তিন দিক্ ছোট বড় পাহাড়ের দ্বারা বেষ্টিত। সহরের এই পশ্চিম দিকে অর্থাৎ উদয়সাগরের উপকূলে মহারাণার মহল ও অন্যান্য বড়লোকদের বাটী এবং পাহাড়-টীতে জল পর্য্যন্ত বাঁধাঘাট থাকায় দেখিতে অতি সুন্দর। মহারাণার মহলের পার্শ্বে হ্রদের এক কোণে উচ্চ পর্ব্বতের উপর সুজনগড় নামক কেল্লা ও হ্রদের অপর পারে আর একটী কেল্লা পাহাড়ের উপর অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়সাগরে বেড়াইবার জন্য সকল বড়লোকদের নিজ নিজ এক একখানি বজরা উপকূলে বাঁধা আছে। সাধারণের জন্য কয়েকখানি ভাড়াটীয়া বজরা ও ডিঙ্গী আছে। এই হ্রদের মধ্যস্থলে জগ-নিবাস নামে মহারাণার শ্বেত মারবেল প্রস্তর নির্ম্মিত একটী মহল আছে। এই মহলের চতুর্দ্দিকে জল থাকায় এস্থানে নৌকা

করিয়া আসিতে হয়। মহলের মধ্যে ফল ও ফুলের ক্ষুদ্র বাগান, মধ্যে মধ্যে জলের ফোয়ারা ও বিলাসের জন্য অনেকগুলি সুসজ্জিত ঘর আছে। (৪) মহারাণার বাগানবাটী ; ইহা খুব প্রশস্ত, এখানে প্রায় সকল জাতীয় বৃক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার এক অংশে কয়েকটী পশুপক্ষী সাধারণের দর্শনের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। বাগানের অনেক স্থানেই ফোয়ারা আছে। এখানে সাধারণের প্রবেশের কোনও বাধা নাই কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের উপরিস্থিত সুজনগড়ের কেল্লা দেখিবার উপযুক্ত হইলেও উহা সাধারণকে দেখিতে দেয় না। এ সকল ভিন্ন সহরে আর বিশেষ কিছু দেখিবার নাই তবে ২।৪টী আধুনিক দেবমন্দির বেশ কারুকার্য্যখচিত ও রমণীয়।

আমি যখন উদয়পুরে পৌছিয়াছিলাম, তখন মহারাণা সহরে ছিলেন না। তিনি শিকার করিতে নাহারামাগ্‌রায় * গিয়াছিলেন। আমার উদয়পুর অবস্থিতির তৃতীয় দিবসে মহারাণা কয়েকজন সামন্তবর্গের সহিত শিকার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক শিকারী, বিস্তর জিনিষপত্র, তাঁবু প্রভৃতি আসবাব ও সর্ব্বসমেত প্রায় ২০০০ লোক আসিল। মহারাণা ঘোড়ায় চড়িয়াই মহলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিতে খর্ব্বাকার ও পাতলা ; খুব দাড়ী আছে। নাম ফতে সিংহ। ইঁহার শিকার করিবার খুব সখ, ব্যাঘ শিকারে আবার বিশেষ অনুরাগ। আমি যে বাড়ীতে ছিলাম, তাহার মালিক দেলওয়ারা রাজাও মহারাণার সহিত শিকারে গিয়াছিলেন ; সে কারণ আমার তাঁহাকেও দেখা হয় নাই। অদ্য রাত্রে আমার বন্ধু আমাকে সঙ্গে লইয়া ঝালাকুলেশ্বর দেলওয়ারা রাজার সহিত দেখা করিতে গেলেন এবং তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তিনিও মহারাণার ন্যায় কৃশ ও ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু শুনিলাম, একজন ভাল শিকারী ; এমন কি, ২।৩ বার শিকারের সময় মহারাণাকে ব্যাঘ্রকবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই ঝালাকুল চিরদিন মিবারের স্তম্ভ স্বরূপ ; হল্‌দীঘাটে ইঁহারই এক পূর্ব্বপুরুষ মহারাণা প্রতাপসিংহকে রক্ষা করিবার জন্য মোগল সেনাপতি মানসিংহের হস্তে

* নাহার শব্দের অর্থ ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্র শিকারার্থ বুরুজবিশেষকে নাহারামাগ্‌রা বলে। ইহা জঙ্গলময় পর্ব্বতগাত্রে ঝরনার নিকট নির্ম্মিত হয়। ব্যাঘ্রেরা শিকারীর ভয়ে বনমধ্যে লুক্কায়িত হইলে, শিকারিগণ ইহার উপর হইতে ব্যাঘ্র যে স্থানে লুকাইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ সেই স্থানে গিয়া, চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক ব্যাঘ্র শিকার করে। সময় সময় শিকারিগণ ইহার উপর হইতে জলপানার্থ ব্যাঘ্রগণকে শিকার করেন। কোন কোন বুরুজের পার্শ্বে শিকারী বা রাজাদের থাকিবার জন্য ছোট ছোট মহলও থাকে।

নিজ প্রাণ দেন। এখনও ঝালাকুলের পূর্ব্বের ন্যায় সেইরূপই সম্মান আছে। এ কারণ ঝালাকুলেশ্বর দেলওয়াবা রাজাকে প্রায়ই মহারাণার সহিত শিকারে যাইতে হয়। দেলওয়ারা রাজা, আমি তাঁহাব বাটীতে আছি শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং আমাকে আফিম ও বিড়ি (পান) দানে সম্মানিত করিলেন; ইহাই রাজস্থানে অভ্যর্থনা করিবার প্রথা। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, ইনি অতি সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। পরদিন প্রাতে ইনি আমাদের নিকট বিদায় লইয়া দেলওয়ারা চলিয়া গেলেন।

আমি ৫।৭ দিন মধ্যে সহরটী সমুদায় দেখিয়া লইয়া মিবারের তিনটী প্রসিদ্ধ দেবস্থান (যথা একলিঙ্গজী, চারভুজা দেবী ও শ্রীনাথদ্বার) দেখিতে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এ সময়ে রাজপুতনার এজেণ্ট সাহেব আবু পাহাড় হইতে সফরে (Tour) বাহির হইয়াছেন এবং নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে হাঁটা পথে উদয়পুর আসিবেন, এইরূপ স্থির থাকার সহরের প্রায় সমুদায় গাড়ি টঙ্গা উক্ত এজেণ্ট সাহেবের সমভিব্যাহারী লোকদের আনিবার জন্য, রাজদরবার হইতে পূর্ব্বাহ্নে ভাড়া দিয়া আবদ্ধ কবিয়া রাথায় আমরা কিছুতেই গাড়ির সুবিধা করিতে পারিলাম না। সে কারণে আমি পদব্রজে একলিঙ্গজী ও শ্রীনাথদ্বার যাইবার স্থির করিলাম; কিন্তু চারভুজাদেবী দর্শনের আশা ত্যাগ করিতে হইল। কারণ, প্রথমতঃ উহা অনেক দূর ও বিভিন্ন পথে ভীল বসতির মধ্যে অবস্থিত, তাহার উপর ঐ স্থানে যাইতে হইলে উদয়পুরের কোতোয়াল সাহেবের নিকট একজন ভীল প্রহরীর ফি জমা দিয়া দরথাস্ত কবিলে তবে তিনি একজন ভীল পুলীশ প্রহরী যাত্রীদের সঙ্গে দেন। এইরূপে ভীল প্রহরীর সঙ্গে যাত্রী যাইলে তাহাদের কিছু কষ্ট হয় না, নচেৎ পথে ভীলহস্তে সময় সময় লাঞ্ছনা ভোগ করিতে, এমন কি, ভীলের অলক্ষিত তীরে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়। আমার বন্ধু, দেলওয়ারা রাজার গাড়ি আমার জন্য যোগাড় করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আমি অসম্মত হওয়ায় তিনি অগত্যা তাঁহার পণ্ডিত প্রকাশ পাঁড়ে মহাশয়কে আমার সুবিধার জন্য সঙ্গী করিয়া দিলেন।

পাঁড়েজী মৈথিলী ব্রাহ্মণ, বেশ নিষ্ঠাবান, শ্রমসহিষ্ণু ও অত্যন্ত আমুদে লোক। আমরা দুই জনে প্রাতে ৫টার তোপ পড়িবামাত্র উদয়পুর হইতে যাত্রা করিয়া ১১ ক্রোশ হাঁটিয়া বেলা ১১টার সময় একলিঙ্গজী গড়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে দুই দিক্ হইতে দুই পর্ব্বত আসিয়া মিলিয়াছে। দেবারির ন্যায় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া রন্ধ্রপথ থাকায় এই পথের ভিতর দিকে একলিঙ্গজীগড় বা কেল্লা নির্ম্মিত

করিয়া ইহা সুরক্ষিত করা হইয়াছে। এই গড়ের দুই দিকে দুইটি ফটক আছে ও চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর। ফটকে ও প্রাচীরের স্থানে স্থানে তোপ সাজান, গড়ের মধ্যে ৩০।৪০ ঘর লোকের বসতি ও একটী প্রকাণ্ড মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে একলিঙ্গজী নামক মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত ও অপর কয়েকটী দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। মহারাণার পূর্ব্বপুরুষদের খাজনা (তহবিল) এই মন্দিরের মধ্যে থাকায় এ স্থান সর্ব্বদাই প্রহরীর দ্বারা সুরক্ষিত। এই একলিঙ্গজীগড়ই মিবারের আসল রাজপাট। এখনও মিবারের সরকারী কাগজপত্রে মিবারের রাজার নামের স্থলে শ্রীএকলিঙ্গজী নাম লেখা হয় ও মহারাণাকে দেওয়ান বলিয়া লেখা হয়। এইরূপ জয়পুর ও অপরাপর রাজ্যেও দেবতাবিশেষকে রাজা লেখা হয় এবং যথার্থ রাজাকে তাঁহার দেওয়ান বলিয়া লেখা হয়।

লিঙ্গটী খুব বড় এবং লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে ও উপরে জটামণ্ডিত ত্রিনেত্র মহাদেবের মুখ খোদিত থাকায় দেখিতে পঞ্চাননের ন্যায় অতি শোভনীয়, ঠিক যেন ভবানী-পতি সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। পূজা ও ভোগরাগেরও খুব ধুমধাম। আমরা গিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি ব্রাহ্মণ নাটমন্দিরে শতরুদ্রী পাঠ করিতেছেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে খুব ধুমধামের সহিত আরতি হইয়া গেল। মন্দিরের পূজারী ও জনৈক কর্ম্মচারী আমাদিগকে পরদেশীয় যাত্রী দেখিয়া ঐ স্থানে প্রসাদ পাইতে বলিলেন ; কিন্তু আমার সঙ্গী পণ্ডিতজী আমাকে বলিলেন যে, মহাদেবের প্রসাদ গ্রহণ করা স্মৃতিতে নিষেধ আছে এবং বিশেষতঃ ইহা রাজান্ন, সে কারণ কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমিও পণ্ডিতজীর যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ করিলাম এবং উভয়ে মন্দির হইতে বাহির হইয়া একটী বৃহৎ সরোবরের উপকূলে বৃক্ষতলে বসিয়া নিকটবর্ত্তী দোকান হইতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া জলযোগ করিলাম। পথে আসিবার পূর্ব্বেই আমরা স্নানাদি সমাপন করিয়া লইয়াছিলাম। এই স্থানে দুই ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা একলিঙ্গজীগড় হইতে বাহির হইয়া রন্ধ্রপথ দিয়া পাহাড় অতিক্রমকালীন রন্ধ্রের এক পার্শ্বের পাহাড়টী শ্বেত মারবেল প্রস্তরের দেখিতে পাইলাম। পাহাড় অতিক্রম পূর্ব্বক অসমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইবার সময় আমরা দুই দিকে অনেকগুলি ভীলগ্রাম ও দূরবর্ত্তী পর্ব্বতের স্থানে স্থানে ২।৩টী নাহারামাগ্‌রা দেখিতে পাইলাম। বেলা ৪টার সময় আমরা এক-লিঙ্গজীগড় হইতে ৩ ক্রোশ দূরে দেলওয়ারা সহরে আসিয়া পৌছিলাম এবং এই স্থানে রাত্রিবাস করিবার ইচ্ছায় সহরের মধ্যে একখানি মুদির দোকানে বাসা লইলাম।

এই সহরটিও খুব বড়; এখানে অনেক লোকজনের বাস এবং এখানে সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়; কিন্তু বড়ই জলকষ্ট। সহরের এক প্রান্তে একটী উচ্চ ভূমির উপর ঝালাকুলেশ্বর দেলওয়ারা রাজার মহল অবস্থিত। মহলটী দূর হইতে দেখিতে বেশ জাঁকজমকবিশিষ্ট ও প্রকাণ্ড। ঐ দিবসই দেলওয়ারা রাজা শিকার খেলিয়া অনেক ভীল শিকারীর সহিত ঘোটকারোহণে সন্ধ্যার সময় মহলে প্রবেশ করিলেন। আমাদের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকিলেও, এখানে আর সাক্ষাৎ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। সন্ধ্যার সময় পাঁড়েজী সন্ধ্যা করিবার জন্য জলাশয় অথবা বাউড়ীর * সন্ধানে গমনোদ্যত হইলে আমি সেই সময় নিজ বাঙ্গালী জাতীয় আলস্য স্বভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে সন্ধ্যা করিয়া ফিরিবার কালীন রাত্রের আহারের জন্য বাজার হইতে কিছু পুরী ও মিষ্টান্ন আনিতে পয়সা দেওয়ায়, তিনি বলিলেন যে, উহার আবশ্যক নাই, আমি আসিয়া রসুই করিব। ক্ষণেক পরে পাঁড়েজী সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া আমার জন্য ভাত রন্ধন করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আমি ভাবিলাম, একে আমাদের দুই জনের দুইটী লোটা ভিন্ন আর কোন পাত্র নাই এবং তাহার উপর পাঁড়েজী ভাতের ভক্ত নয়, ইহা জানিয়াও নিজের সুবিধার জন্য ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমি তাঁহার মনোমত দাল রুটির বন্দোবস্ত করিতে বলিলাম। তিনি উক্ত মুদির দোকান হইতে আটা ঘৃত মসলা ও পাতা প্রভৃতি খরিদ করিয়া, ঐ দোকানদারের একটি পাত্রে আটা মাখিয়া লইয়া কাণ্ডা বা ঘুঁটের আগুনে আমাদের একটী লোটায় দাল চড়াইয়া দিলেন ও হাতে গড়া রুটি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ১৪ ক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়া কিছুমাত্র ক্লান্ত বা বিরক্ত না হইয়া দিব্য আনন্দের সহিত ভজন গান করিতে করিতে রসুই করিতেছেন ইহা দেখিয়া, আমি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকদের শ্রমসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, আচারনিষ্ঠা ও আমাদের অলসতা, বিলাসপ্রিয়তা, আচারহীনতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

যাহা হউক, পণ্ডিতজী রসুই প্রস্তুত করিয়া অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিদেবকে সমর্পণপূর্ব্বক আমাকে আহার করিতে ডাকিলে আমরা উভয়েই আহার করিয়া সেই দোকানের রোয়াকে রাত্রের মত শয়ন করিলাম। পর দিন প্রাতে ৬টায় এখান হইতে যাত্রা করিয়া ৭ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া বেলা ১০টার সময় শ্রীনাথদ্বারে

* এক রকম চতুষ্কোণ ইঁদারা; ইহা সাধারণ ইঁদারা অপেক্ষা আকারে বড়। বিশেষতঃ ইহার এক দিক্ দিয়া জলে অবতরণ করিবার সিঁড়ি থাকে। ইহার মধ্যে কতকগুলি কেবলমাত্র পানীয় জলের জন্য ও অপরগুলি স্নানাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

আসিয়া পৌছিলাম। পথে একটী উচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়; উক্ত পর্ব্বত অতিক্রম করিবার জন্য পর্ব্বতগাত্রে বেশ সুন্দর কার্টরোড আছে। উদয়পুর হইতে শ্রীনাথদ্বার পর্য্যন্ত ২১ ক্রোশ রাস্তাই পাকা, একারণ ঘোড়ার গাড়ি গমনাগমন করিতে পারে। আমরা শ্রীনাথদ্বার সহর প্রবেশ মুখে একটী বাউড়ীতে স্নান করিয়া লইলাম। স্নান করিবার কালীন এই সহরবাসী জনৈক ব্যক্তিকে শ্রীনাথজীউর দর্শনের সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় জ্ঞাত হইলাম যে, এখনই মন্দিরে গমন করিলে শ্রীভগবানের দর্শন পাওয়া যাইবে; কারণ, বেলা ১১টার সময় একবার দর্শন পাওয়া যায়। ভোর ৪টার সময় মঙ্গল আরতি হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্র ৯টার শয়ন আরতি পর্য্যন্ত শ্রীনাথজীউর ৭ বার ঝাঁকি বা দর্শন পাওয়া যায়। সাতবার সাত রকম বেশ অর্থাৎ শৃঙ্গার হয় এবং প্রত্যেক বেশই নূতন। শ্রীনাথজীউর অঙ্গে একটি পোযাক দুইবার ধারণ করাইবার নিয়ম নাই।

আমরা শীঘ্র স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া সহরের মধ্য দিয়া শ্রীনাথজীউর মন্দিরের পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে উক্ত মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটী খুব বড়, তিন চার মহলে বিভক্ত, মন্দিরের উপরে কোনরূপ চূড়া নাই। প্রথম ফটকের দুই দিকে দুইটী হস্তীর মূর্ত্তি দেওয়ালে খোদিত আছে। আমরা এই ফটক দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রহরীদের থাকিবার স্থান, মন্দিরের সরকার মুহুরীদের থাকিবার স্থান এবং অপরাপর চাকরবাকর ও কর্ম্মচারীদের স্থান পার হইয়া দ্বিতীয় ফটকে পৌছিলাম। এই ফটকের উপর নহবতখানা, ইহাতে প্রহরে প্রহরে নহবত বাজাইবার বন্দোবস্ত আছে ও ফটকেও প্রহরী নিযুক্ত আছে। এই ফটকের ভিতর আর ছড়ি ছাতা জুতা বা পোটলা পুঁটলি লইয়া যাইবার নিয়ম নাই।

আমরা এই স্থানে প্রহরীর নিকট আমাদের দ্রব্যাদি রাখিয়া উক্ত ফটকের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই ফটকের পরই বাম দিকে এই মন্দিরের মালিক গোস্বামীদের থাকিবার বাটী। এ বাটীও খুব সুসজ্জিত; ইহার মধ্যে ঠাকুরের তোষাখানা, দপ্তরখানা প্রভৃতি থাকায় এ বাটীর দ্বারেও প্রহরীর বন্দোবস্ত আছে। যে সকল যাত্রী শ্রীনাথজীকে কিছু ভেট দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এই স্থানে দপ্তরখানায় উহা জমা দিতে হয়। এই মহলের দ্বারদেশে শ্রীবিগ্রহের বর্ত্তমান সেবায়েত গোস্বামীজীকে দেখিতে পাইলাম। ইনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত, বল্লভাচারী গোস্বামী বংশ, বেশ সুশ্রী যুবা পুরুষ, দেখিতে খুব বিলাসী, পরিধানে বারাণসী জোড়, হস্তে গলায় ও কাণে জহরতের অলঙ্কার, পায়ে রূপার

খড়ম। আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি আমাদের সহিত বেশ মিষ্টালাপ করিলেন এবং আমাদিগকে মন্দিরে প্রসাদ পাইবার জন্য বলিলেন। ইনিই এই মঠের (গদির) মালিক, এ কারণ, শ্রীনাথজীউর সমুদায় ধন সম্পত্তি ইঁহারই অধীন। এই মহলের পার্শ্বেই শ্রীনাথজীউর মহল, একটী সিঁড়ি দিয়া উঠিলেই এই মহলের দ্বারে পৌঁছান যায়। দ্বারের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ডান হাতি গলি পথে যাইলে এই মন্দিরসংলগ্ন আর একটী মহলে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীনাথজীউর ভূতপূর্ব্ব সেবক বা গোস্বামীদের মধ্যে কয়েকজন মহাত্মার, এই বিগ্রহের প্রথম প্রতিষ্ঠাতার এবং এই সম্প্রদারের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবল্লভাচার্য্যের গদি বর্ত্তমান আছে। অধুনা বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শ্রীনাথদ্বার মঠই সর্ব্বপ্রধান। এই সকল গদির রীতিমত ভোগরাগ ও আরতির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানের আসবাব আদি সমুদায় বহুমূল্য এবং চতুর্দ্দিকে রজত কাঞ্চনের ছড়াছড়ি।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীনাথজীউর মহলের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমে একটী আঙ্গিনা পাওয়া যায়। আমরা এই উঠানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, অনেক যাত্রী শ্রীভগবান্ দর্শনার্থে বসিয়া আছে ও সমস্বরে ভজন গান করিতেছে। আমরাও উক্ত গান শুনিতে শুনিতে ভগবৎপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া উহাদের সহিত ২।৩টী ভজন গান গাহিলাম। এই প্রাঙ্গনের দুই দিকে দুইটী দ্বার আছে। একটী দ্বার সে সময়ে বন্ধ ছিল, ঐ দ্বারের মধ্যেই শ্রীভগবানের মহল। অন্য দিকে দ্বারটী খোলা ছিল; আমরা উক্ত দ্বার দিয়া ভগবানের বসুই মহলে প্রবেশ করিলাম। এটি ভোগের মহল বলিয়া ইহার উঠান ভিন্ন অপর কোন স্থানে যাত্রীদের যাওয়া নিষিদ্ধ। উঠানের চতুর্দ্দিকে শাক তরকারি প্রভৃতি পড়িয়া আছে। সেবা-কার্য্যে লোক-জনের যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকিলেও অনেক যাত্রী নিজ হস্তে শ্রীভগবানের সেবার জন্য ঐ সকল শাক তরকারি আমনিয়া (কোটাবাছা) করিতেছে। এক-কারণ বটি, থালা, হাত ধুইবার জন্য জলপাত্র প্রভৃতির বন্দোবস্ত আছে। শ্রীভগ-বানের ভোগের জন্য এখানে নানা প্রকারের কাঁচা ও পাকা অন্ন এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় যে, এক শ্রীক্ষেত্র ভিন্ন ভারতের অপর কোন দেবস্থানে এরূপ হয় না। এখানকার প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীনাথজীউর ভোগের মসলার জন্য প্রত্যহ কেশর ও কস্তুরীতে মিলাইয়া ৵১০ পরিমাণে লাগে। এখনও সর্ব্বত্রই বল্লভাচারী বা গোকুলিয়া গোস্বামীদের দেবসেবার সুন্দর বন্দোবস্ত এবং ভোগরাগের বাহুল্য ও পারিপাট্যের জন্য প্রসিদ্ধি আছে।

আমরা উক্ত রসুই মহল দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত উঠানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, শ্রীনাথজীর মহলের দ্বার খোলা হইয়াছে এবং যাত্রিগণ প্রবেশ করিতেছে। আমরাও উক্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া একটী উঠানে পৌঁছিলাম। উঠানের ডান দিকে একটী দালান ও উহার বাম পার্শ্বে শ্রীনাথজীউর ঘর। আমরা দালানে উঠিয়া দেখিলাম যে, বামপার্শ্বস্থ ঠাকুর ঘরের দ্বার খোলা হইলেও উহা সাটিনের পর্দ্দা দ্বারা আবৃত আছে। শীঘ্রই উক্ত পর্দ্দা অপসারিত হইয়া শ্রীনাথজীউর ভোগ আরতি আরম্ভ হইল। আরতি ও পূজার সমুদায় দ্রব্যাদি সুবর্ণনির্ম্মিত ; ভোগ সমুদায় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে থাকায় কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না। দর্শন পাইবামাত্র যাত্রিগণ পয়সা সিকি আধুলি টাকা দেবদর্শনী স্বরূপ ফেলিয়া দিতে লাগিল। ঠাকুর ঘরের একটী মাত্র দ্বার দিয়া দর্শন করিতে হয় বলিয়া যাত্রীদের মধ্যে বড়ই ঠেলাঠেলি হইয়া থাকে। একারণ ঐ সকল দর্শনী কতক ঠাকুর ঘরের ভিতর পড়িতেছে, কতক বাহিরের দালানে যাত্রীদের মধ্যেই পড়িতেছে ; কিন্তু মন্দিরের লোকদের এ সময়ে প্রণামী কুড়াইবার হুকুম না থাকায় সে জন্য কোনরূপ হৈ চৈ বা বিশৃঙ্খলা হয় না। আমরা কষ্টে সৃষ্টে দ্বারের নিকট একটু স্থান অধিকার করিয়া ভক্তিভাবে অনন্যমনে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলাম।

গৃহের সম্মুখবর্ত্তী ভিত্তিসংলগ্ন বেদিকার উপরিস্থিত সুবর্ণময় পাদপীঠের উপর এই শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় বিরাজিত। শ্রীঅঙ্গ সুবর্ণ ও জহরতের অলঙ্কার দ্বারায়, সল্‌মা চুমকির কারুকার্য্যখচিত সাটিন্ মখ্‌মল্ প্রভৃতি বস্ত্রের পায়জামা ও অঙ্গরাখা (চাপকান্) দ্বারা এবং কেশর ও হরিচন্দনের অলকা তিলকা দ্বারা শোভিত হইয়া দেখিতে অতি কমনীয়। এই বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি হইলেও প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির ন্যায় ইঁহার অধরে বংশী নাই, এবং পদদ্বয় পরস্পর জড়িত ও ত্রিভঙ্গ ঠামে অবস্থিতও নহে, তবে ত্রিভঙ্গ ঠামের কতকটা আভাস আছে। এই শ্রীমূর্ত্তি উর্দ্ধে দেড় হাত উচ্চ হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীজগন্নাথ উভয় মূর্ত্তির ভাব সম্মিলনে নির্ম্মিত। জহরতের মুকুট শোভিত মুখারবিন্দ দেখিতে ঈষৎ বড় হইলেও ভাব অতি চমৎকার, অনেকটা পুরুষোত্তমস্থ জগদীশের সহিত সাদৃশ্য আছে। বিশেষতঃ কটাক্ষ (নয়নভঙ্গী) ঠিক যেন জীবন্ত, দেখিবামাত্র রোমাঞ্চিত হইতে হয় এবং অতি পাষণ্ডের মনেও ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। শ্রীমূর্ত্তির বাম হস্ত বাম কক্ষে সংলগ্ন ও দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধদিকে বক্রভাবে প্রসারিত। পদদ্বয় পরস্পর পৃথক্ ভাবে অবস্থিত। শ্রীমূর্ত্তি যুগলে অবস্থিত নহে অর্থাৎ বামে শ্রীরাধা লক্ষ্মী বা নারায়ণী

কোন মূর্ত্তিই নাই এবং আশে পাশেও আর কোন মূর্ত্তি নাই। ইতিমধ্যে আরতি সমাধা হওয়ায় পট বন্ধ হইয়া গেল, আমরাও যাত্রীদের সহিত উক্ত মহল হইতে বাহির হইয়া বহিঃপ্রাঙ্গনে প্রসাদ পাইবার জন্য বসিয়া রহিলাম।

শ্রীনাথজীউর প্রকট প্রচার সম্বন্ধে দুইটী লোকমত প্রচলিত আছে :—

(১) মিবারের মহারাণী মীরাবাই ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক, ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থান দেখিতে আইসেন এবং ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে হরিদাস স্বামী ও ব্রজের অপরাপর গ্রামে অপরাপর বৈষ্ণব মহাত্মাদের সহিত শ্রীভগবানের ভজনগান ও ভগবৎপ্রসঙ্গ করিয়া বেড়াইতেন ; এই সময়ে তিনি ব্রজভূমিস্থিত এই শ্রীনাথজীর বিগ্রহ দর্শনে বড়ই আকৃষ্ট হন এবং অনেক দিন ইঁহার সেবা ও উপাসনা করেন। শ্রীভগবানও তাঁহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া মিবারে যাইতে প্রতিশ্রুত হন। একারণ পরস্পরে এইরূপ সত্যবদ্ধ হয় যে, যাত্রা-কালীন শ্রীভগবান্ যে তাঁহার পিছু পিছু আসিতেছেন, ইহা মীরা ভগবানের পায়ের নুপুরধ্বনি শ্রবণে বুঝিতে পারিবেন ; কিন্তু মীরা পিছু ফিরিয়া দেখিলেই আর তিনি গমন করিবেন না। মীরা এই অঙ্গীকারে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে লইয়া মিবারের রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বরাবর নুপুরের ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু মিবারের মরুময় প্রদেশে শ্রীভগবানের পায়ের নুপুরে বালি প্রবেশ করায় শব্দ বন্ধ হইলে মীরা সন্দেহ প্রযুক্ত পিছু ফিরিয়া দেখায় শ্রীভগবান্ ঐ স্থানে বিরাজ করিলেন। এই কারণে মীরা ঐ স্থানেই শ্রীভগবানের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এবং সেবার জন্য অনেক ধনরত্ন ও ভূসম্পত্তি মহারাণার নিকট হইতে দেওয়াইয়া নিজ গুরু বল্লভাচারী গোস্বামীদের হস্তে উহার সমুদায় ভার অর্পণ করেন।

(২) ব্রজে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পার্শ্বস্থ জ্যোতিঃপুরা গ্রামে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের তদানীন্তন প্রধান মঠে এই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আরঙ্গজেব বাদশাহ যখন মথুরা ও বৃন্দাবনস্থ দেবমন্দির সকল ভাঙ্গিতে আইসেন এবং যখন ঐ সকল দেবমন্দিরের সেবায়েতেরা নিজ নিজ দেবমূর্ত্তি লইয়া রাজস্থানের বিভিন্ন রাজ্যে পলাইতে লাগিলেন ; তখন বল্লভাচারী গোস্বামীরাও আরঙ্গজেবের ভয়ে এই জ্যোতিঃপুরাস্থ মঠ হইতে সমুদায় ধন সম্পত্তির সহিত শ্রীনাথজীউকে লইয়া মিবার রাজ্যের এই স্থানে পলাইয়া আইসেন ও এই স্থানে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ

করিয়া উক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মিবারের মহারাণাও স্বীয় এলাকাভুক্ত এই শ্রীনাথদ্বার সহর ও অপর অনেক ভূসম্পত্তি শ্রীনাথজীউর নামে লিখিয়া দেন।

এখনও এইরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, শ্রীনাথজীউর ঘরের নীচে সাত ক্রোর টাকা মূল্যের রত্নাদি ধনসম্পত্তি পোতা আছে। পূর্ব্বোক্ত দুইটী মতের মধ্যে শেষোক্ত মতটী সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এ বিষয় কোন পুস্তকাদিতে কিছু লেখা নাই। মাননীয় ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, "বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথদ্বারের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ মঠের বিগ্রহ পূর্ব্বে মথুরায় ছিলেন, আরঙ্গজেব বাদশাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি দিলে পর ঐ সর্ব্বান্তর্যামী বিগ্রহ তথা হইতে এই স্থানে আইসেন।" উক্ত পুস্তকে 'আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথদ্বার' কি হিসাবে লেখা হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। যদিচ আজমীর পূর্ব্বে মিবারের একটা পরগণা ছিল, কিন্তু শ্রীনাথদ্বার আজমীর পরগণা হইতে বহুদূরে ও ভিন্ন পরগণায় অবস্থিত। আরও আমি নিজে মথুরায় অবস্থান কালীন তথায় শ্রীনাথজীর পুরাতন মন্দিরের সম্বন্ধে কিছুমাত্র জনশ্রুতি শুনি নাই। আরঙ্গজেব মথুরায় কেবলমাত্র কেশবদেবের মন্দির ভগ্ন করিয়াছিলেন, আর কোন মন্দির ভগ্ন করেন নাই।

যাহা হউক অল্পক্ষণ পরে মন্দিরের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীভগবানের বিভিন্ন প্রকারের কাঁচা যথা ভাত, তরকারি, রুটি ও পায়সাদি ও পাকা যথা পুরি, কচুরি ও মিষ্টান্নাদি প্রসাদ আমাদের জন্য লইয়া আসিলেন। প্রসাদ যে কত প্রকার, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভাত, দাল, নানান রকম শাক বা তরকারি, দধি, পায়স, রুটি, মোহনভোগ ও বিবিধ প্রকারের মিষ্টান্ন প্রভৃতি সকল দ্রব্যই অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়াছে। অধিকন্তু মোহনভোগ প্রভৃতি মিষ্টান্ন হইতে কেশর ও কস্তুরীর গন্ধ নির্গত হইয়া সমুদায় স্থান আমোদিত করিতেছে। এরূপ সুন্দর ও অর্থব্যয়বহুল ভোগ বোধ হয় রাজা রাজড়ার ঘরেও তৈয়ারী হয় না এবং আমি নিজেও আর কোন দেবসেবায় এরূপ উত্তম ভোগের বন্দোবস্ত দেখি নাই। বিশেষতঃ এখানকার অন্নকূট যাত্রা পার্ব্বণে যেরূপ ভোগ ও ধুমধাম হয়, সেরূপ ভারতের আর কোন স্থানে হয় না এবং এত অধিক যাত্রীর সমাবেশ হয় যে, সেরূপ যাত্রীও সচরাচর কোন স্থানে সমবেত হইতে দেখা যায় না। আমরা অপরাপর অনেক যাত্রীর সহিত ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীভগবানের প্রসাদ পাইয়া অতিশয় পরিতোষ লাভ করিলাম এবং এই স্থানে ৩।৪ দিন থাকিবার ইচ্ছায়

ধরমশালার উদ্দেশে মন্দির হইতে বাহির হইলাম। মন্দির হইতে বাহির হইয়া দেখি, রাস্তার দুই দিকে শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় দোকানে শ্রীভগবানের ভোগের প্রসাদ সকল বিক্রয় হইতেছে ; কিন্তু ঐ সকলই পাকা প্রসাদ, শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় ভাত দাল প্রভৃতি কাঁচা প্রসাদ মন্দিরের বাহিরে যাইবার নিয়ম নাই। প্রসাদের মূল্য বাজার দর অপেক্ষা অনেক কম, কারণ, শ্রীভগবানের জন্য এত প্রচুর পরিমাণে নিত্যভোগ তৈয়ারি হয় যে, ক্রেতার অভাবে তাহা অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। শ্রীনাথদ্বার সহরটী নিতান্ত ছোট নয়, এখানে রীতিমত দোকানী পসারী লোকজন ও সহরের অন্যান্য সমুদায় বন্দোবস্তই আছে।

আমরা মন্দির হইতে অল্পদূর যাইয়াই ধরমশালায় পৌছিলাম। ধরমশালাটী দোতলা, চতুর্দ্দিকে চক্‌মিলান, উপর নীচে অনেকগুলি দালানওয়ালা ঘর আছে। মধ্যের উঠানটীও খুব প্রশস্ত, তথায় রাত্রে আলো দিবার জন্য আলোকস্তম্ভ আছে। ইহার মধ্যে জলের জন্য ইঁদারা, শৌচাদি ত্যাগের পৃথক্ স্থান ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত আছে। এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাব ও সুবন্দোবস্ত অন্য কোন ধরমশালায় সচরাচর দেখা যায় না। শ্রীনাথদ্বারের গোস্বামীজী গুজরাটী সেবকদের অর্থসাহায্যে সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই ধরমশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এ সময় কোন পালপার্ব্বণ ছিল না, তত্রাচ এই স্থান লোকে পূর্ণ। যাত্রীর মধ্যে গুজরাটী যাত্রীর সংখ্যাই অধিক ; কারণ, গুজরাটের অধিকাংশ লোক বল্লভাচারী গোস্বামীদের শিষ্য এবং এই মঠ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ বলিয়া বল্লভাচারী দলভুক্ত সকলেই একবার এই স্থান দর্শন করিতে আইসেন। আমরা ধরমশালার নীচের একটিমাত্র ঘর খালি থাকায় তথায় বাসা করিলাম। এখানে শ্রীনাথজীউর নানা প্রকার ভোগ বিক্রয়ার্থ আইসে। বৈকালে বৈকালিক ভোগ বিক্রয় করিতে আসিলে আমরা ৵১০ পয়সা দিয়া দুই পাতা প্রসাদ খরিদ করিলাম, ইহাতে অনেক রকম ফলমূল ও মিষ্টান্ন ছিল। এই মরুদেশে ফলমূল দুষ্প্রাপ্য হইলেও শ্রীনাথজীউর সেবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ফলমূল আমদানি হইয়া থাকে।

তিন দিবস আমরা পরমানন্দে শ্রীনাথজীকে বহুবার দর্শন করিয়া ও ভোগের নানা রকম প্রসাদ পাইয়া, চতুর্থ দিবস প্রাতে এ স্থান হইতে উদয়পুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য গাড়ির অনেক অনুসন্ধান করিলাম ; কিন্তু এক উট ভিন্ন আর কোন সোয়ারি পাওয়া গেল না। কিন্তু আমি উটে যাইতে স্বীকার হইলেও আমার সঙ্গী পণ্ডিতজী কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, উট অতি ভীতু

জন্তু ; উহারা সামান্য কারণেই ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠে ও আরোহীকে ফেলিয়া দেয়। পূর্ব্বে একবার তাঁহার এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল অতএব তিনি পদব্রজেই যাইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। অগত্যা আমরা পদব্রজে যাওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু পূর্ব্বে যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথে ফিরিতে গেলে ২১ ক্রোশ হাঁটিতে হইবে, এ কারণ এখান হইতে ৭ ক্রোশ কাঁচা রাস্তা চলিয়া মাবলী ষ্টেসনে পৌছিয়া তথা হইতে রেলযোগে উদয়পুর যাইবার স্থির হইল। যাত্রার পূর্ব্বে আর একবার শ্রীনাথজীউর দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীনাথদ্বার সহর হইতে প্রায় বেলা ৮টার সময় মাবলির দিকে যাত্রা করিলাম। সহরের বাহিরে আসিয়া শ্রীনাথজীর গোশালা দেখিতে পাইলাম। এখানে সেবক ও যাত্রীদের প্রদত্ত প্রায় ১০০০ বা ১৫০০ গাভী আছে। শ্রীনাথজীর ভোগের দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, ক্ষীর সমুদয় এই গোশালার দুগ্ধে প্রস্তুত হয়।

একে কাঁচা পথ, তাহাতে আবার মরুভূমি। সুতরাং চলিবার কালীন পা বালির ভিতর বসিয়া যাইতেছে ও প্রত্যেক পদবিক্ষেপে পা টানিয়া তুলিতে হইতেছে। তাহার উপর বালির মধ্যে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের প্রস্তরখণ্ড সকল চাপা থাকায় পায়ে আঘাত লাগিতেছে। বেলা বৃদ্ধি হওয়ায় রৌদ্রের তেজও অসহ্য হইতে লাগিল, একারণ আমরা অতি কষ্টে ৩ ক্রোশ চলিয়া পথপার্শ্বস্থ একটী গ্রামে প্রবেশ করিলাম। তখন বেলা প্রায় ১১টা হইবে অতএব আমরা এই স্থানে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলাম। এখানেও পণ্ডিতজী এই গ্রামস্থ মুদির দোকান হইতে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া ঐ বৃক্ষমূলে আহারের জন্য দাল রুটি প্রস্তুত করিলেন। আমরা উভয়ে আহারান্তে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এখান হইতে ৪ ক্রোশ হাঁটিয়া যাহাতে সন্ধ্যার মধ্যে মাবলি পৌছিতে পারি, সেজন্য রৌদ্রের প্রখর তেজ সত্ত্বেও আমরা বেলা ৩টার সময় বাহির হইলাম। কিন্তু অতি কষ্টে ১ ক্রোশ চলিয়াই পুনরায় এক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলাম। এস্থান ফাঁকা, চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্তপ্ত বাতাস লাগায়, অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। কি করিয়া যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাবলি পৌছিব, ইহাই ভাবিয়া শ্রীনাথজীকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। এমন সময় এক খানি খালি গরুর গাড়ি আমাদের নিকট দিয়া মাবলির দিকে যাইতেছে দেখিতে পাইলাম। ইহা নিশ্চয় শ্রীভগবানের অনুগ্রহ জানিয়া আমরা ঐ গাড়ির গাড়োয়ানকে মাবলি যাইবার ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইল, আমরাও গাড়িতে চড়িয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাবলি পৌছিলাম। মাবলি ষ্টেশনের নিকটেই যাত্রীদের থাকিবার

জন্য একটী একতলা ধরমশালা আছে। ইহার মধ্যেই যাত্রীদের সুবিধার জন্য খাবার দাবার দোকান ও মুদিখানা আছে। নিকটেই কুয়া থাকায় জলের কোন কষ্ট নাই। আমরা এই ধরমশালায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন রেলযোগে দেবারি হইয়া উদয়পুরে গমন করিলাম। মাবলি হইতে শ্রীনাথদ্বার কাঁচা রাস্তা, এ কারণ, এ পথে গোরুর গাড়ি ভিন্ন আর কোনরূপ সোয়ারি পাওয়া যায় না, তবে বিশেষ চেষ্টা করিলে ডুলি বা পালকী পাওয়া যায়, তাহাও পূর্ব্বাহ্নে শ্রীনাথদ্বারে সম্বাদ দিয়া আনাইয়া লইতে হয়।

সন্ধ্যার প্রদীপ।

হের দেখ জ্বলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার
দেবরূপ দৃশ্য ধরা পরে
চারি দিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার,
আলো-দ্বীপ আঁধার সাগরে।
ললিত লীলায় কায়,
হেলে দুলে বিনাবায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয় যেন কোন দেব বিদ্যমান।

দূর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আঁধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন
জবা যেন যমুনার নীরে;
আঁধারের কাল কায়,
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্তমাখা ক্ষতস্থান হেন,
কাল কেশে কামিনীর পদ্মরাগ যেন।

জ্বালিয়া প্রদীপ ঝাঁপি বসন অঞ্চলে,
রূপসী প্রবেশে নিজ পুর,
রক্ত আভা মাখা রক্ত বদন মণ্ডলে,

রক্ত শিখা সীমন্তে সিন্দুর ;
চঞ্চল নয়নে চায়,
প্রদীপ চঞ্চল বায়,
পায় পায় কাঁপে স্তন শিখা মনোলোভা
কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা ?

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার বনে
নদী পারে প্রদীপ সন্ধ্যার
প্রিয়া মুখ ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে,
যেন শিশু সুত বিধবার,
হয়ে গেছে সর্ব্বনাশ,
আছে এক মাত্র আশ
হেন নর হৃদয়ের দেখায় আভাস
মেঘের মণ্ডলে যেন মঙ্গল * প্রকাশ।

ক্রমে ঘোর হয়ে এল সন্ধ্যার অম্বর,
পান্থ অতি ক্লান্ত পর্য্যটনে,
অজানিত দেশে শুধু চৌদিকে প্রান্তর,
দামিনী চমকে ক্ষণে ক্ষণে,
হেন কালে হেন স্থলে,
দূরে সন্ধ্যা দীপ জ্বলে,
পথিকের প্রাণে পুন আশার সঞ্চার,
সে জানে কি বস্তু তুমি প্রদীপ সন্ধ্যার।

বদনের কাছে বাতি জননী তুলায়,
খল খল হাসে শিশু তায়,
আভায় আভায় মিশে' শোভায় শোভায় !
হেরে' মাতা স্নেহের নেশায়।
আগারে বালক মেলা,
ছায়া ধরাধরি খেলা,
হেরে' প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন,
ছায়া ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন !!

ঋষিকবি ৺ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

---

* মঙ্গলগ্রহ।

যোগি-দর্শন।

(শ্রীহরিপদ মিত্র।)

ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী প্রবন্ধের দ্বারা স্বামীজির সহিত আমার কিরূপে সাক্ষাৎকার লাভ ও তদ্দ্বারা আমার স্বভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের অনেক পরিবর্ত্তন হয়, উদ্বোধন পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। তাঁহার বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে নানা উপদেশও স্মৃতি ও ডায়েরী হইতে যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজী পাঠ করিয়া সহজে কোন বিষয় বিশ্বাস হইত না। অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কোন বিষয় শুনিলে বা পড়িলে তাহা ঠাকুর মার গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। স্বামীজির ন্যায় অসামান্য মহাপুরুষের সঙ্গলাভে যদিও একঘেয়ে বুদ্ধি অনেকটা দূর হইয়াছিল, তথাপি যখন স্বামীজির 'রাজযোগ ও পাতঞ্জল যোগসূত্রের ইংরেজী অনুবাদ' পড়িলাম, তখন উহার মধ্যে কথিত ব্যাপার গুলি এত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল যে, বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হইল না। একদিকে মন বলিতে লাগিল, আমি এ গুলি বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া যে এগুলি মিথ্যা, তাহা কখনই হইতে পারে না, সত্য হইলেও হইতে পারে। অপর দিকে আবার ঐ গুলি এত অসম্ভব ও প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ বোধ হইল যে, সহজে কোন মতে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

আমার চিত্ত এইরূপ সন্দেহদোলায় দোলায়মান, এমন সময়ে জনৈক যোগীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার কয়েকটী অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে দু চারটী কথা বলাই বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তখন আমি সিন্ধুদেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছি। আমার জনৈক মান্দ্রাজী বন্ধু পূর্ব্বে নাসিকে এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন, সম্প্রতি বদলি হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি নাসিকে অবস্থান কালে হনূমানানন্দ নামক জনৈক যোগীর সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার অলৌকিক গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়েন। সম্প্রতি তিনি উক্ত যোগীকে হায়দ্রাবাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। জনতাপূর্ণ স্থানে তিনি থাকিতে ভালবাসিতেন না বলিয়া সহর হইতে ২ মাইল দূরে ফুলেলা কেনালের ধারে একটী ভদ্রলোকের বাগানের মধ্যে একটী ছোট ঘরে তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হয়। আমার বন্ধু যোগবিভূতি সম্বন্ধে আমার মনের

সংশয় অবগত হইয়া আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করেন। স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর যোগী সন্ন্যাসীর প্রতি আমার পূর্ব্বের ন্যায় অবিশ্বাস ছিল না। সুতরাং আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলাম। একদিন অবকাশ মত একলাই তাঁহার নিকট গমন করিলাম। একাকী যাইবার কারণ এই, আমার বন্ধু উক্ত যোগীর প্রতি যেরূপ ভক্তিসম্পন্ন, আমার যদি তাঁহার প্রতি সেইরূপ ভক্তি না হয়, তাহা হইলে বন্ধুটীর বিশেষ কষ্ট হইবে। আমার নিজের ইহা বিশেষ জানা ছিল। স্বামীজিকে দেখিয়া বা তাঁহার বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া যদি কাহারও ভক্তি না হইত, তাহা হইলে প্রথম প্রথম আমার অতিশয় রাগ ও দুঃখ হইত।

আমাকে দেখিয়াই স্বামীজি উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার আসনের নিকট বসাইলেন ও বলিলেন, "কেও বাবা আচ্ছা হো, হাম বহুৎ খুস হুয়া, বহুৎ রোজ পিছে আজ বাঙ্গালী লোক দেখা।" বলা বাহুল্য যে, আমার যেরূপ পোষাক ছিল, তাহাতে সহসা আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া চেনা বড় সহজ ছিল না। আমিও প্রথমে তাঁহাকে হিন্দুস্থানী বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম, পরে জানিতে পারিলাম, তিনি বাঙ্গালী—বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গবাসী। বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশী হইবে না। দেহ শীর্ণ কিন্তু চক্ষু উজ্জ্বল—দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। কেশ দীর্ঘ, গণ্ডদেশে দীর্ঘশ্মশ্রু—তবে জটাজূট নাই। তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল যে, শরীরটার উপর যেন তাঁহার বিশেষ খেয়াল নাই। সম্বলের মধ্যে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম, একটী কমণ্ডলু ও একখানি কাপড়ে বাধা ঢ একখানি পুস্তক।

তাঁহার সহিত আমার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আমি তাঁহাকে স্বামীজির কথা বলাতে তিনি পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় আমারও পরম আনন্দ হইল। দেখিলাম, যদিও তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহাজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষ নহেন, তথাপি তিনি একজন প্রকৃত যোগী পুরুষ। এই অবধি অবকাশ পাইলেই আমি তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম। তিনি আমার নিকট হইতে স্বামীজির গ্রন্থাবলী লইয়া পরম আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। ক্রমশঃ দেখিলাম, তিনি হঠযোগে কৃতকার্য্য হইয়া রাজযোগ অভ্যাস করিতেছেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহা স্বামীজির উপদেশের সহিত সম্পূর্ণ মিলিত। ভগবৎপ্রসঙ্গে ভাবে গদ গদ হইয়া সময় সময় এত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন যে, তাহাতে তাঁহার আসন পর্য্যন্ত সিক্ত হইত। তিনি বলিতেন, হঠযোগ গুরুর নিকট শিখিতে হয়। উহা অভ্যাস করিতে হইলে

উর্দ্ধরেতা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। যাহাদের কোনরূপে রেতঃপাত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে হঠযোগ অভ্যাস বড়ই কঠিন ও বিপৎসঙ্কুল। যাহা হউক অভ্যাসের দ্বারা এই হঠযোগ অতি সহজ হইয়া থাকে। অষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি এই মাত্র বলিতেন যে, এ গুলি কিছুই অসম্ভব নহে। তবে যাহাদের ঐরূপ সিদ্ধি লাভ হইযাছে, তাহাদের সাধারণকে চমৎকৃত করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল সিদ্ধি প্রদর্শন করা উচিত নয়।

একদিন আমরা কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া তাঁহার যোগশক্তি দেখিবার জন্য অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে দেখিলাম। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও আমাদের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত তিনি স্বীকৃত হইলেন। পরদিন প্রাতে ছয়টার সময় দশ বার জন গ্রাজুয়েট বন্ধু মিলিয়া (আমাদের মধ্যে এল, এম, এস্‌ও ছিলেন) যোগি-দর্শনে যাত্রা করিলাম। তিনি প্রথমতঃ নানা প্রকার আসনাদি করিয়া দেখাইলেন যে, শরীরের সমুদয় স্নায়ু পেশী প্রভৃতি তাঁহার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত। আমাদের ডাক্তার বন্ধুটী ত দেখিয়া অবাক্। তিনি ইচ্ছাক্রমে যকৃতের স্থানে প্লীহা ও প্লীহার স্থানে যকৃৎ লইয়া যাইতে পারিতেন। গুহ্য দ্বার দ্বারা ঠ এক কলসী পর্য্যন্ত জল আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিতেন; এক টুকরা চব্বিশ হাত লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া মলমল কাপড় লইয়া সমুদয় গলাধঃকরণ করিয়া পাকস্থলী ধৌত করিতেন; কুম্ভকের দ্বারা আসন ছাড়িয়া ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত শূন্যে উঠিতে পারিতেন। তিনি এই রূপ অশেষবিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল আমাদিগকে দেখাইলেন ও অবশেষে বলিলেন যে, এই সকল ক্রিয়া কেবল শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য, হঠ যোগের দ্বারা রাজ যোগের সহায়তা হইয়া থাকে মাত্র।

তিনি কাহারও নিকট অর্থাদি গ্রহণ করিতেন না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সহরে বেড়াইবার জন্য আনিতে পারি নাই। বাঙ্গালা, ইংরেজী ও সংস্কৃত এই তিন ভাষাতেই তাঁহার একরূপ বেশ অধিকার ছিল। ইহাঁর সহিত সাক্ষাতের পর যোগশাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে আমার আর কোন সংশয় নাই। শুনিয়াছি, তিনি হরিদ্বারে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্র ।*

(১)

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
নক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্ ।
মোহঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ১ ॥

ভক্তিং ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গচ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্ ।
বক্ত্রোদ্ধৃতোঽপি হৃদয়ে ন মে ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ২ ॥

তেজস্তরন্তি ত্বরিতং ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রাগং কৃতে ঋতপথে ত্বিহ রামকৃষ্ণে ।
মর্ত্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্ম্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৩ ॥

কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণান্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ ।
যস্মাদহং অশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো ! ৪ ॥

---

(২)

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ঃ যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্ ।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥ ১ ॥

স্তব্ধীকৃত্বা প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তম্
হিত্বা দূরং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্ ।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥ ২ ॥

---

* এই স্তোত্রদ্বয় এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী সঙ্গীত স্বামী বিবেকানন্দ রচিত ।

রামকৃষ্ণ আরাত্রিক।

মিশ্র—চৌতাল।

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়। (১)
নিরঞ্জন, নররূপধর নির্গুণ গুণময়॥
মোচন অঘ-দূষণ জগভূষণ চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন, বীক্ষণে মোহ যায়॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির উন্মদ প্রেম পাথার।
ভক্তার্জ্জন যুগল চরণ তারণ ভব-পার॥
জৃম্ভিত যুগ ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগ সহায়।
নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায়॥
ভঞ্জন দুঃখ গঞ্জন করুণা ঘন কর্ম্ম কঠোর।
প্রাণার্পণ জগত তারণ কৃন্তন কলি ডোর॥
বঞ্চন কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয় রাগ।
ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ॥
নির্ভয় গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান্।
নিষ্কারণ ভকত শরণ ত্যজি জাতি কুল মান॥
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ বারি যথায়।
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায়॥

---

(১) পূর্ব্বে গানটি নিম্নলিখিত ভাবে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু সুরের বিভিন্নতা জন্য সাধারণ গায়কের পক্ষে গীতটি কঠিন হইয়া উঠে। সেই জন্য স্বামীজি পরে উহার পরিবর্ত্তন করেন।

২য় লাইন———নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনবচনৈকাধার,
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমভঞ্জনহার।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ, বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ,
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ, আরতি তোমার।

আপাততঃ এই পর্য্যন্ত পাওয়া গেল।

সৃষ্টি।

খাম্বাজ চৌতাল।

এক, রূপ-অরূপ-নাম-বরণ-অতীত-আগামী-কালহীন
দেশহীন সর্ব্বহীন নেতি নেতি বিরাম যথায়॥ (১)
সেথা হতে বহে কারণ ধারা,
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজালা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সর্ব্বক্ষণ॥
সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি কে করে গণন॥
কোটি চন্দ্র কোটি তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন
করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন॥
তাহে ওঠে কত জড় জীব প্রাণী
জরা ব্যাধি দুঃখ জনম মরণ,
সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ॥

প্রলয় বা গভীর সমাধি।

(বাগেশ্রী)

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥

---

(১) তিনি এক, তিনি সাকার নিরাকারের পার, নামবর্ণহীন, কালত্রয়ের অতীত, তিনি দেশের অতীত, সর্ব্বভাবের অতীত, নেতি নেতি করিয়া যাইতে যাইতে যেখানে অবাক্ হইয়া বিরাম লাভ করিতে হয়, তিনি তাহাই।